ফাল্গুন—১৩৩৮

দ্বিতীয় খণ্ড } ঊনবিংশ বর্ষ { তৃতীয় সংখ্যা

গীতার মর্ম্ম-বাণী

শ্রীঅনিলবরণ রায়

সাংখ্য ও যোগের মধ্যে তৎকালে যে প্রভেদ ছিল তাহারই উল্লেখ করিয়া গীতা তাহার অধ্যাত্ম-শিক্ষার অবতারণা করিয়াছে,—

এষা তেঽভিহিতা সাঙ্খ্যবুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যাযুক্তো যয়া পার্থ! কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥২।৩৯

সাংখ্য জ্ঞানের পন্থা, যোগ কর্ম্মের পন্থা; গীতা এই দুই প্রণালীরই সারতত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছে, এবং উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া নিজস্ব যোগপ্রণালী শিক্ষা দিয়াছে। এই সমন্বয়ের রহস্যটি না বুঝিলে গীতোক্ত সাধনার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করা যায় না। গীতা জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের মধ্যে বিরোধ মিটাইয়া যে সমন্বয় সাধন করে, প্রথমতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থানে, পরে আচার্য্য শঙ্কর প্রচারিত মায়াবাদ ও সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রভাবে, সেই সমন্বয় ভারতবাসীর জীবনের উপর কল্যাণময় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই; গীতার এই নিগূঢ় শিক্ষা চাপা পড়িয়া যায়, তৎপরিবর্ত্তে জ্ঞানমার্গ এবং তাহার আনুষঙ্গিক কর্ম্মত্যাগ, সংসার-ত্যাগ, সন্ন্যাস, ইহাই শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিকতা বলিয়া প্রচারিত হয়। এখনও লোকের মন হইতে এই ভ্রান্তি সম্পূর্ণরূপে দূর হয় নাই। গীতার অধিকাংশ টীকাকার শঙ্করের অনুসরণ করিয়া জ্ঞানমার্গ ও কর্ম্মসন্ন্যাসকেই গীতার প্রকৃত শিক্ষা

বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। (১) কর্ম্মের সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা কেবল প্রাথমিক অবস্থার; শেষ পর্য্যন্ত ইহাকে ত্যাগ না করিলে অধ্যাত্ম জীবনলাভ অসম্ভব। আবার গীতার আধুনিক ব্যাখ্যাকর্ত্তাগণ গীতার অন্যান্য অংশের উপর ঝোঁক না দিয়া, প্রথমাংশে যে কর্ম্মযোগের শিক্ষা আছে, তাহাকেই গীতার পরম শিক্ষা বলিতেছেন। তাঁহাদের মতে গীতার পরম বাক্য হইতেছে,—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মাতে সঙ্গোঽস্তকর্ম্মণি ॥২।৪৭

আবার কেহ কেহ বলিতেছেন, গীতা দুইটি পন্থাই দেখাইয়াছে,—জ্ঞান ও কর্ম্ম, সাংখ্য ও যোগ। সন্ন্যাসীর পক্ষে জ্ঞানযোগ, আর সংসারীর পক্ষে কর্ম্মযোগ। কিন্তু, বস্তুতঃ গীতা এরূপ কোনও প্রভেদ স্বীকার করে নাই। সন্ন্যাস বলিতে গীতা বাহ্যিক কর্ম্মত্যাগ, সংসারত্যাগ বুঝে নাই। আচার্য্য শঙ্কর কর্ম্মত্যাগী, সংসারত্যাগী যত্র তত্র বিচরণশীল কৌপীনধারী সন্ন্যাসীর কথা বলিয়াছেন। গীতায় কোথাও আমরা এইরূপ সন্ন্যাসীর বর্ণনা পাই না। গীতা যে ত্যাগের কথা বলিয়াছে, তাহা ভিতরে বাসনা কামনা ত্যাগ, প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্। সন্ন্যাসী বলিতে গীতা ইহাই বুঝিয়াছে,—

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসংন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।

তিনি অন্যান্য লোকের ন্যায় সংসারে বিচরণ করেন, কর্ম্ম করেন, কেবল তাঁহার কোনও বাসনা নাই, রাগ দ্বেষ নাই, তিনি সব "আমি" "আমার" ভাব হইতে মুক্ত—

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তি মধিগচ্ছতি ॥২।৭১

গীতার যে নিজস্ব যোগ-প্রণালী, সাধন-প্রণালী, তাহাতে কর্ম্ম ও জ্ঞানের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়েই এই সমন্বয়ের সূত্রপাত হইয়াছে, এবং শেষ পর্য্যন্ত এইটিকেই পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গীতা কর্ম্মের প্রশংসা করিয়াছে, আবার জ্ঞানেরও প্রশংসা করিয়াছে। কর্ম্ম করিতে হইবে কিন্তু যেমন তেমন ভাবে নহে,—বুদ্ধিযোগের দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা বাসনা-কামনার অহঙ্কারের উপর উঠিয়া যে ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করা যায়, সেই অবস্থাতেই কর্ম্ম গ্রহণীয়, যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্!—আমরা দেখিতে পাই, তৎকালের শিক্ষায় প্রভাবিত অর্জ্জুন প্রথমেই এই সমন্বয়ের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই—ভিতরে ত্যাগ ও বাহিরে কর্ম্ম বলিতে কি বুঝায় তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই তিনি এ বিষয়ে তাঁহার সংশয় জ্ঞাপন করিয়াছেন। সেই সূত্রে শ্রীকৃষ্ণ এই সমন্বয় আরও পরিস্ফুট করিয়া কর্ম্মযোগের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্জ্জুনের সকল সন্দেহ তাহাতেও দূর হয় নাই, পুনরায় পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমে তিনি সেই প্রশ্নই তুলিয়াছেন, আবার শেষ অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথমেও আমরা দেখিতে পাই, অর্জ্জুন এই সমস্ত তত্ত্ব আরও পরিষ্কার ভাবে জানিবার ইচ্ছা গুরুর নিকট নিবেদন করিয়াছেন। অতএব, গীতা জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়কে স্তরে স্তরে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে, এবং ইহাদের সহিত ভক্তির সমন্বয় করিয়া তাহার নিজস্ব সাধনাকে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। সেই সাধনায় কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিন মিলিয়া এক হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা গীতার পরম তত্ত্ব ভক্তির কেবল একটু ইঙ্গিত মাত্র পাই, যুক্ত আসীত মৎপর, গীতোক্ত সাধনার বীজমন্ত্র স্বরূপ এই তিনটি কথাই পরে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই ভাবে দেখিলে গীতা-শিক্ষার পদ্ধতিটি আমরা বেশ বুঝিতে পারি। গীতা তাহার সমস্ত বক্তব্য একেবারে স্পষ্ট করিয়া বলে নাই, শিষ্যের মানসিক অবস্থা ও গ্রহণ-শক্তি অনুসারে কোনটা বিস্তৃত করিয়া বলিয়া প্রাথমিক সাধনা নির্দ্দেশ করিয়াছে, কোনটার ইঙ্গিত মাত্র করিয়াছে, আবার কোনটা একেবারে চাপিয়া রাখিয়াছে। (*) পরে আবার সেই সকল বিষয়ের পুনরালোচনা করিয়াছে, তাহাদিগকে প্রয়োজন মত সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া সমস্ত শিক্ষাটিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিয়াছে। গীতার এই বিশিষ্ট পদ্ধতিটুকু মনে না রাখিলে, গীতার বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিরোধ রহিয়াছে

(১) বাংলাদেশে শ্রীধর স্বামীর টীকাই সুপ্রচলিত, ইহা শাঙ্কর ভাষ্যের অনুযায়ী, কর্ম্মত্যাগ ও সন্ন্যাসমূলক।

(২) গীতার যাহা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব গীতা কোথাও তাহা পরিষ্কার করিয়া বলে নাই। গুহ্যতম রহস্যরূপেই রাখিয়া দিয়াছে, গীতোক্ত সাধনার অনুসরণ করিয়া সাধকগণকে নিজ নিজ জীবনেই তাহার বিকাশ করিতে হইবে।

নে করিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতে হয়, অথবা নানা অদ্ভুত ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

অর্জ্জুনের মুখে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন তুলিয়া গীতা জ্ঞান ও কর্ম্মের যে সমন্বয় সাধন করিয়াছে, এবং ভক্তি ও ভগবানে আত্মসমর্পণের মধ্যে তাহাদের পূর্ণ সার্থকতা দেখাইয়াছে,—গীতার এই নিগূঢ় সমন্বয়ের মর্ম্ম বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ ও সাম্প্রদায়িক ভাষ্যের দ্বারা চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। কেহ জ্ঞানের উপরে, কেহ ভক্তির উপরেই বিশেষ ঝোঁক দিয়াছে, এবং সকলেই শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্ম-ত্যাগ, সংসার-ত্যাগকেই মানবজীবনের পরম লক্ষ্য বলিয়া প্রচার করিয়াছে। এই সংসার দুঃখময়, এই জগৎ মিথ্যা মায়া, এই মায়াময়, দুঃখময় জগৎকে ছাড়িয়া আত্মার নিথর শান্তি, নীরবতা, নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে লীন হইতে হইবে, অবিদ্যারূপিণী প্রকৃতির বন্ধন কাটাইয়া পুরুষ স্বীয় শুদ্ধ, শান্ত, স্বরূপে ফিরিয়া যাইবে, এইরূপে তাহার সংসার-লীলার অবসান হইবে, ইহাই সকলের প্রতিপাদ্য। কিন্তু বস্তুতঃ ইহাই গীতার প্রকৃত শিক্ষা নহে। গীতা এই সকল মতবাদ ও সাধনপন্থার সার বস্তু গ্রহণ করিয়াছে, এবং এই সকলকেই ছাড়াইয়া উঠিয়া ইহাদের মধ্যে অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়াছে। প্রকৃতির যে ক্রিয়ার মধ্যে আমরা বদ্ধ রহিয়াছি, ইহা অজ্ঞান, অবিদ্যার ক্রিয়া; কিন্তু ইহা ত্রিগুণময়ী অপরা প্রকৃতি। ইহাই সব নহে, ইহারও উপরে আছে পরা-প্রকৃতি, ভাগবত প্রকৃতি, প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। তাহা দিব্য চেতনা, দিব্য জ্যোতি, শক্তি, আনন্দে পূর্ণ। তাহাই জীবের প্রকৃত স্বরূপ, জীবভূতাম্। তাহার মধ্যে উঠিয়া, নিজের মধ্যে সেই পরা ভাগবত প্রকৃতির ক্রিয়ার বিকাশ করিয়াই মানুষ তাহার লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারে। অতএব, এই জগৎ ও জীবনকে মিথ্যা মায়া বলিয়া, ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া নহে, তাহা হইলে ত জীবের আবির্ভূত হইবার কোন প্রয়োজনই ছিল না; —পরন্তু, ইহাকে পরিবর্ত্তিত, রূপান্তরিত করিয়া, ইহার মধ্যে পরা ভাগবত প্রকৃতির দিব্য জ্ঞান, শক্তি, শান্তি, সৌন্দর্য্য, আনন্দ নামাইয়া আনা—ইহার জন্যই জীবের সংসার-লীলা, ইহার জন্যই মর্ত্তের মানব-জীবন।

গীতার এই অতীত রহস্যময় শিক্ষা এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, এতদিনে শ্রীঅরবিন্দ অপূর্ব্ব সাধনালব্ধ দিব্য-দৃষ্টি সহায়ে ইহাকে নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া ভারতের, তথা জগতের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। ইহার অনুসরণ করিয়াই মানবজাতি তাহার শ্রেষ্ঠ কল্যাণের পথে নিশ্চিত ভাবে অগ্রসর হইতে পারিবে। পাশ্চাত্যের নীচ ইন্দ্রিয়-ভোগপরায়ণ জীবন নহে, ভারতেরও মায়াবাদ বা সন্ন্যাস-ধর্ম্ম নহে, মানব-জীবন এখন যেমন রহিয়াছে, নীচের প্রকৃতির অজ্ঞানের, ত্রিগুণের ক্রিয়া,—ইহাকে দিব্য-ভাবে বিকশিত ও রূপান্তরিত করিয়াই মানুষ তাহার পরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারিবে,—মর্ত্ত্যের মানব-জীবনই দিব্য জ্যোতির্ম্ময় অমৃতময় জীবনে পরিণত হইবে,—ভগবানের নরলীলা সার্থক হইবে। শ্রীঅরবিন্দের কথায় গীতার বাণীর সার মর্ম্ম এই—

"মানুষ এখন তাহার প্রকৃতির যে নীচের ক্রিয়ার মধ্যে বাস করিতেছে ইহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া, এই যে আলোক প্রকৃতপক্ষে অন্ধকারই, যা নিশা পশ্যতো মুনেঃ, ইহা হইতে উপরে উঠিয়া, অনন্ত, অক্ষর আত্ম-সত্তার জ্যোতির্ম্ময় সত্যের মধ্যে জাগ্রত হইতে পারে, বাস করিতে পারে। তখন আর মানুষ তাহার ব্যক্তিত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, নিজেকে ক্ষুদ্র অহং বলিয়া দেখিয়াই চিন্তা করে না, কর্ম্ম করে না, অনুভব করে না, সামান্যের জন্য, স্বল্পের জন্য কষ্টকর প্রয়াসে প্রবৃত্ত থাকে না। শুদ্ধ আত্মার বিরাট ও মুক্ত নির্ব্যক্তিকতার (impersonality) মধ্যে সে ডুবিয়া যায়; সে ব্রহ্ম হয়; যে এক আত্মা সর্ব্ব-ভূতের মধ্যে বিরাজ করিতেছে,—তাহার সহিত নিজেকে এক বলিয়া জানিতে পারে। তখন আর তাহার অহং-বোধ থাকে না, তখন আর সে দ্বন্দ্বের দ্বারা বিক্ষুব্ধ হয় না, দুঃখের জ্বালা বা সুখের চাঞ্চল্য অনুভব করে না, তখন আর সে পাপের দ্বারা ব্যথিত বা পুণ্যের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় না। আর যদিই বা এই সকল জিনিষের আভাস বর্ত্তমান থাকে, সে দেখিতে পায় ও জানে যে, এ সব হইতেছে প্রকৃতিরই ত্রিগুণের খেলা, তাহার নিজের জীবনের সত্য বলিয়া সে সবকে সে উপলব্ধি করে না। কেবল মাত্র প্রকৃতিই কর্ম্ম করে এবং যন্ত্রবৎ নিজের নানা রূপ বিকাশ করে; কিন্তু শুদ্ধ আত্মা নীরব, নিষ্ক্রিয়, মুক্ত। শান্ত-প্রতিষ্ঠ, প্রকৃতির ক্রিয়া সকলের দ্বারা অস্পৃষ্ট,—সে সমুদয় ক্রিয়াকে সে দেখে সম্পূর্ণ সমতার সহিত, এবং নিজেকে সেই

সব হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া জানে। এই অধ্যাত্ম অবস্থা লইয়া আইসে নীরব শান্তি ও মুক্তি, কিন্তু ইহা শক্তিক্রিয়াত্মক দিব্যজীবন আনিয়া দেয় না, পূর্ণতম সিদ্ধি আনিয়া দেয় না; ইহা খুব উচ্চ-গতি সন্দেহ নাই, কিন্তু এইটিই সমগ্র ভগবদ্-জ্ঞান, আত্ম-জ্ঞান নহে, সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি, তাহা নহে।

"পূর্ণতম সিদ্ধিলাভ হয় কেবল পরম ও সমগ্র ভাগবতের মধ্যে বাস করিয়া।—তখন ভগবানের অংশ মানবাত্মা ভগবানের সহিতই যুক্ত হয়; তখন সে আত্মসত্তায় সর্ব্ব-ভূতের সহিত এক হয়,—তাহাদের সহিত এক হয় ভগবানের মধ্যে, আবার প্রকৃতিরও মধ্যে; তখন সে শুধু মুক্ত নহে, সে পূর্ণ; তখন সে পরম আনন্দে নিমগ্ন, চরম সিদ্ধিলাভের জন্য প্রস্তুত। তখনও সে আত্মাকে দেখে—চিরন্তন, অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা নীরবে সর্ব্বভূতকে ধরিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু সে প্রকৃতিকেও দেখে—আর কেবল যন্ত্রবৎ ত্রিগুণের ক্রিয়ায় রত অচেতন জড়াত্মিকা শক্তিমাত্র নহে, পরন্তু আত্মারই শক্তি, প্রকাশলীলায় রত ভগবানেরই শক্তি। সে দেখিতে পায় যে, নীচের প্রকৃতিই আত্মার জীবনের গূঢ়তম সত্য নহে, সে ভগবানের এক পরমা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সন্ধান পায়,—মন, প্রাণ ও দেহের মধ্যে এখন যাহা কিছু অপূর্ণরূপে দেখা যাইতেছে, সে সবেরই উচ্চতর সত্যের মূল ঐ প্রকৃতির মধ্যে রহিয়াছে, তাহা এখনও প্রকট হয় নাই। নীচের এই মানসিক প্রকৃতি হইতে এই পরমা অধ্যাত্ম প্রকৃতির মধ্যে উঠিয়া সে সমস্ত অহং হইতে মুক্ত হয়। সে নিজেকে একটি অধ্যাত্ম সত্তা বলিয়া জানিতে পারে;—মূলতঃ সে সর্ব্বভূতের সহিত এক, এবং তাহার ক্রিয়াশীল প্রকৃতিতে সে ভগবানেরই একটি শক্তি এবং বিশ্বাতীত অনন্তের একটি সনাতন আত্ম-সত্তা, জীবভূত সনাতনঃ। সে সব-কিছুকে ভগবানের মধ্যে দেখে, এবং সব-কিছুর মধ্যেই ভগবানকে দেখে, সে দেখে সবই বাসুদেব, বাসুদেব সর্ব্বম্। সুখ দুঃখ, প্রিয় অপ্রিয়, আশা নিরাশা, পাপ পুণ্য সকল দ্বন্দ্ব হইতেই সে মুক্ত হয়। এখন হইতে তাহার চৈতন্যময় দৃষ্টি ও ইন্দ্রিয় সব কিছুকেই ভগবানের ইচ্ছা, ভগবানের কর্ম্ম বলিয়া উপলব্ধি করে। বিশ্ব-চৈতন্য ও শক্তির একটি আত্মা ও অংশরূপে সে জীবন যাপন করে, কর্ম্ম করে, পরম ভাগবত আনন্দে, অধ্যাত্ম আনন্দে পরিপূর্ণ থাকে। তাহার কর্ম্ম হয় দিব্য কর্ম্ম এবং তাহার পদ (status) হয়, ঊর্দ্ধতম অধ্যাত্ম পদ"। (Essays on the Gita, Second serise)

বহুরূপী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বহুরূপী এক বহুদিন বহুদিন ধরি ভাবে,
গোবিন্দজীর কৃপা সে যা করেই হ'ক পাবে।
নানা বোল্ নানা বেশে হায় ভুষিয়াছে বহু জনে,
অতি কৃপণের কাছেও অর্থ এনেছে টেনে।
নিপুণতা তার অতুলন বিপুল পুলক চিতে,
ধারণা তাহার পারিবেই ভগবানে টলাইতে।

ভাবিতে ভাবিতে নিশিদিন হল সে পাগল মত,
মন্দির-দ্বারে প্রতিদিন করে হাবভাব কত,
কাবুলি সাজিয়া টাকা চায়, হাঘ'রে সাজিয়া নাচে,
সন্ন্যাসী সাজি গীত গায়, পাগলিনী সাজি যাচে।
নিরাশ হইয়া ফিরে যায় তবু বাধা নাহি মানে,
দেবতা তাহার রসময়, রসিক সে কথা জানে।

পাণ্ডা তাহারে সাঁজে এক ডাকি কন চুপি চুপি,
দেবতারও জেনো বহুরূপ, তিনিও যে বহুরূপী।
খেলা দেখাইয়া ভুলাবার ও বড় কঠিন ঠাঁই
গলেনাক জল হাতে ওঁর, লাভের ভরসা নাই।
শুনি বহুরূপী খুসী খুব, ভাবে মনে মনে আজি,
হাঘ'রে এসেছি দেখাতে হাঘরের ঘরে বাজি।

একাকী পাইয়া দেবতায় বহুরূপী বলে জোরে,
দিতে হবে নাক কিছু আর, আছ কেন চুপ করে।
প্রাণ ভরে আজ কথা কও চলে যাই ভালবাসি
সহসা ফুটিল দেবতার মুখে খিল্ খিল্ হাসি।

* * *

বহুরূপী আর আসে নাই, মোরা পথ চেয়ে থাকি
সম-ব্যবসায়ী দুজনায় এক হয়ে গেল নাকি?

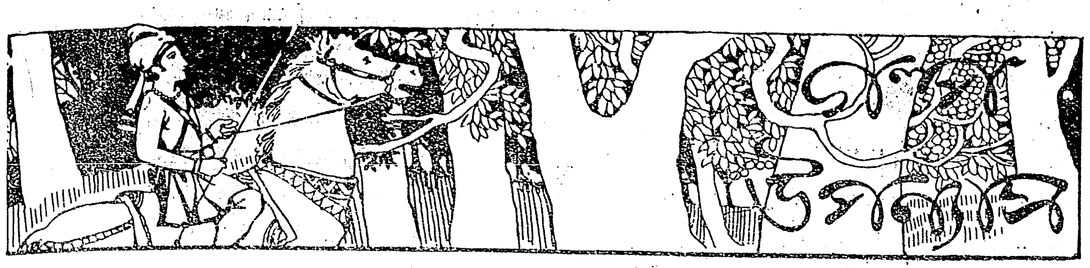

অস্তাচল

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কাব্যবিনোদ বি-এ

(৬)

বনবিহারী বাবু প্রত্যহই আসিয়া মিঃ রায়কে দেখিয়া যাইতেন। মাড়োয়ারী হাঁসপাতালের ডাক্তার বংশীধর বাবুও যথাসাধ্য চেষ্টা ও তত্ত্বাবধান করিয়া মেজরের চিকিৎসা বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অসুখ সহজে কমিল না। জ্বর ও বুকের বেদনা সমান ভাবেই ছিল। অনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সর্ব্ব-প্রযত্নে মেজরের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। ডাক্তার যথেষ্ট সাহস ও আশা দিলেও, অনি ভরসা করিতে পারিতে-ছিল না। তাহার মনে সর্ব্বদাই আশঙ্কা হইতেছিল।

অনি যে নিজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই অধিক বিহ্বল হইয়াছিল, তাহা নহে, যদিও মেজরের বর্ত্তমান জীবনের উপর তাহার ভবিষ্য জীবনের অনেক কিছুই নির্ভর করিতেছিল। মেজরের অসুস্থ অবস্থায় অনি যেদিন তাঁহার সাংসারিক ও পারিবারিক অবস্থার বিষয় সম্পূর্ণ-রূপে জানিতে পারিয়াছিল, সেই দিন হইতেই যেন তাহার নারীত্বের স্বভাব-কোমলতা অধিকতর ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। অনি জানিত যে মেজর কর্ম্মস্থানে একাকী, কিন্তু তাঁহার পশ্চাতের ইতিহাসের পাতাগুলিও যে তাহারই ন্যায় শূন্য ও মরুময় হইয়া গিয়াছিল, তাহা সে পূর্ব্বে কখনই ভাবিতে পারে নাই। অনি যেদিন মেজরের অসুস্থতার কথা বাড়ীতে জানাইবার জন্য তাঁহার অনুমতি চাহিতে গিয়াছিল, সেদিন মেজরের সেই বেদনা-ম্লান মুখ ও একটা বুকভাঙা দীর্ঘনিশ্বাস যেন অনিকে পলকে আত্মহারা করিয়া দিল। একসঙ্গে তাহার স্নেহ, দয়া, মায়া প্রভৃতি কোমলতার যাবতীয় সম্পদ যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়া-ছিল। হায়! পুরুষ! তোমার কর্ম্মশ্রান্ত জীবনকে তো তুমি স্বহস্তে সজীব করিয়া রাখিতে পার না। তুমি অদম্য উৎসাহে অগ্রসর হইয়া যাও; উৎসাহ তোমার কর্ম্মকে বাঁচাইয়া রাখে। কিন্তু তোমার সেই ক্লান্ত ও রুক্ষ উৎসাহকে সজীব করিয়া রাখে যে তোমার মাতা, পত্নী, ভগিনী ও কন্যা, তাঁহাদের সেই স্নিগ্ধতার শান্তিধারায় স্নান করাইয়া। সে যে প্রকৃতির নিয়ম,—দেবতার দান। সেই স্নেহ ও সেবাই যে তোমার যুদ্ধশ্রান্ত জীবনকে ঘুম পাড়াইয়া রাখে।

রাত্রিদিন মেজরের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অনি তাঁহার সেবা করিতেছিল; সে সেবার ক্লান্তি ছিল না, অবসাদ ছিল না। মেজরের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া অনি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছিল; কিন্তু সেবার তৃপ্তিতে সে প্রীত হইতে পারিতেছিল না। মেজরের নিকট সে ঋণী ছিল সত্য। যিনি প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখিতেন না, যাঁহাকে প্রতিদান দিবার মত তাহারো কোন সম্বল ছিল না, সেই মহাজনের ঋণভার সাধ্যমত লাঘব করিতে চাহিয়াছিল অনি, তাঁহার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিয়া। কিন্তু রোগশয্যা-পার্শ্বে এই নির্ম্মম সেবার সুযোগ তো সে কখনই পাইতে চাহে নাই। ঠাকুর! সে আমরণ ঋণী হইয়া থাকিবে, তাহাতে তো তাহার কোন ক্ষতি নাই। তুমি মহৎকে প্রাণ দিয়াছ, হৃদয় দিয়াছ, শক্তি দিয়াছ,—বিপন্নকে সাহায্য করিবার জন্য। যে নিরুপায়, তাহাকে সে সাহায্য গ্রহণ করিবার অধিকারও দিয়াছ তুমি; প্রতিদানের অক্ষমতাও দিয়াছ তুমি। এ প্রতিদানের

সুযোগ দিয়া অক্ষমকে আরও বিপন্ন করিয়া তুলিও না প্রভু! যদি সে অধিকার পাই, জন্মান্তরে ফিরিয়া আসিব। আমার মূল্যহীন জীবনের সবটুকু পরমায়ু নিঃশেষে লইয়া, মেজরের জীবনকে সুদীর্ঘ করিয়া দাও; তাঁহাকে ভাল কর নারায়ণ!

অনি লক্ষ্য করিয়াছিল—মেজর যেন সে-দিন অর্দ্ধোচ্চারিত ভাবে কাহার নাম করিয়া কলিকাতায় একটা সংবাদ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনি ভালরূপে বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; কিন্তু মেজর আর কোন উত্তর দেন নাই। সে বুঝিয়াছিল মেজর ইচ্ছা করিয়াই সেটা গোপন করিয়া গেলেন। অনিচ্ছা বশতঃ, মেজর যেটাকে গোপন করিতে চান্, অনি তাহা লইয়া আর কোনরূপ পীড়াপীড়ি করিল না।

* * *

অনাহার, অনিদ্রা ও দুশ্চিন্তায় অনির স্বভাব-কমনীয় মুখখানা যেন এই কয়েক দিনের মধ্যেই ছাইয়ের মত মলিন হইয়া গিয়াছিল। তাহার চোখে বুদ্ধিমত্তা ও তেজস্বিতার সে দীপ্তি যেন আর ছিল না। এই দশ বারো দিনের মধ্যেই সব কিছু শুষ্ক ও নিষ্প্রভ হইয়া উঠিয়াছিল।

সেদিন বনবিহারীবাবু অনির এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়া বলিলেন—"অণিমা দেবী, শরীরের প্রতি এতখানি অবহেলা করা কি আপনার উচিত হ'চ্ছে? এর 'পর আপনিও যদি বিছানা নেন, তখন কি উপায়টা হবে ভাবুন দেখি!"

অনি শুষ্ক একটু হাসিয়া উত্তর দিল "ক্যাপ্টেন্, মানুষের চিকিৎসা করা আপনাদের ব্যবসা; সুতরাং তাদের শরীর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আপনাদের যথেষ্টই জ্ঞান থাকা উচিত—উচিত কেন! আছেই। কিন্তু তাই ব'লে যে ব্যবহারিক বিজ্ঞান সম্বন্ধেও আপনাদের বিশেষ পারদর্শিতা আছে—তা তো বোধ হয় না।"

বনবিহারী বাবু সহসা এরূপ একটা অসংলগ্ন উত্তরের কোন তাৎপর্য্যই বুঝিলেন না। তিনি যেন কতকটা আশ্চর্য্য হইয়াই অনির মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তার মানে?"

অনি পুনরায় হাসিয়া উত্তর দিল—"মানে অত্যন্ত সহজ ও শাদা। শরীরের সম্বন্ধে আপনাদের বিজ্ঞানে যা' সব লেখা আছে, তার একটাও হয় তো মিথ্যে নয়। কিন্তু যাদের উপর সেগুলোকে খাটাতে চান্, তাদের নিজের নিজের সাধারণ সূত্রগুলো খুব গোলমেলে হ'তে পারে তো! আমি মেনে নিচ্ছি যে, চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মানুষের শরীর রক্ষা সম্বন্ধে যে সব সূত্রগুলো লিখে গেছেন, সেগুলো সম্পূর্ণ সত্যি ও ঠিক; তবে সেই সব সূত্র অমানুষের পক্ষেও খাটবে কি না সেটা সন্দেহজনক। ব্যবহারিক জীবনে মানুষের মধ্যে এত রকমারি স্বভাব গড়ে' উঠেছে, যার জন্যে পুঁথির সূত্রগুলো ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে খাটে না; বুঝ্লেন? আপনি স্বীকার ক'রবেন নিশ্চয়ই, যে আগুনের তাপে মুখ ঝল্সে যায়। কিন্তু অনবরত হাপরের পাশে থেকে থেকে আগুনের তাপ যার হজম্ হ'য়ে গেছে, তার মুখ কি আর আগুন-তাপে ঝল্সাবে?"

বনবিহারী বাবু কথাটা বেশ পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে না পারিয়া, একটু বিরক্তির সঙ্গেই কহিলেন—"ও সব বাজে কথা ছেড়ে দিন্। সময়ে খাওয়া নাওয়া সব ছেড়ে দিয়ে, শরীরটাকে কি ক'রে ফেলেছেন, দেখছেন কি? এত কষ্ট করার আমি কোন দারকারই বুঝি না; একটা নার্স কয়েক দিনের জন্যে ঠিক্ ক'রলে, আপনারও কোন কষ্ট হ'ত না, মেজরেরও সেবা-যত্ন যে ভালই হ'ত তা'তেও কোন সন্দেহ ছিল না। অবশ্য আপনি যে রকম রোগীর যত্ন করেন, তা' হয় তো নার্সরাও সব সময় পেরে ওঠে না; কিন্তু তাই ব'লে আপনার নিজের শরীরটাও দেখতে হবে তো!"

"নিজের শরীর তো সব সময়ই দেখছি বনবিহারী বাবু! ওতে আমার কোন কষ্টই হয় না, ওটা আমাদের শরীরের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। স্বাভাবিক ধর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটলে, অসুস্থতা ও অশান্তি এসে পড়'তে পারে। কিন্তু তার স্বাভাবিকত্ব একটু আধটু কম বেশী হ'লে কিছু ক্ষতি হ'তে পারে কি? সেবাই হচ্ছে নারীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সেবার জন্যে আমরা জন্মেছি, সেবাতেই আমাদের সার্থকতা। অন্ততঃ যে সমাজ ও জাতীয়তার আদর্শে আমাদের সব কিছু গড়ে' ওঠে, সেখানে সেবার বাইরে স্ত্রীলোকের অন্য কোন আদর্শই নাই। এবং আমরাও সেটাকে সর্ব্বান্তঃকরণে মানি।"

বনবিহারী বাবু কিছুদিনের পরিচয়েই অনিকে বিশেষ

ভাবে চিনিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন—অনি যেটাকে ধরিবে, তাহা হইতে সহজে তাহাকে সরানো যায় না। তথাপি তিনি অনির এই প্রকার যুক্তি সমর্থন করিতে পারিলেন না। বেশ একটু অসন্তুষ্টির সঙ্গেই বলিলেন—"আদর্শ নিয়ে বেঁচে থাক্বার যুগ আর নেই অণিমা দেবী! নারীও মানুষ; তারও রক্ত মাংস, সুখ দুঃখ সবই আছে। সমাজের ভিতর নারীর যে আদর্শকে খাড়া ক'রে রাখা হ'য়েছে, সেটা কেবলমাত্র পুরুষদের চাল্ঃ—কেবল সর্ব্বতোভাবে নারীর উপর তাদের কর্ত্তৃত্বটাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার মতলবে—বুঝলেন! সে চালিয়াতি যতদিন না ধরা পড়েছিল, ততদিন হয় তো তার কোন মূল্য ছিল; আজ আর সেটাকে কোনমতেই সমর্থন করা যায় না। সভ্য দুনিয়ার দরবারে স্বার্থ-পিশাচরা তাদের সে দাবী এখন হারিয়েছে। আপনি শিক্ষিতা হ'য়েও যে সেই সব গোঁড়ামির হাত থেকে মুক্ত হ'তে পারেন নি, সেটা বড়ই দুঃখের কথা। নিজেকে অত ছোট ক'রে দেখবেন না।"

"নিজেকে ছোট ক'রে দেখাটাই বড়, না বড় ক'রে দেখাটাই বড়,—সেটা আমার চেয়ে হয় তো আপনিই ভালো জানেন। সেই চালিয়াতির তথ্য আবিষ্কার ক'রে, আপনার সভ্য জগৎ হয় তো নারীকে তার ছোট আসন থেকে টেনে তুলে বড় আসনের পাশে সমান অধিকারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু তাই ব'লে তাদের স্বাভাবিক ধর্ম্মকেও উল্টে দিয়ে তাতে সমান দাবী সাব্যস্ত ক'রতে পেরেছেন কি না সে বিষয়ে আমার যথেষ্টই সন্দেহ আছে। প্রকৃতির কাছ থেকে যে যা পেয়েছে, সেটার উপর ছোট বড়'র সমস্যা এসে কোন পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারে কি? নারী গর্ভধারণ ক'রবেই; স্নেহ, মায়া, মমতা, দুর্ব্বলতা—এগুলো তার থাকবেই। তবে আপনাদের সভ্য দুনিয়ার 'জন্ম শাসন' বা 'বার্থ্ কন্ট্রোল' তার কোন আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাবে কি না ব'ল্তে পারি না। যাক্, ওই নিয়ে তর্ক ক'র্বার সময় এখন নয়, আমার ইচ্ছাও নেই। আপনি যদি বোঝেন্ যে রোগীর শুশ্রূষার কোন ত্রুটি হ'চ্ছে, নার্স নিযুক্ত করুন; তাতে আমার কোন দুঃখই নেই। তবে—সেবা কিন্তে মেলে না।"

অনি আর কোন কথা না বলিয়া গম্ভীর ভাবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সে যেন নিজেই মনে মনে একটু লজ্জিতা হইল। মেজরের শুশ্রূষা করিবার কথা লইয়া তাহার এরূপ কোন তর্ক না করাই ভাল ছিল;—বনবিহারী বাবু কি ভাবিবেন! সত্যই তো! প্রয়োজন হইলে ডাক্তার নার্স নিযুক্ত করিবেন; তাহাতে বনবিহারী বাবুর প্রতি এরূপ অকারণ বিরক্তি ও নার্সদের সেবার উপর তাহার এরূপ অবজ্ঞার ভাব আসিবার তো কোন কারণ নাই। অনির মনে হইতেছিল—সে যেন নার্সদিগকে একটা বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতেছে; কিন্তু এরূপ বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিবার কোন কারণ তো তাহার জীবনে ঘটে নাই। তবে মেজরের সেবার ভার বিন্দুমাত্র ছাড়িয়া দিতেও তাহার প্রাণে এ ঝাঁকানি লাগে কেন? কারণ খুঁজিতে গিয়া অনি অন্তরে একটা লজ্জার ধাক্কা খাইয়া রাঙিয়া উঠিল।

বনবিহারী বাবু বাহিরের খোলা বারান্দায় আসিয়া ইজি চেয়ারখানার উপর বসিয়া পড়িলেন। তিনি অবাক্ হইয়া ভাবিতেছিলেন এই নারীটীর প্রকৃতির কথা। অনিকে যেন তিনি চিনিয়াও চিনিতে পারিতেছিলেন না। অনির স্বাভাবিক প্রকৃতি, কথাবার্ত্তার ভঙ্গী, চালচলন প্রভৃতি সব কিছুই যেন তাহার শান্ত ও স্নিগ্ধ রূপের কোমলতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া ফুটিয়া উঠে। গৌরাঙ্গী না হইলেও তাহার অভ্যুজ্জ্বল শ্যামবর্ণের মধ্যে এমন একটা দীপ্ত অথচ মৃদু ও কোমল সৌন্দর্য্য আছে, যাহাতে তাহাকে একটা তৃণশ্যামল ছায়াকুঞ্জ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু সে স্নিগ্ধতার অন্তরের বিরাট তেজস্বিতা দেখিলে মনে হয় সে যেন একটা ভীষণ আগ্নেয়গিরি। বাহিরের প্রকৃতি শস্যশ্যামল, কিন্তু অন্তর তেজস্বিতার বহ্নিশিখায় প্রদীপ্ত।

নিজের কথাবার্ত্তার ত্রুটিটুকু ঢাকিয়া লইবার জন্য অনি তাড়াতাড়ি বনবিহারীর উদ্দেশে ফিরিয়া আসিতেছিল। তাহার ধারণা হইয়াছিল—বোধ হয় বনবিহারী বাবু তাহার ঐরূপ বাচালতায় একটু অপ্রীত হইয়াছেন। কিন্তু বারান্দার সম্মুখ পর্য্যন্ত আসিয়াই সেই নির্ব্বিকার কাব্য-মাতালের ভাবটুকু চোখে পড়িতে, অনির সে ধারণা কাটিয়া গেল; সে যেন মনে মনে একটু সোঁয়াস্তি অনুভব করিল। বনবিহারী তখন আপন

মনে মাথা দোলাইয়া তুড়ি দিতে দিতে আবৃত্তি করিতেছিলেন—

রে চপলা, হাস্য যে তোর
স্নিগ্ধ আলোয় মাখা!
গোপন বুকের অন্তরালে,
প্রলয় তেজের বহ্নি জ্বলে;
প্রাণ কাঁপানো সুরের আগুন
ঘুমের নেশায় ঢাকা॥

(৭)

অনির অক্লান্ত সেবা ও বনবিহারী বাবুর সযত্ন চিকিৎসায় মেজর উনিশ দিন রোগ ভোগের পর উঠিয়া বসিলেন। মেজরের রোগমুক্তিতে অনির মন একটা শান্তি ও তৃপ্তির গৌরবে ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাহার চির-ব্যর্থ সেবা যে সার্থক হইবে অনি তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই। কিন্তু সে শান্তিও অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে নাই। মেজর সারিয়া উঠিলেন; নিজের কর্ত্তব্য ও শ্রদ্ধা সব কিছুর দিক্ দিয়াই অনি এতদিন তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই; কিন্তু এখন তো আর নিশ্চেষ্ট ভাবে মেজরের স্কন্ধে ভর করিয়া বসিয়া থাকা চলে না। নিজের জীবন-সংগ্রামে তাহাকে নামিয়া পড়িতেই হইবে। যাঁহার নিকট সে সহস্ররূপে ঋণী হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহার ঋণভার আর মানুষ কত বাড়াইতে পারে! অনি তাহার জীবিকা অর্জ্জনের একটা পথ খুঁজিয়া লইবার জন্য ভিতরে ভিতরে সচেষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। দাতার হস্ত চির-মুক্ত হইতে পারে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট গ্রহীতার সে দান গ্রহণে অবাধ-হস্ত হওয়াকে অনি যেন অন্তরের সহিত সমর্থন করিতে পারিতেছিল না। বন্ধুত্বের দাবীরও একটা সীমা আছে।

* * * *

সন্ধ্যার সময় মেজরকে ঔষধ খাওয়াইয়া অনি তাহার পড়ার ঘরে আসিয়া বসিল। মেজরের অসুখের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ প্রায় তিন সপ্তাহেরও অধিক অনি তাহার পড়ার ঘরে আসে নাই। টেবিল ও আলমারির চারিদিকে ধূলা জমিয়া উঠিয়াছে; এ মাসের দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলি যে অবস্থায় আসিয়াছিল, ঠিক্ সেই ভাবেই এখনো পড়িয়া আছে। লাইব্রেরী ঘরের অবস্থা দেখিয়া অনির মনে হইল ইহার পূর্ব্ব অবস্থার কথা! সে যেদিন প্রথম আসিয়া এই ঘরখানির সহিত পরিচিত হইয়াছিল, সে দিন যে অবস্থায় সে ইহাকে দেখিয়াছিল—আজকার অবস্থার সঙ্গে তাহার বিশেষ কোন পার্থক্যই নাই। তবে সাময়িক-পত্র ও বইএর সংখ্যা পূর্ব্ব অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে। অনির অবসর সময়ের খোরাক জোগাইবার জন্যই মেজর বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ইহার পুষ্টি সাধন করিতেছিলেন। সে কথা তিনি না স্বীকার করিলেও, অনির বুঝিতে কণামাত্র বাকী ছিল না। সরঞ্জাম বজায় রাখিলেও লাইব্রেরীর সহিত সম্পর্ক রাখিবার অবসর মেজরের খুব কমই ঘটিয়া উঠিত।

অনির শরীরটা অত্যন্ত অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল; তখন আর ঘরের সংস্কার করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। খবরের কাগজখানা হাতে করিয়া খোলা জানালার পাশে চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া অনি বসিয়া পড়িল। দেশ বিদেশের সংবাদ দেখিবার প্রবৃত্তি তখন তাহার ছিল না; নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা তাহাকে যথেষ্ট রূপেই পাইয়া বসিয়াছিল। যে কোন একটা উপায় তাহাকে অবলম্বন করিতে হইবেই। মেজর হিতৈষী ও মহৎ বন্ধু হইলেও—তাঁহার সাহায্যে—তাঁহারই ভাগ্যোপজীবী হইয়া তো অনি বাস করিতে পারে না; তিনি নিঃসম্পর্কীয়। অনিরও সমাজ আছে, মেজরেরও সমাজ আছে; সে সমাজ পরস্পর বিভিন্ন হইলেও সমাজ; তাহার বিধি ব্যবস্থা মানুষকে মানিয়া চলিতেই হইবে। বন্ধুত্বের দাবী যতই পবিত্র হউক; সে নারী—মেজর পুরুষ! সমাজ এ দাবী কখনই সমর্থন করিবে না। লোকালয়ে বাস করিতে হইলে লোকমতকে অবহেলা করিয়া চলা যায় না।

অনি বসিয়া বসিয়া "কর্ম্মখালি"র ছত্রগুলির ভিতর তাহার কর্ম্মজীবনের নির্দ্দেশ খুঁজিতেছিল। কত দূর দেশের বিভিন্ন প্রকারের আহ্বান বহিয়া সংবাদপত্র কর্ম্মপ্রার্থীর দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অভাবের তাড়নায় মানুষ ছুটিয়া বাহির হইবে, এই আহ্বানে তাহার ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজনকে ছাড়িয়া সেই সুদূর

বাসের পথে। এই অভাব স্নেহের ধার ধারে না; হৃদয়ের সহানুভূতিকে সে মুছিয়া ফেলে। অদৃষ্টের অন্বেষণে গৃহীকে উদাস করিয়া বাহির করে। তাহাকেও বাহির হইয়া পড়িতে হইবে—নিজের অদৃষ্টের অন্বেষণে—ঐ একই পথে। তবে তাহার আকর্ষণের বালাই নাই; সমস্ত বাঁধন আপনা আপনিই ছিঁড়িয়া তাহার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে।

আবার নূতন করিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইবার কথা ভাবিতে অনির চক্ষু দুইটী ভারি হইয়া আসিতেছিল। এই দুই তিন মাসের ঘনিষ্ঠতায় এখানকার সব কিছুই যেন আবার তাহাকে আকর্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে; এই ঘর বাড়ী, মেজরের এই মহৎ ও সুদৃঢ় আশ্রয়। মেজরের সহানুভূতি ও স্নেহের কথা ভাবিতে সহসা অনি যেন একটা অকল্পিত আনন্দ ও ভীতিতে শিহরিয়া উঠিল। এ শিহরণ সে জীবনে কখনো অনুভব করে নাই। একটা অজ্ঞাত আনন্দের রঙিন্ তুলি অলক্ষ্যে তাহার সমস্ত বুকের ভিতর কে যেন টানিয়া দিল; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই একটা বিভীষিকার কালো ছায়া সেই গোলাপী আভায় রঙানো চিত্রপটকে গাঢ় মসির প্রলেপে ভরিয়া দিল। অনি ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল; তাহার বিবেক যেন নিমেষে তাহার সমস্ত চিত্তবৃত্তিগুলিকে লাঞ্ছিত করিয়া তুলিল। খবরের কাগজ-খানিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া অনি দৃঢ়মুষ্টিতে জানালার গরাদে দুইটীকে ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অকারণ বিহ্বলতার উদ্গত অশ্রুকে রোধ করিবার জন্য অনি দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল। কাল-বৈশাখীর প্রচণ্ড মেঘ পাগল হাওয়ার সঙ্গে মাতামাতি করিয়া তখন সমস্ত প্রকৃতিকে কাঁপাইয়া ফিরিতেছিল। স্থির দৃষ্টিতে অনি আকাশের পানে চাহিয়া ছিল; এ যেন তাহারই বুকের একটা প্রতিচ্ছবি! দূরে অন্ধকারের বুক চিরিয়া বিদ্যুতের যে উজ্জ্বল রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা নিমেষেই আবার সেই গাঢ় কালিমায় মিলাইয়া গিয়াছে।

অন্তরের সহিত কয়েক মুহূর্ত্ত যুদ্ধ করিয়াই অনির মনটা ক্ষত হইয়া উঠিয়াছিল। যখন বয় আসিয়া জানাইল, মেজরের দুধ ও রুটী গরম করা হইয়াছে, অনি মুখ না ফিরাইয়াই দৃঢ় অথচ নিম্নস্বরে তাহাকে বলিয়া দিল মেজরকে খাওয়াইবার জন্য। অনির এরূপ গাম্ভীর্য্য দেখিয়া বয় আর কোন কথা বলিবার সাহস পাইল না; সে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অনি অবসন্নভাবে চেয়ারখানার উপর বসিয়া পড়িল। আজ আর মেজরকে খাওয়াইবার জন্য সে উঠিল না। একটা কথা কেবলই ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনির মনে হইতেছিল—'মেজর-সাহেব ক্রিশ্চান্! ব্রাহ্ম!'

শিক্ষিত হইয়াও যাহারা নিজের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়া নূতন সম্প্রদায় গঠনে যোগদান করিত, নিজের জন্মগত জাতীয়তার গৌরবকে মাথায় লইয়া যাহারা পৃথিবীতে দাঁড়াইতে পারে না, অনি তাহাদিগকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারিত না। কিন্তু মেজরের বিষয়ে তাহার সে দৃঢ়তা যেন আপনা আপনি কতকটা শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। তাহার দৃঢ়চিত্ত দাদামহাশয়ও মেজরের এই দুর্ব্বলতাকে উপেক্ষা করিয়া মেজরকে শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিয়াছিলেন। অনিও সে শ্রদ্ধাকে অমান্য করিতে পারে নাই।

কোনো একটা সূত্র লইয়া অনি যখনই মেজরের কথা ভাবিত, তখনই যেন তাহার মনের মধ্যে একটা অচেনা দম্‌কা হাওয়া আসিয়া চিন্তার সমস্ত সূত্রগুলিকে ওলট্ পালট্ করিয়া জট পাকাইয়া তুলিত। অনি কোনো-রূপেই সে অসোয়াস্তির সমাধান করিয়া উঠিতে পারিত না। আজও নিজের ভবিষ্য জীবনের ও মেজরের কথা ভাবিতে গিয়া অনি সেই জটিলতার জালে জড়াইয়া পড়িয়াছিল। নিষ্কৃতির পথ খুঁজিতে গিয়া আজ শুধু দাদামহাশয়ের শেষ কথাটীই তাহার বারে বারে মনে পড়িতেছিল। তাহার হাত দুইটী ধরিয়া নিজের বুকের উপর টানিয়া লইয়া দাদু বলিয়াছিলেন—"দিদিমণি, সমাজ আর শাসনের দরকার মানুষের সম্পদকে নিরাপদ ক'রে রাখ্‌বার জন্যে। বিপন্ন যদি সম্পদের কোনো আশ্রয় পাবার জন্যে সেই সমাজের কোনো একটা গণ্ডীকে ভেঙে ফেলে, তাতে পাপ হয় না। নিয়মিত বিধি বা আইনের একটা সূত্র লঙ্ঘন করা হ'লেও, সেই বিধির উদ্দেশ্যকে তো তার দ্বারা ভাল ক'রেই সমর্থন করা হয় দিদি! সমাজ অনুমতি না দিলেও—তোমার দাদুর আদেশ থাকলো।"

দাদুকে যথেষ্ট ভক্তি, এবং মেজরকে শ্রদ্ধা করিলেও অনি তাহার দাদুর শেষ উপদেশটী এতদিন কোনরূপেই মাথা পাতিয়া লইতে পারে নাই। আজ মেজরের আশ্রয়

ছাড়িয়া যাইবার কথা মনে হইতেই অনি সহসা নিজের বুকের ভিতর যে দুর্ব্বলতার ক্ষত দেখিতে পাইল—তাহাতে তাহার নিঃসম্বল চিত্ত আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছিল। অনি সে দুর্ব্বলতাকে প্রাণপণ চেষ্টাতেও ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিতেছিল না। দৃঢ়তার নিষ্ঠুর শাসনে তাহার ক্ষতমুখ হইতে যে রক্তস্রোত ছুটিতেছিল, তাহার একমাত্র প্রলেপ সে খুঁজিয়া পাইতেছিল দাদুর ঐ কয়েকটী কথার ভিতর। তবুও অনি স্থির হইয়া ভাবিতেছিল—সেটা দাদুর সত্যকার আদেশ, না—স্নেহের কাছে পরাজয় স্বীকার! তাঁহার চিত্তে তো কখনই দুর্ব্বলতা ছিল না!

* * * *

অনেকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে বসিয়া থাকার পর, সহসা খেয়াল হইতেই অনি চাহিয়া দেখিল—খোলা জানালাপথে বৃষ্টির ছাট্ আসিয়া সব ভিজিয়া গিয়াছে। মেজরের ঘরের জানালা তখনও বন্ধ করা হয় নাই, সে কথা মনে হইতেই অনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া মেজরের ঘরে আসিল।

* * * *

মেজর সমস্ত জানালা দরজা আরও ভালরূপে খুলিয়া দিয়া সোফার উপর চোখ বন্ধ করিয়া পড়িয়া ছিলেন। দুধ ও পাঁউরুটি টিপয়ের উপর ঠাণ্ডা হইয়া পড়িয়া আছে। অনি বুঝিল—মেজর সচেতন, কিন্তু ডাকিয়া কোন সাড়া পাইল না।

মেজরের এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিমানের সহিত অনি পূর্ব্ব হইতেই পরিচিতা ছিল। মেজর তাঁহার জীবনের প্রত্যেকটী মুহূর্ত্তকে সেই সাময়িক বিশিষ্টতা মাত্র লইয়াই বিচার করিয়া দেখিতেন। জীবনের পশ্চাৎ ও সম্মুখের দিকে চাহিয়া চলিবার ধৈর্য্য তাঁহার কখনই ছিল না। এক একটা মুহূর্ত্তের তীব্র খেয়াল তাঁহার সমস্ত অতীত ও ভবিষ্যৎকে ছাপাইয়া উঠিত। মেজরের এইরূপ সাময়িক উত্তেজনা-গুলিকে অনি উত্তমরূপে চিনিয়াছিল বলিয়াই, দ্বিতীয় কোন চেষ্টা না করিয়া গ্রীন্‌-শেডে আলোটী ঢাকিয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অনি যেন ইচ্ছা করিয়াই তাহার সঙ্কোচের উন্মুক্ত রশ্মিকে আবার ধীরে ধীরে টানিয়া তাহার গতি ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছিল।

(৮)

বনবিহারীবাবুর একান্ত অনুরোধে সেদিন সন্ধ্যায় অনি ও মেজর তাঁহার প্রবাস-কুটীরে নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য উপস্থিত না হইয়া পারিলেন না। এ নিমন্ত্রণে মেজর বিশেষ প্রীত না হইলেও, অনি আনন্দিত হইয়াছিল। সে তাহার দুশ্চিন্তা-পীড়িত অবসরে এইরূপ একটা অবলম্বনই কয়েক দিন হইতে খুঁজিতেছিল।

মেজরের অপ্রীতির কোন কারণই হয় তো ছিল না। কিন্তু তাঁহার অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য সর্ব্বদার জন্য এরূপ একটা হেঁয়ালি করিয়া তাঁহাকে ঢাকিয়া রাখিত, যাহাতে তাঁহার অন্তরের ক্ষুদ্র ভাবও বহির্জগতের চক্ষে একটা অকারণ গুরুত্ব লইয়া চলিত। যাহারা অস্বাভাবিকরূপে গম্ভীর তাহাদের ছদ্ম আবরণ সহজে ভেদ করা যায় না বলিয়াই মানুষ তাহাদের নিতান্ত মূল্যহীন উপাদানগুলিকেও সমীহ করিয়া চলে।

* * * *

ষ্টেশনের কিছুদূরে—প্রকাণ্ড খাল্‌টার পাশে, ছোটবড় নিমগাছের সারির আড়ালে ঢাকা বনবিহারী বাবুর মস্ত বাংলো ও রেলকর্ম্মচারিদের ছোট ছোট কয়েকটী একতলা বাসা। পুরানো লাইনের রেলগুলিকে তুলিয়া ফেলিয়া পাথর ও পোড়া কয়লা পিটাইয়া তাহাকেই রাস্তা করা হইয়াছে। বিশ বৎসরের সঞ্চিত পাথর কুচি ও রাশি রাশি ছাই সর্ব্বত্রই এরূপ কায়েমী স্বত্বে জমিয়া বসিয়াছে যে সমস্ত স্থানটীই যেন মরুভূমির মত শুষ্ক ও নীরস হইয়া গিয়াছে।

বহু যত্নে এই নীরস মাটির বুকে উর্ব্বরতা সঞ্চার করিয়া বনবিহারী বাবু তাঁহার বাংলোর সংলগ্ন ময়দানটীতে ছোট্ট একখানি সুন্দর বাগান গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। চারি দিকে লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা; মাঝে মাঝে দেবদারু ও ইউক্যালিপ্‌টাস্‌ মাথা তুলিয়া আছে; তাহারি মাঝে অজস্র এব্রিকট্‌ ও সিজ্‌নের ফোটা ফুলগুলি বাড়ীখানাকে যেন একটা সুন্দর কবিতার মত করিয়া রাখিয়াছে।

ছুরি আর আইডিনের ভিতর দিয়াও যে ক্যাপ্টেন তাঁহার কাব্যরুচিকে সজীব করিয়া রাখিয়াছিলেন, তজ্জন্য অনি তাঁহাকে সহস্রবার ধন্যবাদ জানাইয়াছিল।

সন্ধ্যার পর মেজর, অনি, বনবিহারী ও তাঁহার পত্নী

সুলতা বাগানের মার্ব্বেল বেদীটির উপর বসিয়া গল্প জমাইয়া তুলিয়াছিল। সুদূর প্রবাসে অপরিচিতের ভিড়ের মাঝখানে সহসা স্বদেশীকে খুঁজিয়া পাইলে, মানুষ যেরূপ অপ্রত্যাশিত আনন্দে ভরিয়া উঠে, সুলতাকে পাইয়া অনিও সেইরূপ একটা অপূর্ব্ব আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। সুলতার সহিত নানা গল্পে অনি এতই মাতিয়া গিয়াছিল যে, মেজর ও বনবিহারী বাবুর কথায় যোগ দিবার অবসর তাহার ছিল না।

রাত্রি হইতেছে দেখিয়া বনবিহারীবাবু বয়কে ডাকিয়া সকলের খাবার ঠিক্ করিয়া দিতে বলিলেন। হঠাৎ সকলের খাবার কথা শুনিয়াই অনির চমক্ ভাঙিয়া গেল। তাড়াতাড়ি বনবিহারীর দিকে ফিরিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া অনি বিশেষ লজ্জিতা হইয়া কহিল—"মাপ্ ক'রবেন, ক্যাপ্টেন্! আমি পূর্ব্বে বল্‌তে ভুলে গেছি। আমার তো—"

বনবিহারীবাবু জানিতেন—অনির কতকগুলি সংস্কার আছে। কিন্তু সে কুসংস্কারের দড়ি যে এখনো তাহার নাকে কাণে টান দিয়া রাখিয়াছে, তাহা ভাবিয়া তিনি যেন বিশেষ আশ্চর্য্য হইয়াই কহিলেন—"সে কি কথা! সংস্কারের মোহ আপনার এখনো কাটে নি? তা হ'তেই পারে না; গরীবের কুটীরে যখন দয়া ক'রে পদার্পণ ক'রেছেন, তখন অন্ততঃ আজকার মত ও-সংস্কারটাকে ছাড়্‌তেই হবে। যা হোক্ একটু কিছু মুখে না দিলে তো চল্‌তে পারে না অনি দেবী।"

অনি হাতজোড় করিয়া বলিল—"ক্ষমা করুন ডাক্তার-বাবু, যা এতদিনেও মন থেকে দূর ক'রতে পারি নি, জোর ক'রে তাকে ঝেড়ে ফেল্‌বার ক্ষমতা আমার নাই। তবে এ কথা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করে' যাচ্ছি যে, আমার তরফ থেকে আপনার আতিথেয়তার কোন ত্রুটিই পাই নি। আমি না খেয়েও যে তৃপ্তি ও আনন্দ পেয়েছি, খেয়ে তার চেয়ে বেশী কখনই পেতুম্ না।"

বনবিহারীবাবু বুঝিলেন—ইহা অনির একটা ছদ্ম আবরণ মাত্র। এইখানেই যে তাহার একটা প্রকাণ্ড দুর্ব্বলতা আছে তাহা তিনি জানিতেন। মানুষকে জয় করিবার প্রশস্ত উপায় তাহার দুর্ব্বলতাকে আক্রমণ করা। সেদিন চেষ্টা করিয়াও বনবিহারী অনিকে হার মানাইতে পারেন নাই; কিন্তু সেই দুর্ব্বলতাকে পুনরাক্রমণ করিবার লোভ তাঁহার যথেষ্টই ছিল। যাহাকে সহজে আঁটিয়া উঠা যায় না, দুর্ব্বলতার অবসর লইয়া তাহাকে বিব্রত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে তিনি ত্রুটি করিতেন না। বনবিহারীবাবু বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন—"দুনিয়ায় শুধু নিজের তরফের তৃপ্তিটা দেখ্‌লেই চলে না; পরের তরফ্ বলেও একটা জিনিষ আছে। মাপ্ কর্‌বেন; আপনাদের এই যে সংকীর্ণতা—যা শুধু নিজের তরফটাকেই দেখ্‌তে শিখিয়েছে—তার মূল কারণ ঐ কুসংস্কারের পচা আবর্জ্জনা। ওই আবর্জ্জনাই আমাদের সমাজ, দেশ, জাতীয়তা—সব কিছুকেই পঙ্কিল ক'রে তুলেছে। এইটাই সব চেয়ে দুঃখের বিষয় যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ও এই সব আবর্জ্জনাগুলোকে ঝে'ড়ে ফেলে, ভিতরটাকে পরিষ্কার ক'রে ফেল্‌তে পারে নি। ঐ সব বাজে সংস্কার,—না আছে তার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, না আছে কোন বাস্তব মূল্য—বেড়াজালের মত ঘিরে ঘিরে দেশটাকে উচ্ছন্নের পথে টেনে নিয়ে গেছে,—জাতিটাকে অধঃপতনের চরম সীমায় এনে দাঁড় করিয়েছে। এ বাঁধন যতদিন না ছিঁড়্‌বে, ততদিন বিশ্বমানবের পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা পাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। শিক্ষা পেয়েও যাদের সে জ্ঞান হয় না, তাদের শিক্ষার কোনই মূল্য নেই; তা'দিকে শিক্ষিত ব'লে ধারণা ক'রতেই আমি পারি না।"

বনবিহারীবাবুর কথার মধ্যে যে উষ্ণতা ছিল, তাহা উপলব্ধি করিলেও অনি বেশ ধীর অথচ দৃঢ়ভাবে বলিল—"ওই নিয়ে তর্ক ক'র্‌বার ইচ্ছা আমার নেই, ক্যাপ্টেন্! জীবনের পথে যার যা ভাল লাগে সে তাই নিয়ে চল্‌বে; তাতে সমালোচনার কিছু নেই। তবে মূর্খ যে ভুলটা ক'রে চ'ল্‌ছে—আপনারাও যে সেই ভুলটাকে পরিত্যাগ ক'র্‌বার চেষ্টায় নতুন ভুলে জড়িয়ে যাচ্ছেন কেন, সেইটা আমি বুঝ্‌তে পা'র্‌ছি না। একটা বিধিবদ্ধ সামাজিক রীতিকে অবিচারিতভাবে মেনে চলাই যদি সংস্কার হয়, তবে সর্ব্বপ্রযত্নে সেই সব সংস্কারকে অবিচারিত ভাবে শুধু 'সংস্কার' বলেই বাদ দিয়েও ঘৃণা ক'রে চ'ল্‌বার বিধিবদ্ধ রীতিটাও কি সংস্কার নয়? সংস্কার হ'লেই কি সেটাকে ঘৃণা ক'রতে হবে? বিশেষতঃ আপনি যাকে সংস্কার

TIGHT BINDING.

বলেন—তা যে দুনিয়ায় নেই কোন্ জাতির, তা ঠিক্ বুঝে উঠ্‌তে পারি না।"

অনির কথায় বাধা দিয়া বনবিহারীবাবু বলিলেন—"তা ব'ল্‌বেন না অণিমা দেবী। দুনিয়ার সভ্য জাতিদের যদিও কোনো সংস্কার থাকে, তবে সে সংস্কারের নিশ্চয় কোনো একটা বৈজ্ঞানিক মূল্য আছে। নিছক্ গোঁড়ামি যাকে বলে, তা তাদের নেই।"

পূর্ব্ববৎ ধীরভাবেই অনি বলিয়া চলিল—"তা নয় ক্যাপ্টেন, সকল জাতিরই এমন অনেক সংস্কার আছে, যার বৈজ্ঞানিক মূল্য মিল্‌বে না। তবুও সেগুলোকে তারা মানে, কারণ সেগুলো তাদের সাম্প্রদায়িক বা জাতীয় বৈশিষ্ট্য; এক কথায় যাকে 'স্বাতন্ত্র্য' বলা যেতে পারে। বুঝ্‌লেন?"—ঈষৎ হাসিয়া অনি বনবিহারীর পানে চাহিল।

বনবিহারী বোধ হয় তাহাতে আরও একটু জ্বলিয়া উঠিয়া বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই কি বলিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু অনি তাড়াতাড়ি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিল—"আর আপনি যে ব'ল্‌ছিলেন—'ভিত্তিহীন সংস্কারগুলোই জাতির উন্নতির পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছে, বিশ্ব-প্রেম ক'র্‌বার মত আমাদের অন্তরকে প্রশস্ত হ'য়ে উঠ্‌তে দিচ্ছে না।' সেটা মস্ত ভুল। ঐ আবর্জ্জনাই আমাদের পথ রোধ ক'রছে, না—তাকে না-জেনে না-চিনে, আবর্জ্জনা ব'লে ঘৃণা ক'র্‌বার সঙ্কীর্ণতা আমাদের পথ রোধ ক'রছে, তা ঠিক্ বলা যায় না। আমার মনে হয়, 'নিজস্ব'কে অবহেলা ক'রে, 'পরস্ব'কে পূজো ক'র্‌বার কাপুরুষতাই আমাদের পিছিয়ে রেখেছে। যে মা-ভাইকে ভালবাস্‌তে পারে না, তার পক্ষে বিশ্ব-সেবায় আত্মনিয়োগ ক'র্‌বার ইচ্ছাটা নিতান্ত বাতুলতা নয় কি? জন্মগত বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জ্জন দিয়েও দশা কতকটা তাই ঘটে; সিঁড়ি ভেঙে ফেলে চারতলায় উঠ্‌বার পথ পরিষ্কার করার মত। কবি-কল্পনার বিশ্ব-প্রেম আর বাস্তব বিশ্ব-প্রেমে অনেক তফাৎ। নিজস্বকেই ব্যাপ্ত ক'রে নিয়ে পরস্বের সঙ্গে মিল করাতে হবে; ছেঁটে ফেলে নয়।"

"তা' কখনই হ'তে পারে না অনিদেবী। নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিকে যদি মূল্যহীন ব'লে বুঝ্‌তে পারি, তবে সেটাকে ত্যাগ ক'রতেই হবে। যা মেনে চলে' এতকাল কোন লাভই হয় নি, সেটা যে কেবলমাত্র ভার হ'য়ে আমাদের ঘাড়ে চেপে আছে, তা আপনাকে স্বীকার ক'রতেই হবে। ঐ ভার যত দিন ঘাড় থেকে না নাম্‌বে, ততদিন আমাদের কোন আশাই নাই। এতদিন হয়তো মূল্য যাচাই ক'রতে পারে নি ব'লে লোকে তাকে মেনে এসেছে।"

"তা হবে। তবে এ জাতি যেদিন স্বাধীনতা ও সভ্যতার শীর্ষ স্থান অধিকার ক'রেছিল, সেদিনও তাদের ঐ বৈশিষ্ট্য ছিল। নিজেদের গৌরবের জন্যে তারা বুক পেতে দিতে পেরেছিল ব'লেই তাদের আসন তারা বিশ্বগৌরবের মাঝখানে দাঁড় করাতে পেরেছিল। পরের মর্য্যাদাকে পূজো ক'রতে গিয়ে তারা নিজের স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জ্জন দেয় নি। আপনি কি ব'ল্‌তে চান্ যে, তারা ঐ স্ব বৈশিষ্ট্যের মূল্য যাচাই ক'রতে পারে নি ব'লেই তাকে মেনে চলেছে!" বলিয়াই অনি একটু হাসিল।

বনবিহারীবাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া একটু বিরক্ত হইয়াই বলিলেন—"আপনার যুক্তির কোন মাথামুণ্ডই নেই অণিমা দেবী। সভ্য জগৎ যাকে মূল্যহীন বলে' বুঝ্‌তে পেরেছে, তা যে মূল্যহীন তাতে কোন সন্দেহই নেই। বাস্তব জীবনে আমরা ওসবের কোন মূল্য বুঝ্‌তে পারি না; সুতরাং তাকে মাথায় তুলে নিয়ে, অকারণ নিজের মূর্খতাকে জাহির করা হয়। এতে কোন লাভই নেই, বুঝ্‌লেন!"

অনি পুনরায় বেশ দৃঢ় ও গম্ভীর হইয়াই বলিল—"লাভ আছে কি না আছে তা নিয়ে তর্ক চলে না। তবে এত দিন যাতে কোন লোকসান্ হয় নি, তাকে বাদ দিলে যে লাভ হবে তার কোন মানে নাই। মূল্য যাচাইএর কথা বল্‌চেন; কিন্তু এটা মনে রাখ্‌বেন বনবিহারীবাবু যে—ত্যাগের ভিতর দিয়ে যার প্রতিষ্ঠা গড়ে' উঠেছে, ভোগের ভিতরে বসে' তার ওজন যাচাই করা যায় না। তাতে সব কিছুই বিকৃত বলে' মনে হয়। যার বাস্তব মূল্য আমরা বুঝ্‌তে পারি না, তার সবগুলোকেই যদি বাদ্ দিয়ে চ'ল্‌তে হয়, তা হ'লে তো দেখ্‌ছি শেষ পর্য্যন্ত পুরোদস্তর নাস্তিক হ'য়ে উঠ্‌তে হবে।"

অনির কথা শেষ না হইতেই সুলতা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"তা কি আর ব'ল্‌তে দিদি! ওঁর মত পুরো নাস্তিক আর দুটি নেই। ওঁর সঙ্গে তর্ক করা মিছে। উনি ভাঙ্‌বেন—তবুও নুইবেন না।"

সুলতা এতক্ষণ অবাক্ হইয়া ইঁহাদের যুক্তিতর্ক শুনিতেছিল। অনির ভিতরে যে এত কথা বলিবার শক্তি আছে, তাহা সে ভাবিতেই পারে নাই। স্বামীর নাস্তিকতাকে সে সর্ব্বদা মানিয়া লইতে পারিত না বলিয়া, অনেক দিন অনেক কথা লইয়া তাঁহার সহিত তর্ক করিয়াছে; কিন্তু তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। অনির নিকট তাঁহাকে বিব্রত হইতে দেখিয়া সুলতা বেশ একটু আমোদ পাইতেছিল; যদিও তাহার অন্তরের গোপন ইচ্ছাশক্তি স্বামীকে জয়ী করিবার জন্য যথেষ্টই চেষ্টা করিয়াছিল।

সুলতার হাতখানাকে চাপিয়া ধরিয়া অনি হাসিয়া বলিল—"নাস্তিক তো আমরা সবাই বোন্! তবে তফাৎটা হ'চ্ছে এই যে—নাস্তিক হ'লেও আমরা মূর্খ। ওঁদের মত বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় তো নেই; কাজে কাজেই ওঁদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমরা চ'ল্‌তে পারি না। বিদ্বান্ যদি নাস্তিক হন্, তবে তাঁর নাস্তিকতা ও অবিশ্বাসের সীমা মূর্খ নাস্তিকের গণ্ডীকে ছাড়িয়ে যায়। তিনি তাঁর জ্ঞান-গরিমায় যে সব মূল্যবান্ সংস্কারকেও তুচ্ছ ক'রে অবহেলার সঙ্গে পায়ে দ'লে যান্, মূর্খ তা' পারে না। নিজের অজ্ঞতায় মূর্খ যে সংস্কারের রুদ্ধদ্বারে প্রবেশ ক'র্‌তে পারে না, উর্ব্বর-মস্তিষ্ক পণ্ডিতের মত অনুমান ও কল্পনাপ্রসূত সিদ্ধান্তের সাহায্যে সে বিষয়ের সমৃদ্ধি অস্বীকার ক'রতে তা'র একটা অজ্ঞাত সঙ্কোচ আসে। মূর্খ যেটাকে ভক্তি করে না, সেটাকে ভয় করে, অন্ততঃ যত দিন শক্তির মল্ল পরীক্ষায় সে জয়লাভ ক'রতে না পারে।"

কথায় কথায় রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া, বনবিহারীবাবু সহসা তাঁহার অভ্যস্ত হাসিতে সমস্ত বাঁধ ভাঙিয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আর নয়; আজও না হয় আমিই হার মেনে নিচ্ছি। রাত্রি অনেক হ'য়ে গেছে। অন্ততঃ একটু জলযোগ ক'রেও আমাকে সুখী ক'র্‌বেন বলে' আশা করি অণিমা দেবী।"

মেজর এতক্ষণ মৌনভাবে বসিয়া ইহাদের আলোচনা শুনিতেছিলেন হঠাৎ একটা ধাক্কা খাইয়াই যেন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—"ব্রেভো! ক্যাপ্টেন! আমার কাছে যেটা শুধু দীর্ঘনিশ্বাসের রূপ নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, আপনি যে তার স্বরূপটাকেই পেয়েছেন, তার জন্য আপনার সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না।"

এ কথার তাৎপর্য্য বনবিহারী বাবু কিছুই বুঝিলেন না, কিন্তু অনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—"এ বিকৃত-স্বরূপ আবিষ্কারের কৃতিত্ব ওঁর সৌভাগ্যের, না উর্ব্বর কল্পনার—তা উনিই ভালো জানেন।"

মেজর রায়ের মুখে যেন একটা অস্পষ্ট হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল। স্বল্প-আলোকিত অন্ধকারের মধ্যে তাহা কেহই লক্ষ্য করিতে পারিল না। বনবিহারীবাবু মেজরের হাত ধরিয়া তাঁহাকে ডাইনিং রুমে লইয়া চলিলেন; অনি বসিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল।

সুলতা একখানি থালায় করিয়া কতকগুলি ফল আনিয়া অনির সম্মুখে উপস্থিত করিল। এ ব্যবস্থা বনবিহারী বাবুই পূর্ব্ব হইতে করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু অনি তাহা বুঝিতে পারে নাই। (ক্রমশঃ)

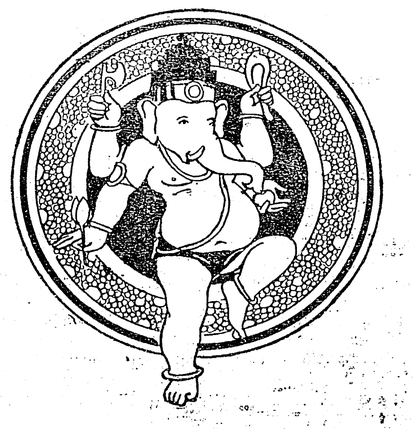

রবীন্দ্র-জয়ন্তী *

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল

বাঙ্গালার আজ মহাসৌভাগ্য। যাঁহার গৌরবে আজ এ দেশ গৌরবান্বিত, আমরা সেই কবির সপ্ততি বৎসরের উৎসব করিতেছি। এ সৌভাগ্য এ অভাগ্য দেশের কদাচিৎ ঘটে। যে সব মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া এ দেশের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন, তাঁরা প্রায়ই অকালে বিদায় লইয়াছেন—সত্তর বৎসর প্রায় কেহই অতিক্রম করেন নাই। আজ এ দুর্নিয়মের দুইটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাঙ্গলার অশেষ সৌভাগ্য সূচনা করিতেছে। একটি রবীন্দ্রনাথ, আর অপরটি তাঁরই অভিন্নহৃদয় সুহৃদ্ জগদীশচন্দ্র।

আরও সৌভাগ্যের কথা এই যে সত্তর বৎসর বয়ঃক্রমে রবীন্দ্রনাথ স্থবির বা নিষ্ক্রিয় নহেন; তাঁর প্রতিভা আজও পরিপূর্ণ গৌরবে দেদীপ্যমান। আজ আমরা যাঁর পূজায় সমবেত হইয়াছি, সে রবি অস্তাচলগত ক্ষীণদীপ্তি ভাস্কর নহেন, আজও তাঁর প্রতিভা মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের পরিপূর্ণ দীপ্তিতে ভাস্বর। কালের নিয়মে তাঁর শরীরে আজ হয় তো বার্দ্ধক্যের চিহ্ন স্পর্শ করিয়াছে, কিন্তু অন্তর যে তাঁর আজও "যৌবন বেদনা রসে উচ্ছল", তাঁর অনুভূতি ও প্রকাশের শক্তি যে আজও যৌবনের মতই প্রবল ও দ্যুতিমান, সে কথা তিনি না বলিয়া দিলেও আমরা অনায়াসে অনুভব করিতে পারিতাম।

তাই আজ সমস্ত বঙ্গদেশ, সমস্ত ভারত, সমস্ত জগৎ বাঙ্গলার এই গৌরব-রবির আনন্দ-কল্লোলময় স্তবগানে মুখর হইয়া উঠিয়াছে; দিকে দিকে রবীন্দ্র-জয়ন্তীর মঙ্গলগাথা ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। মিথিলার কেন্দ্রস্থলে আপনারা তাঁর যে জয়ন্তী-উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন, তাহাতে আমাকে যোগদান করিতে আমন্ত্রণ করিয়া আমাকে মহা-সম্মান ও আনন্দ দান করিয়াছেন। আপনাদিগকে আমি কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব জানি না।

বিহার আমার কাছে বিদেশ নয়। আমার শৈশবের অনেকগুলি বৎসর এই প্রদেশে কাটিয়াছে। মজঃফরপুরের অনতিদূরে মোতিহারীতে আমার শৈশবের যে কয়টি আনন্দময় বৎসর কাটিয়াছে তার স্মৃতি যে আমার অন্তরে বিলুপ্ত হয় নাই, যাঁরা আমার উপন্যাসগুলি পড়িয়াছেন তাঁহারা সে কথা স্মরণ করিতে পারিবেন। সাহিত্য-সাধনায় আমি কোনও কৃতিত্ব লাভ করিতে পারিয়াছি কি না জানি না, কিন্তু যদি সে সৌভাগ্য আমার হইয়া থাকে, তবে আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিব যে, আমার সে সফলতার প্রথম বীজ উপ্ত হইয়াছিল এই দেশে আমার শৈশবে। মোতিহারী স্কুলে পড়িবার সময়ই সাহিত্য-রচনার কল্পনা আমার মস্তিষ্কে প্রথম প্রবেশ করে—সেইখানেই আমি আমার প্রথম কবিতা রচনা করি। কি লিখিয়াছিলাম স্মরণ নাই, স্মরণ করিবার প্রয়োজনও নাই, কেন না স্মরণ করিয়া রাখিবার মত কিছু তখন লিখি নাই। কিন্তু বেশ স্মরণ আছে যে, লিখিবার কল্পনা ও ব্যর্থ চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল এই দেশেই। সুতরাং বিহার প্রদেশের আহ্বান আমার কাছে পরম লোভনীয় হইয়াছিল এ কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু এ তো শুধু বিহারের আহ্বান নয়—এ আহ্বান আপনাদের মুখপাত্র হইয়া পাঠাইয়াছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে একজন সেই মহীয়সী নারী যাঁর নাম বঙ্গভারতীর সভায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া গিয়াছে, বঙ্গসাহিত্যের মুকুটমণি-মালিকায় যিনি একটি পরম ভাস্বর রত্ন। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর কাছে এ আহ্বান আমার পক্ষে এতবড় সম্মান যে আমি ইহাতে যদি একটু অসঙ্গতরূপ গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকি তবে হয় তো আপনারা আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।

আপনাদের রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসবে সভাপতিত্ব করিতে নিমন্ত্রিত হইয়া তাই আমি নানা কারণে সম্মানিত, গর্ব্বিত ও উল্লসিত হইয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিয়া আমি আপনাদিগকে এমন কোনও কথা বলিতে পারিব না যাহাতে আপনাদের তাক্ লাগিয়া যাইবে। তবু রবীন্দ্রনাথকে আমি যেমন ভাবে বুঝিয়াছি, এবং তাঁর গৌরব আমার চোখে যেমন করিয়া লাগিয়াছে, সে সম্বন্ধে গোটা কয়েক কথা আপনাদের কাছে আলোচনা করিব।

* মজঃফরপুরে—সভাপতির অভিভাষণ

রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমি যখন প্রথম পড়িয়াছিলাম—সে আজ অনেক দিনের কথা—তখন আমার সব চেয়ে বেশী বিস্ময় ও আনন্দ হইয়াছিল এই দেখিয়া যে, আমার মনের ভিতর যে সব অস্পষ্ট অনুভূতি উঁকি ঝুঁকি মারে, সেই সব কথা তিনি অপূর্ব্ব সুন্দর ভাষায় সুস্পষ্ট করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। কৈশোরে ও যৌবনে যখন তাঁর "মানসী" ও "সোণার তরী" পড়িয়াছিলাম, তার পর অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে যখন তাঁর 'চিত্রা' পড়িয়াছিলাম, তখন ঠিক এই কথা মনে হইয়াছিল অনেকগুলি কবিতা পড়িয়া। তার পর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শনশাস্ত্রের বোঝা মাথায় লইয়া যখন বাহির হইলাম, তখন 'নৈবেদ্য' পড়িয়া দেখিতে পাইলাম যে, যে-সব তত্ত্ব লইয়া দর্শন এত মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করিয়াছে তার কি সরস সুন্দর সুস্পষ্ট প্রকাশ 'নৈবেদ্যে'র কবিতায়। তার পর, সে বিস্ময় কাটিয়া গেল, কিন্তু তৃপ্তি রহিয়া গেল। যখনি যাহা পড়িয়াছি তখনই অনুভব করিয়াছি কবি যেন আমার মনের কোন অস্পষ্ট অনুভূতি টানিয়া বাহির করিয়া তাকে অপরূপ ভাষায় এক লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি দান করিয়াছেন তাঁর কবিতায়।

এইটিই কবির কাজ, এইখানেই কাব্যের সার্থকতা, ইহাতেই তার মাধুর্য্য। কবি এমনি করিয়া সবার মনের ভাষা ফুটাইয়া বলিতে পারেন বলিয়াই তাঁর লেখা তাঁর পাঠকের চিত্ত হরণ করে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্য-জীবনে, বিভিন্ন বয়সের অনুভূত নানা বিচিত্র বেদনা এমনি করিয়া সুপটু তুলিকার গৈরব স্পর্শে সূক্ষ্ম রেখায় চিত্রিত করিয়া বিশ্বমানবের সর্ব্ববিধ বিচিত্র অনুভূতি এমন পরিপূর্ণভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন যে, সকল দেশের সকল মানুষ ইহার ভিতর কোথাও না কোথাও তার মনের সব কথারই প্রকাশ দেখিতে পায়। শিশু পায় শিশু-চিত্তের ভাব ও চিন্তার প্রকাশ, যৌবন পায় যৌবনের তীব্রতম ও সূক্ষ্মতম অনুভূতির পরিচয়, পরিণত-বয়স্ক পায় তাদের গভীরতর চিন্তা ও অনুভূতির সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি। প্রতি মানবের মনের গোপন কন্দরে যেখানে যে ক্ষীণ অশ্রুত শব্দটি আছে, তাহা যেন রবীন্দ্রনাথের লেখনী-মুখে মাইক্রোফোনের ভিতর নিঃশ্বসিত ক্ষীণ শব্দের মত পরিপুষ্ট হইয়া সারা বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জগতের কোনও কবিই মানব-চিত্তকে এরূপ ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না। এতটা অন্তর্দৃষ্টি, এতটা সহানুভূতি, এতখানি দরদ, এত পরিপূর্ণ রূপবোধ, এমন অপরূপ বিকাশপটুত্ব দিয়া খুব অল্প কবিই মানব-চিত্তের দলগুলি বিকশিত করিয়া তার অন্তরের সকল শোভা পরিস্ফুট করিয়া দেখাইয়াছেন। যাঁরা করিয়াছেন তাঁদের ভিতরেও অনুভূতির এতখানি ব্যাপকতা, এত অপরূপ বৈচিত্র্য থাকা সম্ভব হয় নাই, কেন না রবীন্দ্রনাথের মত দীর্ঘ সাহিত্য-জীবন ভরিয়া মানব-চিত্তের সবগুলি স্তর এমন পরিপূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার সৌভাগ্য সকলের হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ অনেক কিছু—অনেক রকমে অনেক কর্ম্মে তিনি আপনাকে আমাদের কাছে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সকল কর্ম্মে, জীবনের সকল প্রকাশে তিনি আদ্যোপান্ত কবি, রূপ রসের তিনি উপাসক।—যাহা কিছু তিনি করিয়াছেন সকলই তিনি রূপরসে মণ্ডিত করিয়াছেন। তাই দর্শন ও পলিটিক্সের মত বিষয়কেও তিনি কাব্যরসে মণ্ডিত করিয়াছেন। তাঁর দর্শন কঠোর তত্ত্বের সমষ্টি নয়, তাঁর অনুভূত সত্যের রসরূপ তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁর পলিটিক্স সমাজ-জীবনের একটি সৌষ্ঠবযুক্ত, শোভা ও মঙ্গলময় কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর বিশ্বরাষ্ট্রের কল্পনা মানবচিত্তের মূলগত শিবসুন্দরের রসমূর্ত্তির প্রকাশ!

এই কবির দৃষ্টি ও অনুভূতি লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—চিরদিন কবির দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছেন প্রকৃতিকে, জগৎকে, জীবনকে। তাঁর সেই দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবন তার রূপরসময় মূর্ত্তিতে তাঁ'র জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রূপে দেখা দিয়াছে;—সেই বিভিন্ন রূপের একটা সামান্য পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

কৈশোরের কবি প্রকৃতির সুধু রূপরসে ভরপুর। রূপময়ী সে প্রকৃতি সুধু নয় তাহা প্রাণময়ী—তার রূপের ও প্রাণের খণ্ডখণ্ড প্রকাশ তাঁর মুগ্ধ চিত্তে যে ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন তাঁর আবেগময় ভাষায়। ক্রমে তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে প্রকৃতির সমগ্র রূপ, তার সমগ্র প্রাণ। সেই অনুভূতির গৌরবে মহিমান্বিত

হইয়া উঠিয়াছে পরিণত যৌবনের রচনা। তার প্রকাশ "সোণার তরী" ও "চিত্রার" বহু কবিতায় আছে। দু' একটি দৃষ্টান্ত দিব। 'যেতে নাহি দিব" কবিতায় কন্যার কণ্ঠে 'যেতে নাহি দিব' বলিয়া আবদার শুনিয়া কবি—

চলিতে চলিতে পথে হেরি দুই ধারে
শরতের শস্যক্ষেত্র নত শস্যভারে
রৌদ্র পোহাইছে। তরুশ্রেণী উদাসীন
রাজপথপাশে চেয়ে আছে সারাদিন
আপন ছায়ার পানে। বহে খর বেগ
শরতের ভরা গঙ্গা। শুভ্র খণ্ড মেঘ
মাতৃদুগ্ধ পরিতৃপ্ত গোবৎসের মত
নীলাম্বরে শুয়ে। দীপ্ত রৌদ্রে অনাবৃত
যুগ যুগান্তর ক্লান্ত দিগন্ত বিস্তৃত
ধরণীর পানে চেয়ে ফেলিনু নিঃশ্বাস।
কি গভীর দুঃখ মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী। চলিতেছি যতদূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্ম্মান্তিক সুর
"যেতে আমি দিব না তোমায়।" ধরণীর
প্রান্ত হ'তে নীলাভ্রের সর্ব্বপ্রান্ততীর
ধ্বনিতেছে চিরদিন অনাদ্যন্ত রবে
"যেতে নাহি দিব। যেতে নাহি দিব।" সবে
কহে "যেতে নাহি দিব।" তৃণ ক্ষুদ্র অতি
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে, "যেতে নাহি দিব।"
আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব' নিব'
আঁধারের গ্রাস হ'তে কে টানিছে তারে
কহিতেছে শতবার "যেতে দিব নারে।"
এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্ত্য ছেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন কথা সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন "যেতে নাহি দিব।"—

"বিশ্বনৃত্য", "বসুন্ধরা" প্রভৃতির মধ্যে এমনি সমগ্র প্রাণময়ী প্রকৃতির রসমূর্ত্তি কবি প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আর একটি কবিতামাত্র আমি উদ্ধার করিব। "সন্ধ্যা"য় কবি বলিয়াছেন—

গৃহকার্য্য হ'ল সমাপন,
কে ওই গ্রামের বধূ ধরি বেড়াখানি
সম্মুখে দেখিছে চাহি, ভাবিছে কি জানি
ধূসর সন্ধ্যায়।

অমনি নিস্তব্ধ প্রাণে
বসুন্ধরা দিবসের কর্ম্ম অবসানে,
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া, আছে চাহি
দিগন্তের পানে;

* * * *

ধীরে যেন উঠে ভেসে
ম্লানচ্ছবি ধরণীর নয়ন নিমেষে
কত যুগ যুগান্তের অতীত আভাস
কত জীব জীবনের জীর্ণ ইতিহাস।
যেন মনে পড়ে সেই বাল্য নীহারিকা
তার পরে প্রজ্বলন্ত যৌবনের শিখা
তার পরে স্নিগ্ধ শ্যাম অন্নপূর্ণা লয়ে
জীবধাত্রী জননীর কাজ, বক্ষে লয়ে
লক্ষ কোটী জীব—কত দুঃখ কত ক্লেশ,
কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু নাহি তার শেষ,
ক্রমে ঘনতর হ'য়ে নামে অন্ধকার,
গাঢ়তর নীরবতা,—বিশ্বপরিবার
সুপ্ত নিশ্চেতন। নিঃসঙ্গিনী ধরণীর
বিশাল অন্তর হ'তে উঠে সুগম্ভীর
একটি ব্যথিত প্রশ্ন ক্লিষ্ট ক্লান্ত সুর
শূন্যপানে—"আরো কোথা?" "আরো কতদূর?"

সমগ্র পৃথিবী সমগ্র প্রকৃতির সঙ্গে এখন কবি মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তার প্রাণের গভীরতম কথা যেন তাঁর হৃদয়ে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু ইহাই তাঁর প্রকৃতির পরিচয়ের শেষ স্তর নয়। 'নৈবেদ্য' ও "গীতাঞ্জলী"র কবিও প্রকৃতির রূপরসে ভরপুর, সমগ্র প্রকৃতি তাঁর অন্তরে রসের সঞ্চার করিতেছে। কিন্তু সে প্রকৃতি শুধু প্রকৃতি নয়, নিজস্ব একটি প্রাণের অনুভূতিতে তিনি বিভোর নন, এই স্তরে প্রকৃতি ভগবানের রূপ, তার অশেষ রূপলাবণ্যের ভিতর কবি দেখিতেছেন সেই রূপরসের অশেষ সৌন্দর্য্য। "শ্রাবণ ঘন গহন-মোহে" তিনি তাঁর "গোপন চরণ" দেখিতে পান। এখনও—

শালের বনে থেকে থেকে
ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে

জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে
মাঠের পরে

কিন্তু তাহা দেখিয়া কবি ভাবেন—

মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে
নৃত্য কে করে!

গীতাঞ্জলির ছত্রে ছত্রে এই ভাব—প্রকৃতির অপরূপ শোভার অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে সে শোভার উৎসের সন্ধান পাইয়াছেন কবি তাঁর জীবন দেবতার রসে রূপে। তার দৃষ্টান্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

কবির হৃদয়ের এই অনুভূতির পর কবির ভিতর আবার নবজীবনের স্পর্শ দেখিতে পাই 'বলাকায়'। 'নৈবেদ্য' 'খেয়া' গীতাঞ্জলীতে তাঁর যে জীবন তার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বুঝি কবি বলিয়াছেন,

"চ'লেছিলাম পূজার ঘরে
সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য।
খুঁজি সারা দিনের পরে
কোথায় শান্তি স্বর্গ;
এবার আমার হৃদয় ক্ষত
ভেবেছিলাম হবে গত
ধুয়ে মলিন চিহ্ন যত
হব নিষ্কলঙ্ক।
পথে দেখি ধূলায় নত
তোমার মহাশঙ্খ!
আরতি দীপ এই কি জ্বালা?
এই কি আমার সন্ধ্যা?
গাঁথবো রক্তজবার মালা?
হায় রজনী-গন্ধা!
ভেবেছিলাম বোঝা বুঝি
নিটিয়ে পাব বিরাম খুঁজি
চুকিয়ে দিয়ে ঋণের পুঁজি
ল'ব তোমার অঙ্ক।
হেনকালে ডাকলো বুঝি
নীরব তোমার শঙ্খ।

কবি ফিরিলেন। যৌবনের পরশমণি আবার তাঁর প্রাণে স্পর্শ করিল, নূতন জীবনের বাণী, প্রাণের বিদ্রোহের বাণী তিনি শুনাইলেন। তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রকৃতির অনুভূতির স্বরূপ বদলাইয়া গেল। এখনও প্রকৃতি তাঁহার চোখে ভগবানের প্রকাশ; কিন্তু শান্তির ভগবান সে নয়—সে কর্ম্মের ভগবান, যুদ্ধের ভগবান। প্রকৃতির ভিতর প্রাণের বিপুল প্রকাশ যে,—

ঝড়ের মাতন! বিজয় কেতন নেড়ে
অট্টহাসে আকাশখানা ফেড়ে

প্রমত্ত হইয়া ছুটিয়া বেড়ায়, তাহাই তাঁর দৃষ্টিকে মুগ্ধ করিল। তিনি আকৃষ্ট হইয়া চাহিলেন হংসবলাকার পানে 'ঝঞ্ঝা-মদরসে মত্ত' যাহাদের পাখা

রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।

প্রকৃতির অনুভূতির দিক দিয়া কবির জীবনের এই ক্রম-বিকাশের স্তরের পরিচয় আমরা পাই চারিদিকে।

প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ প্রেমের কবি। প্রেমের অপূর্ব্ব মধুময় অনুভূতির সূক্ষ্ম পরদাগুলি তিনি এত সুপ্রচুর রসের সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে, তাঁর এই স্তরের কবিতাগুলি প্রতি যুবক-যুবতীর একান্ত প্রিয়তম হইয়া চিরদিন বাঁচিয়া রহিবে। কিন্তু প্রেমের খণ্ড খণ্ড সূক্ষ্ম অনুভূতিতেই তাঁর কবিতা পরিনিষ্ঠা লাভ করে নাই। তার একটা বিরাট সমগ্র-মূর্ত্তি তিনি কল্পনা করিয়াছেন—সে কল্পনার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ তাঁর 'উর্ব্বশী'। সকল যুগের সকল প্রিয়া তাঁর দিব্য-দৃষ্টির সম্মুখে সম্মিলিত হইয়া উঠিয়াছে "উর্ব্বশীর" নব কলেবরে, আর সেই বিশ্বপ্রেয়সীর যে অপূর্ব্ব স্তব-গান তিনি গাহিয়াছেন প্রেমের সাহিত্যে তাহা চিরদিন অমর হইয়া থাকিবে।

এই স্তরে তাঁর প্রেম যেমন গভীরতায় তেমনি গৌরবে মহীয়ান হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বে প্রেমের স্থান তাঁর কাছে পরম গৌরবময়—ভগবৎপ্রেমের কাছেও তাকে তিনি খাটো করিয়া দেখিতে পারেন না। তাই 'বৈষ্ণব-কবিতা'য় তিনি বলিয়াছেন—

"আমাদেরি কুটীর কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা চরণে
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ। এই প্রেম গীতিহার

গাঁথা হয়ে নরনারী মিলন মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা?
দেবতারে প্রিয় কার, প্রিয়েরে দেবতা।

এখনও তিনি বৈষ্ণব-কবির প্রেমের কবিতার গভীরতর সাধনার অধিকারী নহেন। যেখানে

এ গীত উৎসব মাঝে
সুধু তিনি আর তাঁর ভক্ত নির্জ্জনে বিরাজে;

সেখানে তিনি "দাঁড়ায়ে বাহির দ্বারে।"

কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে তিনি আর বাহির দ্বারে দাঁড়াইয়া নন, অন্তরের মজলিসে তাঁর প্রবেশ ঘটিয়াছে। 'গীতাঞ্জলীর' গানে গানে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে সেই বৈষ্ণব কবিতার অন্তরের সুর—তাঁর প্রেম পূর্ণতর গভীরতর পরিণতি লাভ করিয়াছে—দেবতাকে তিনি প্রিয়রূপে লাভ করিয়াছেন। তাঁর এই অপূর্ব্ব সরস নিবিড় ভগবৎ প্রেমানুভূতির একমাত্র তুলনা আছে বৈষ্ণব কবিতায়, আর কোথাও আছে বলিয়া জানি না।

তাঁর জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ, কবির mission সম্বন্ধে তাঁর আদর্শ তাঁর জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রূপে তাঁর চক্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরিণত যৌবনে "পুরস্কার" কবিতায় তাঁর প্রাণের এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন

ধরণীর তলে, গগনের গায়
সাগরের জলে অরণ্য ছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙীন করিয়া দিব।

সংসার মাঝে দু'য়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দু'য়েকটি কাঁটা করি' দিব দূর
তার পরে ছুটি নিব।

সুখ হাসি আরও হবে উজ্জ্বল
সুন্দর হবে নয়নের জল
স্নেহ সুধামাখা বাসগৃহতল
আরো আপনার হবে।

প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে
আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে'
আরেকটু স্নেহ শিশু মুখ পরে
শিশিরের মত রবে।

না পারে বুঝাতে আপনি না বুঝে
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে,
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে
জাগিছে তেমনি সুর;

কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে দু'চারিটা কথা
রেখে যাব সুমধুর।

সুধু এইটুকু। জগৎ ও জীবনের সুন্দর ও মধুর রূপ ফুটাইয়া তোলা, ইহাই এ স্তরে কবির জীবনের আকাঙ্ক্ষা!

কিন্তু এইটুকুতে তাঁর তৃপ্তি শীঘ্রই লুপ্ত হইয়া গেল। প্রাণের ভিতর একটা আকুল ক্রন্দন ক্রমে ধ্বনিত হইয়া উঠিল, গভীর বেদনার সুরে সেই দিন কবি গাহিলেন, "এবার ফিরাও মোরে।"

"এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে রঙ্গময়ি! দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর! ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।

* * * *

বলিলেন—

যে দিন জগতে চলে' আসি
কোন্ মা আমারে দিলি সুধু খেলাবার বাঁশী।
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হ'য়ে আপনার সুরে
দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত্রি চলে' গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসার সীমা। সে বাঁশীতে শিখেছি যে সুর
তাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদপুর
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীতে
কর্ম্মহীন জীবনের একপ্রান্ত পারি তরঙ্গিতে

শুধু মুহূর্ত্তের তরে, দুঃখ যদি পায় তার ভাষা,
সুপ্তি হ'তে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি, তবে ধন্য হবে মোর গান
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্ব্বাণ।

মানবের দুঃখ দৈন্য অবিচারের ব্যথায় জর্জ্জর দুঃখীর দুঃখানুভূতির অশ্রু ও তাহা নিবৃত্ত করিবার আকুল প্রতিজ্ঞাপূর্ণ এই অপূর্ব্ব মধুর কবিতা কবির জীবনের এক মহাসন্ধিস্থলে লিখিত। ইহা তাঁর কবি-জীবনের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার একটা প্রকাণ্ড বিপ্লবের সূচনা করিল। 'দু চারিটি কথা রেখে যাব সুমধুর' বলিয়া কবি আর সংসার হইতে ছুটি লইয়া পরিতৃপ্ত নন। মানবের সেবার একটা বৃহত্তর বিপুলতর আদর্শ তাঁর চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছে—সে আদর্শ তাঁর সাহিত্য-জীবন ও কর্ম্ম-জীবন অশেষ ফলপ্রসূ করিয়া দিয়াছে।

তাঁর জীবনের এমনি আর একটা বৃহৎ সন্ধিস্থল আসিয়াছিল অনেক দিন পরে। কবি তখন পঞ্চাশোর্দ্ধে আপনাকে জীবন-সন্ধ্যায় উপনীত ভাবিয়া আবার ছুটি লইয়াছেন। জীবনের শেষে দেবতার চরণে আপনাকে নিবেদিত করিয়া তিনি তখন দেবতাকে নৈবেদ্য ও গীতাঞ্জলী দিতেছেন, জীবন খেয়ার পারের কড়ি সংগ্রহ করিতেছেন। সেই সময়ে তাঁর কাছে আসিল একটা বৃহৎ আহ্বান—নূতন ভাবে সাড়া দিয়া তাঁহার বীণা আবার নূতন সুরে অভিনব মূর্চ্ছনায় ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

এতদিন রবীন্দ্রনাথ বরাবরই ছিলেন বাঙ্গলার কবি, বাঙ্গালীর কবি। যাদের সুখ দুঃখের কথা অমর সঙ্গীতে গাথিয়া রাখিবার জন্য তিনি সাধনা করিয়াছিলেন, নব নব প্রেরণা ও উদ্দীপনা দিয়া তিনি যাঁদের সঞ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তারা সকলেই বাঙ্গালী। কিন্তু এক শুভ মুহূর্ত্তে কবি ইয়োরোপ যাত্রার অবসরে গীতাঞ্জলীর ইংরাজী অনুবাদ করিয়া বিশ্বের দরবারে তাঁর সঙ্গীত শুনাইলেন, চারিদিকে জয়ধ্বনি বাজিয়া উঠিল, বাঙ্গলার কবি বিশ্বের দরবারে জয়মাল্য লাভ করিয়া তাঁর জন্মভূমিকে গৌরবান্বিত করিলেন। তখন তিনি অনুভব করিলেন যে তাঁর সেবার আকাঙ্ক্ষা রাখে সুধু বাঙ্গলার ঘাটে ঘাটে বা প্রাসাদের বাঙ্গালী নরনারী নয়, বিশ্বের নরনারী। তাদেরও প্রাণের ভাষা, তাদেরও আশা আকাঙ্ক্ষা তাঁর কাব্যে ধ্বনিত করিয়া তুলিবার জন্য তারা তাঁর মুখ চাহিয়া আছে।

ইহার পর হইতে রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে একটা প্রকাণ্ড রূপান্তর দেখিতে পাই, তার ভিতর তাঁর কবি-জীবনের আদর্শের একটা নূতন বিস্তার, বিশ্বের বিপুল প্রাণের একটা নূতন প্রেরণা ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁর উপন্যাসে, কবিতায়, নাটকে, প্রবন্ধে এই বিশ্বসেবার সুর নানা বিচিত্র রূপে ধরা দিয়াছে।

জীবনে তাঁর সন্ধ্যা আসিয়াছে ভাবিয়া কবি আরতির প্রদীপ জ্বালিয়াছিলেন। এখন দেখিলেন সন্ধ্যা কোঁথায়? ইয়োরোপের আকাশে সবদিন সূর্য্যাস্তেই তো সন্ধ্যা আসে না—তার পরেও থাকে দীর্ঘ দিবসের আলো, কর্ম্মের প্রচুর অবসর। সেখানে বসিয়া কবি অনুভব করিলেন, আরতির প্রদীপ জ্বালার সময় তাঁর এখনো আসে নাই, তাঁর সম্মুখে আছে অশেষ কাজ। 'ফাল্গুনী'তে তিনি জগৎকে শুনাইলেন যে জগতের যে বিরাট বুড়োর ভয় সেটা নিতান্তই ভুল—সে বুড়ো নেই। গাহিলেন

আয় রে তবে, মাত রে সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।

তিনি সবুজকে, কাঁচাকে বরণ করিলেন, জীবনে যৌবনকে নূতন করিয়া উদ্বোধন করিয়া লইলেন।

গীতাঞ্জলীর যে সুর, তাহা তাঁর এখনকার জীবনেও লুপ্ত হয় নাই—সে যে লুপ্ত হইবার নহে, কিন্তু তাঁর সেই ভগবৎ প্রেমের ভিতর প্রাণের একটা বিপুল স্পন্দনের অনুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছে। অন্ধ বাউলের গানের যে ভগবান তার সঙ্গে গীতাঞ্জলীর ভগবানের প্রভেদ আছে। গীতাঞ্জলীর ভগবান শান্তির দেবতা, ফাল্গুনীতে তিনি কর্ম্মের দেবতা—এগিয়ে চলার দেবতা। তিনি প্রলয় নাচনে উন্মত্ত নটরাজ।

এই নূতন অনুভূতি, নূতন প্রেরণার ফলে কবির কাব্য নূতন রসে নূতন অর্থে নূতন প্রাণে পরিপূর্ণ ও সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। এক দিকে তিনি ফাল্গুনী ও বলাকায় প্রাণের মাতনভরা আবেগভরা আনন্দের গান গাহিলেন, 'আধ-মরাদের ঘা দিয়ে' বাঁচাইবার জন্য কোমর বাঁধিলেন, সবুজ

পত্রে লেখা গল্প উপন্যাস ও পরবর্ত্তী বহু প্রবন্ধে আমাদের দেশব্যাপী নির্জীব অসাড় প্রাণশূন্যতাকে কঠোর আঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিলেন, আবার অপর দিকে পাশ্চাত্য জগতের সমাজ-সমস্যার নিবিড় বেদনায় পীড়িত হইয়া, সেখানে যন্ত্রদানবের নিষ্পেষণে আনন্দময় প্রাণশক্তির ম্রিয়মাণ অবস্থায় চঞ্চল হইয়া জগৎকে আনন্দ ও মুক্তির বাণী শুনাইলেন 'মুক্ত ধারা'য় 'রক্ত করবী'তে।

তাঁর কবি-জীবনের ভিতর যাহা কিছু শাশ্বত, যাহা কিছু সুন্দর তার কিছুই তাঁর এ অবস্থায় বিলুপ্ত হয় নাই। প্রকৃতির শোভায় তাঁর যে বিভোর আনন্দ তাহা এখনো ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁর সকল কবিতায়, সকল লেখায়। প্রেমের যে বিচিত্র অনুভূতি ও সরস ব্যাখ্যান তাহা এখনও তাঁর লেখনীতে তেমনি সতেজ ও জীবন্ত আছে—তার সব চেয়ে নূতন ও সুন্দর পরিচয় তাঁর 'শেষের কবিতা'।—ভগবৎ প্রেমে তাঁর যে তন্ময়তা নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলীতে প্রকাশ, তাহা এখনো পূর্ণ-গৌরবে দেদীপ্যমান—কিন্তু সমস্ত আজ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। গৌরবান্বিত হইয়াছে একটা নূতনতর অর্থ ও গভীরতায়, সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে নবীন প্রাণের একটা অপূর্ব্ব স্পন্দনে।

Nothing of him that is lost
But is transformed into something
rich and grand.

সত্তর বৎসর বয়সে আজ তাঁর কবি-জীবন, সাহিত্যিক জীবন, ভাবুক জীবন, ভক্ত জীবন সকলই সমৃদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, নূতন ভাবে সঞ্জীবিত হইয়া রহিয়াছে নূতন জীবনের প্রেরণায়। তিনি দীর্ঘ জীবন ভরিয়া আমাদের কাছে 'নিতুই নব'—নিত্য সুন্দর, নিত্য মহান। কালের গতি তাঁহার দেহের শক্তি হয় তো খর্ব্ব করিয়াছে, কিন্তু তাঁর চিত্তের শক্তি গৌরব ও সজীবতা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধই করিয়াছে। বার্দ্ধক্য তার দেহের সিংহদ্বারে আঘাত করিয়া তাহাকে জর্জ্জরিত করিতে পারে; কিন্তু অন্তরের মণিকোঠায় তার জীবনশোষক বিষ এক ফোঁটাও প্রবেশ করাইতে পারে নাই।

বাঙ্গলার পক্ষে, ভারতের পক্ষে, জগতের পক্ষে এটা মহা সৌভাগ্যের কথা। তাই আমরা তাঁর সপ্ততিবর্ষোৎসবে অপরিমিত আনন্দের সহিত যোগদান করিয়া এই সৌভাগ্যের সুদীর্ঘ বিস্তার কায়মনোবাক্যে কামনা করিতেছি।

বেলজিয়ম ও তাহার চিত্র-সম্পদ

ডাক্তার শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল, ডি-এস সি, এম্-বি, এম্-আর-সি-পি

বিগত মহাসমরে ক্ষুদ্রায়তন বেলজিয়ম বাস্তবিকই শৌর্য্য-বীর্য্যের অদ্ভুত পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল। মাসাধিক কাল যে অমিত বিক্রমে বেলজিয়ানগণ বিরাট জার্ম্মাণ বাহিনীর গতিরোধ করে রেখেছিল, স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে তা' চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। সেই অসম-সাহসিকতার কাহিনী এখনো বিস্মৃতির অতলতলে ডুবে যায় নি বলেই, অনেক দিন ধরে মনে অদম্য আকাঙ্ক্ষা ছিল, দেখতে হবে এই বেলজিয়ান জাতিটাকে, আর মহাযুদ্ধের লীলা-নিকেতন এই ছোট্ট দেশটাকে! বন্ধুবর মুখুয্যের ইচ্ছা ছিল, ফরাসী দেশ ছেড়ে সোজাসুজি জার্ম্মাণীতে যাওয়া, কিন্তু আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেই আমাদের যাওয়ার পথ ঠিক হলো বেলজিয়মের ভিতর দিয়ে। ২৭শে ফেব্রুয়ারী ভোরে সাড়ে নটায় প্যারিস ছেড়ে, প্রায় সাড়ে তিনটায় এসে পৌছলুম বেলজিয়মের রাজধানী ব্রুসেলস্ নগরীতে! নর্দ ষ্টেশনে নেমে, আড্ডা নেওয়া গেল কাছেই, হোটেল দি' নর্দে।

ফরাসী দেশের সীমানা ছাড়িয়েই, মনে হল হঠাৎ যেন চোখের সামনে একখানা দৃশ্যপট বদলে গেল! উত্তর ফরাসী দেশের একটা রুক্ষ নীরস দৃশ্যের পরিবর্ত্তে দেখতে পাওয়া গেল তৃণশ্যামল নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য।

অন্যান্য দেশের চেয়ে বেলজিয়ম ও হলাণ্ড অনেকটা নিম্নভূমিতে অবস্থিত, এমন কি স্থানে স্থানে সমুদ্রের চেয়েও নীচে বলে, এই দু'দেশকে একসঙ্গে "নেদারল্যাণ্ড" বলা হয়। সেই কারণেই এ দেশের ভূমি উর্ব্বর ও শস্যশ্যামল। অবশ্য দক্ষিণ ফরাসী দেশ, (ডি রিভেরা, নীস্, মন্টিকার্লো), স্পেন অথবা, ইটালীও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অধিকারী সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। তবে বেলজিয়ামের সৌন্দর্য্য সে সৌন্দর্য্য থেকে যেন একটু পৃথক্, আগাগোড়াই যেন একটু মসৃণ কোমলতায় ভরপূর! গাড়ী হতে যতদূর দৃষ্টি যায়, চোখে ঠেকছিল শুধু সবুজের ঢেউ, আর মাঝে মাঝে ঝক্‌ঝকে, তক্‌তকে নতুন করে গড়া দু একটি গ্রাম। অন্যান্য যাত্রীদের মুখে শুনলুম, এ সকল অঞ্চল যুদ্ধের

পার্লামেণ্ট হাউস ও তৎ-সম্মুখস্থ পার্ক (ব্রুসেলস্)

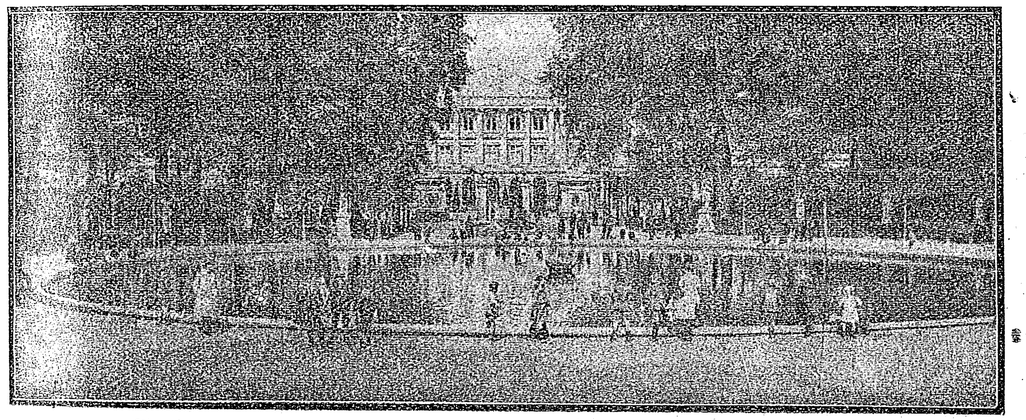

সময় একেবারে বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হয়ে গেছিল! সে রকমই একটা কিছু প্রত্যাশা কচ্ছিলুম, কিন্তু তার চিহ্ন মাত্র দেখতে পাওয়া গেল না। ক্ষুণ্ণ মনেই হিসেব করে দেখা গেল, যুদ্ধবিরতির পরও যে প্রায় বারোটি বছর চলে গেছে! এত বড় একটা যুদ্ধের, অমানুষিক বীভৎসতার ছবি, স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে থাকে যুগ-যুগান্ত; কিন্তু, দেশের বুক হতে তার চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ কর্ত্তে এক যুগই যথেষ্ট।

ফরাসী সীমান্ত পার হয়ে যেমন দেশের ছবি একেবারে বদলে গেল, তেম্নি আস্তে আস্তে লোকের ছবিও বদলাতে আরম্ভ কর্লে! চলতি গাড়ীতে যতগুলি লোক উঠা-নামা কর্ত্তে লাগলো, লক্ষ্য করে দেখলুম ক্রমশঃই ফরাসী দেশীয় কৃত্রিমতা কমে আসেছে, তার পরিবর্ত্তে একটা অতি সাধারণ স্বাভাবিকতা ফুটে উঠ্‌ছে! আমাদের গাড়ীতেই, পোটলা পুটলি, লট্‌বহর নিয়ে প্রায় আট-দশজন বেলজিয়ান্ পুরুষ ও স্ত্রীলোক এসে উঠে বসলো! তাদের মধ্যে দু একজন অল্পস্বল্প ইংরেজী জানে! একজন মেয়ে আমরা কোত্থেকে আসছি, কোথায় যাব, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন আমাদের জিজ্ঞেস কর্ত্তে লাগলো; আর একজন অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই আমাদের ইংরেজী খবরের কাগজখানা হাতে নিয়ে, গুরুমশাইর মত ভঙ্গীতে, নাকের আগায় চশমা ঠেলে দিয়ে, প্রায় এক হাত সামনে কাগজখানা ধরে চোখ, ভুরু ও কপাল কুঞ্চিত করে, অধ্যয়নে মনোনিবেশ কর্লে! লোকগুলি আর যাই হউক, আচারে ব্যবহারে যে ভদ্র, তা' বেশ টের পাওয়া গেল, কথায় কথায়, "পার্দ্‌ মুসে" অসংখ্যবার শুনে! পথে গাড়ীতে যা' গল্প হলো, তার বেশীর ভাগই বিগত মহাসমরের বিভীষিকার কথা! স্পষ্টই বুঝলুম, বেলজিয়ানদের দেশ হতে যুদ্ধের ধ্বংসলীলা লোপ পেলেও, মনের মধ্যে তার ভীষণ স্মৃতি এখনো জাজ্জ্বল্যমান আছে!

যতক্ষণ গাড়ীতে ছিলুম, অথবা নেমেও, যতই লোকগুলিকে দেখছিলুম, ততই যেন হতাশ হচ্ছিলুম, আর মনে একটু একটু করে অবিশ্বাস পুঞ্জীভূত হচ্ছিল,—সত্যিই কি, এই বেলজিয়ানরাই, বিরাট জার্ম্মাণ বাহিনীর গতিরোধ করে, মাসাধিক কাল বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল! আকারে কি চেহারায় ফরাসী কি

বেলজিয়ান্ কোন জাতিকেই তো খুব যোদ্ধা বলে মনে হয় না, তবু এক যুগ আগে এরাই বীরত্বের অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করেছিল! যতই ভাবছিলুম, ততই অবাক্ হয়ে যাচ্ছিলুম,—এরাই কি সেই সব আদর্শ বীরের বংশধরগণ! বিশ্বাস কর্ত্তে প্রবৃত্তি হচ্ছিল না, তবু ভাবলুম, হবেও বা, যখন লোকের জন্মগত অধিকার, স্বাধীনতা বিপন্ন হয়, যখন ঘরের কোণে রাজ্যলোলুপ, দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর আগ্নেয়াস্ত্র ভীষণ রবে গর্জ্জে উঠে, তখন মৃতদেহেও যে প্রাণ সঞ্চার হওয়ার কথা! বেল্‌জিয়ান্‌রা আর যাই হউক, কাপুরুষ হবার অবসর পায় নি! ইয়োরোপে যত বড় বড় যুদ্ধ

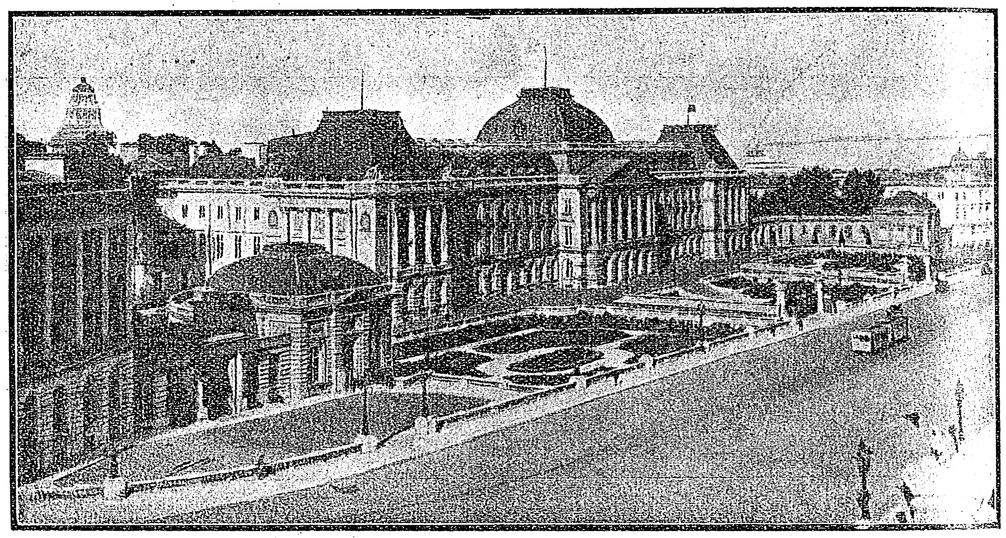

রাজপ্রাসাদ (ব্রুসেলস্)

হয়েছে তার বেশীর ভাগই হয়েছে এই বেলজিয়মের বুকে! কে উঠ্‌বে, কে পড়বে, বারবার তার পরীক্ষা হয়ে গেছে বেলজিয়ানদের এই ক্ষুদ্র শস্যশ্যামল দেশের বুকের উপর রক্তের স্রোত বয়ে। বেলজিয়ান্‌দের চিরদিনই তাতে অংশ নিতে হয়েছে। তারই পুরস্কার স্বরূপ ওয়াটার্লুতে নেপোলিয়নের পতনের প্রায় পনেরো বছর পরে, বেলজিয়ম স্বাধীন রাজ্য বলে ঘোষিত হয়। প্রায় একটি বছর আগে বেলজিয়ানরা সেই স্বাধীনতা লাভের শতবার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন করেছে! বর্ত্তমান রাজা এলবার্টের পিতামহ প্রথম লিয়োপোল্ডই বেলজিয়মের প্রথম স্বাধীন নৃপতি! বর্ত্তমান রাজা এলবার্টের নেতৃত্বে, বেলজিয়ম বিগত মহাসমরে, স্বাধীনতা-যুদ্ধে, বুকের রক্ত দিয়ে প্রমাণ করেছে, পঁচাশি বছরের লব্ধ স্বাধীনতার মূল্য, হাজার বছরের স্বাধীনতার চেয়ে কম নয়।

উত্তেজনার পর অবসাদ, কর্ম্মের পর নিষ্ক্রিয়তা জগতের চিরন্তন নীতি; স্পষ্টই বুঝতে পেলুম, বেলজিয়মের ভাগ্যেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। ফ্রান্স যেমন আপনাকে বিলাস ও ব্যসনের উদ্দাম স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছে, বেলজিয়ম স্বভাবতঃ গরীব দেশ, অনেক শতাব্দী ধরে ফরাসী দেশের সঙ্গে নিজের ভাগ্য জড়িত থাকলেও, তালে পেরে উঠে নি বিলাসিতায় ফ্রান্সের সঙ্গে পাল্লা দিতে। অনেক স্থলে দেখতে পেলুম, মেয়েরা ফরাসী দেশের মেয়েদের অন্ধ অনুকরণ কর্ত্তে গিয়ে হঠাৎ যেন মাঝামাঝি পথে থমকে গেছে! লিপ, ষ্টিক্ আর রুজের আমদানী ঘরে ঘরে হয়েছে, তবে মাথার চুল এখনো বব্ ছেড়ে শিংলে পৌঁছেছে, খুব কম জায়গায়ই। আর পোষাক, গায়ের গোড়া পর্য্যন্ত নামে নি, হাঁটু ও গোড়ালির মাঝামাঝি এক স্থানে এসে ঠেকেছে! হাব-হাবটা, এবং হাসি কাশিটে, পর্য্যন্ত ফরাসী ধরণের হলেও, খুব সার্থক অনুকরণ নয়, তা' বেশ বুঝতে পারা গেল! পান ভোজন দেখতে

গেলুম ফরাসী দেশের মত সমান তালেই চলেছে, কিন্তু এক হিসাবে বেলজিয়ানরা ফ্রান্সকেও ছাড়িয়ে গেছে, তা' প্রত্যেক কাফে ও রেস্তারাঁতে, তাস হাতে লোকের জটলা, ও ঝন্‌ঝন্ করে মুদ্রাবিনিময়ের দ্বারাই প্রমাণিত হ'ল! দেখে দুঃখ হ'ল, মহাযুদ্ধের বীর বেলজিয়ানগণের বীরত্ব এসে পর্য্যবসিত হয়েছে, পানাহারে, জটলায় ও জুয়ার আড্ডায়।

ব্রুসেল্‌স্‌এ পৌঁছে, হোটেলের কাছে একটা কাফেতে মধ্যাহ্ন (?) ভোজন (বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা) সেরে নিতে হ'ল। তার পরই খোঁজ করে গেলুম অগতির গতি,

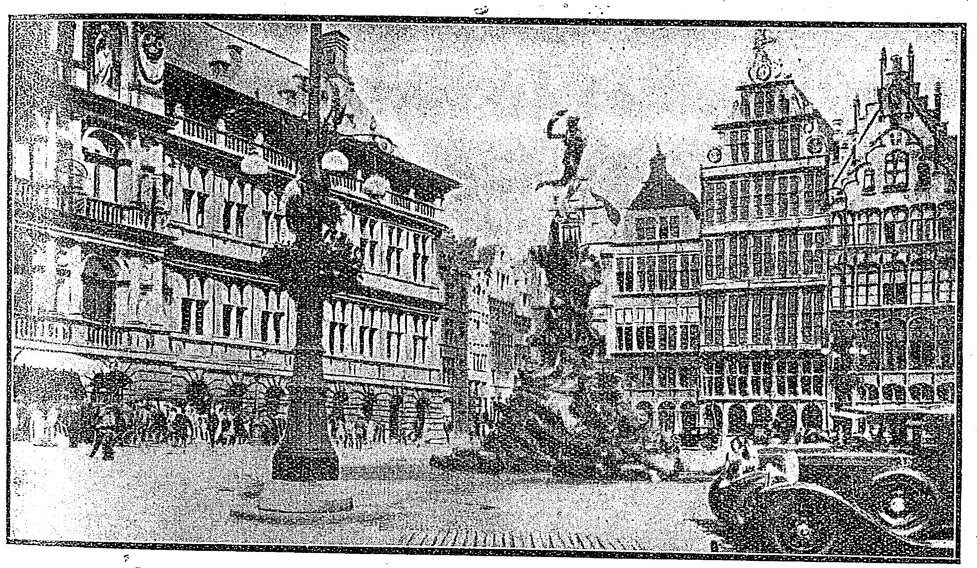

ব্রাবো (এণ্টওয়ার্প)

বিদেশে পথিকের বন্ধু, কুক্ কোম্পানীর আড্ডায়! ভেবেছিলুম প্যারিসের মত, এখানেও কুক্ কোম্পানীর দ্বারাই সব বন্দোবস্ত ঠিক্ হবে, কিন্তু কার্য্যতঃ বিফল-মনোরথ হতে হলো! ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ ভাগ, বেলজিয়মে অত্যন্ত শীতের সময় (যদিও সেদিন আমাদের বেশ গরম বোধ হচ্ছিল, এবং ওভারকোটটি হোটেলেই রেখে গিয়েছিলুম) সুতরাং ঐ সময় পর্য্যটকেরা বড় একটা কেউ আসে না, তাই টুরিষ্ট-কার সব বন্ধ! অগত্যা কোম্পানীর লোকদের নিকট হতে, ব্রুসেলস্‌এ দ্রষ্টব্য যা' কিছু তারই একটা লিষ্ট পাওয়া গেল! নিজেরাই নিজেদের গাইড হয়ে, দুটি বন্ধু বেলজিয়মের রাজধানীর পথে বেরিয়ে পড়লুম! একটু এগিয়ে যেতেই প্রায় দু' মাইল দূরে, একটু উঁচু স্থানে, একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখে বন্ধুবর বল্লেন "ওহে, ঐ দেখ, হাইকোর্ট।"

একে ত বাঙ্গাল, তাতে আবার যশোরের নয়, ফরিদপুরের নয়, ঢাকার নয়, ত্রিপুরার নয়, একেবারে সিলেটের; সুতরাং পরিহাসের ভাবে নয়, গম্ভীর ভাবেই বল্লুম "বাঙ্গালকে হাইকোর্ট দেখাচ্চ?"

বন্ধুবর পরিহাসের সুরেই বল্লেন, "আরে, দেখেই রাখ!"

তখন অবশ্য দেখেই রাখা গেল, কিন্তু পরদিন অবাক্ হতে হয়েছিল জেনে, যে, "বাঙ্গালকে দেখানো হাইকোর্ট" ব্রুসেল্‌সের হাইকোর্টই বটে!

সেদিন বেলা চারটা হতে আরম্ভ করে, রাত্রি সাড়ে ন'টা পর্য্যন্ত, একের পর এক, ব্রুসেলস্‌এর দ্রষ্টব্য অনেক কিছু দেখা গেল! বোটানিকেল গার্ডেন, পার্লামেণ্ট হাউস্ ও তারই সামনে প্রকাণ্ড পার্ক, তারি মধ্যে বেলজিয়ামের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির মর্ম্মর-মূর্ত্তি, পেটি সাব্লোঁ স্কোয়ার, ও তন্মধ্যস্থ কাউণ্ট এগ্‌মোঁ ও কাউণ্ট হর্ণের প্রতিমূর্ত্তি; আঁম্পার্ক ও কংগ্রেস স্মৃতিস্তম্ভ, রাজা দ্বিতীয় লিয়োপোল্ডের সু-উচ্চ ঘোড়ার উপর আসীন বিরাটকায় মূর্ত্তি, এডিথ্

কেভেলের সমাধি, মনুমেণ্টেল আর্কেড্ প্রভৃতি স্থানগুলি দেখে, আমরা এসে পৌছলুম, বেলজিয়মের রাজপ্রাসাদের সম্মুখে! প্রাসাদটি খুব বড় নয়, তবু অতি চমৎকার ভাবে সাজানো, গোছানো! সম্মুখের সুপ্রশস্ত রাস্তা হতে প্রায় পঞ্চাশ ফিট দূরে অবস্থিত, মাঝে চমৎকার বাগান! রাস্তায়ই লোকজন অবারিত ভাবে চলাফেরা কর্চ্ছে, শুধু দুটি গেটে দুটি প্রহরী ছাড়া, রাজপ্রাসাদের মত আড়ম্বরের কিছুই দেখতে পেলুম না। অবাক্ হয়ে ভাবলুম, স্বাধীন দেশে, স্বাধীনতার আবহাওয়াই অন্যরকম! অথচ আমাদের দেশের যে কোন গবর্ণমেণ্ট হাউসের ত্রিসীমানার মধ্যে কেউ চলাফেরা কর্ত্তে পারে না। কিছুদিন আগে, বুঝতে পারা গেল! কিন্তু অবাক্ হয়ে গেলুম, তার ভদ্র আচরণে ও কথায়! আমাদের দেশে হলে ঐ অবস্থায়, আমাদের যে কি হতো, তা আর ব'লে কাজ নেই। অগত্যা প্রহরীর নির্দ্দেশ মত আমরা চলতে আরম্ভ কর্লুম! ক্রমাগতঃ প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা চলে আর চলার মত অবস্থা ছিল না পায়ের; তাই একজন কনেষ্টবলকে জিজ্ঞেস করে, নর্দ ষ্টেশনের পথে ট্রাম ধর্লুম!

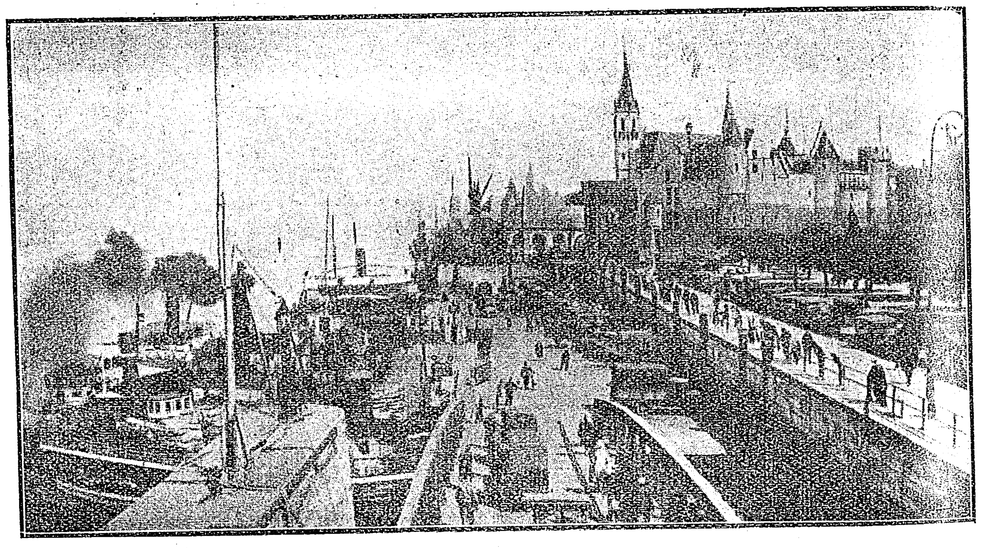

ব্রুসেলস্ ছোট সহর হলেও দেখতে বেশ লাগলো! মনে হল, সমস্ত সহরটিই যেন প্যারিসের একটা ছোটখাটো সংস্করণ! বাড়ী, ঘর, পথঘাট, পার্ক, সমস্তই যেন প্যারিসীয় ভাবে গড়া! রাস্তায় লোকজন, যান-বাহনের উপরও

শেলড্ট্ নদী, ও তৎ-তীরবর্ত্তী ওয়ার মিউজিয়ম (এণ্টওয়ার্প)

দার্জ্জিলিংএ বেড়াতে গিয়ে দুটি ছেলে, না জেনে, গবর্ণমেণ্ট হাউসের বাইরে reserved areaতে ঢুকেছিল বলে, তিন দিন পর্য্যন্ত না কি হাজতে আট্‌ক থাকতে হয়েছিল। পথে দাঁড়িয়ে বন্ধুবর ও আমি, এ কথাটাই বোধ হয় আলোচনা কচ্ছিলুম, এম্নি সময় একজন প্রহরী এসে সসম্মানে নমস্কার করে, ফরাসী ভাষায় বল্লে "ক্ষমা করুন মহাশয়েরা, আপনারা বোধ হয় বিদেশী, রাজপ্রাসাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকা আইনসঙ্গত নয়, কথা বলতে হলে, একটু আস্তে আস্তে চলতে আরম্ভ করুন ও কথা বলুন!" বেলজিয়মের কথ্য ভাষা ফরাসী, তাই প্রহরীর কথা অনেকটা সেই প্যারিসের ছাপ। চলতে চলতে আমাদের মাঝে মাঝে ভুল হচ্ছিল, যেন প্যারিসেরই কোন সহরতলীতে হেঁটে বেড়াচ্ছি আমরা! তবু মনে হলো একটু তফাৎ আছে, হয় ত দারিদ্র্যের জন্য অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, এক পানাসক্তি ছাড়া বিলাস ব্যসন কি সম্ভোগের স্রোতে ভাসলেও এরা এখনো ততটা বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খল হয় নি।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম হতে উঠে দেখি ঝর ঝর করে বৃষ্টি হচ্চে; কিন্তু ছন্নছাড়া, লক্ষীছাড়া বন্ধু দুইটির অসাধারণ অধ্যবসায়! সেই দুর্য্যোগের মধ্যেই 'ডেশুনে' (প্রাতরাশ)

সরে বেরিয়ে পড়া গেল, সহরের মাথার উপর উঁচু বাঙ্গালকে দেখানো হাইকোর্ট' লক্ষ্য করে! সেখানে পৌছতে লাগলো প্রায় এক ঘণ্টা; বন্ধুবর এগিয়ে একজন

বোটানিকেল গার্ডেন (ব্রুসেলস্)

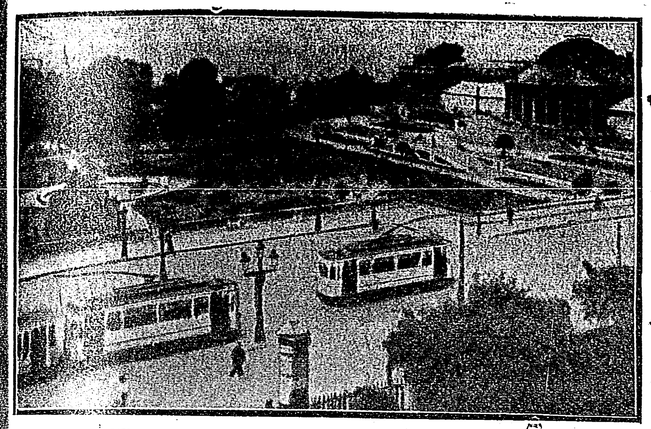

পথিককে জিজ্ঞেস কর্লেন "পার্দ্দ মুঁসে, কি আলা সেইজো?" অর্থাৎ, ক্ষমা করুন, এই বাড়ীখানি কি?"

পথিক উত্তর কর্লে "প্যালে দি শাষ্টিস্"

আর যায় কোথায়, অমি বন্ধুবরের প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ, অর্থাৎ কেমন, হাই-কোর্টই ত বটে! আর দেখাবে হাইকোর্ট!" অবশ্য বন্ধুবরও অবাক্। হাইকোর্টের সামনেই, এক দিকে পুরাতন রোমান্ এবং অন্য দিকে গ্রীক্ আইনজ্ঞদের প্রতিমূর্ত্তি! অতঃ-র প্রহরীর অনুমতি নিয়ে, সমস্ত অট্টালিকাটি ঘুরে এসে, রতালা গম্বুজের উপর চড়া গেল। তখনো বৃষ্টি হচ্চিল, ই সমস্ত ব্রুসেল্স সহরের দৃশ্য একটু ঝাপ্সা দেখালেও বড় লাগলো না। রাজকীয় গীর্জ্জাঘরের অভ্রভেদী চূড়াটি যেন আকাশ ছুঁয়ে ফেলবার উপক্রম কর্চ্ছে, দেখতে পাওয়া গেল। তা ছাড়া কাছেই রাজপ্রাসাদটি ও স্মৃতিস্তম্ভগুলিও দেখতে পাওয়া গেল এবং বেশ বোঝা গেল কোন্‌টি কি? অবশ্য দিনটি যদি ভাল হতো, তাহলে, হাইকোর্টের উপর হতে সহরের সাধারণ দৃশ্য নিশ্চয়ই আরো অনেক ভাল লাগতো, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

হাইকোর্ট হতে বেরিয়ে এসে গিয়ে ঢুক্‌লুম ব্রুসেলস্‌এর প্রসিদ্ধ তিনটি মিউ-জিয়মে। একটি শুধু মিউজিয়মই, বাকী দুটির একটি পুরাতন ও অপরটি নূতন আর্ট গ্যালারি! বাস্তবিক বেলজিয়মে গিয়ে যদি কিছুতে পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করে থাকি তবে, এই আর্ট গ্যালারিগুলি দেখেই! বাইরে তখনো সমান ভাবে বৃষ্টি হচ্চে, সুতরাং নিবিষ্টচিত্তে দেখতে মনোনিবেশ কর্লুম, বেল-জিয়মের অনন্যসাধারণ চিত্র-সম্পদকে! অনন্যসাধারণই বলতে হবে, কারণ এ দুটি চিত্রশালায় যতটুকু সৌন্দর্য্য লুকিয়ে

হাইকোর্ট (ব্রুসেলস্)

আছে, যে কোন চিত্ররসজ্ঞ শিল্পীর মনের খোরাক যোগাতে পারে অনেক দিন! অবশ্য প্যারিসের বিখ্যাত মিউজিয়ম লুভ, ও লণ্ডনের ব্রিটিশ আর্ট গ্যালারিও নানাবিধ বহুমূল্য

চিত্রসম্পদের অধিকারী! কিন্তু সবগুলি দেখে আমাদের মনে হল, ব্রুসেল্‌সের দুটি ও এণ্টওয়ার্পেরও সুপ্রসিদ্ধ আর্ট

মরুভূমিতে আগর ও ইস্‌মাইল।
(ব্রুসেলস্ মিউজিয়ম)

গ্যালারি একত্র করে ধর্লে বোধ হয় বেলজিয়মের চিত্রসম্পদের স্থান হয় সকলের উপরে! পুরাতন ও নূতন, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, হলাণ্ড, সুইডিস্, স্পেন, ইতালীয়, জার্ম্মাণ, সকল দেশের, সকল সুবিখ্যাত চিত্রকরদের, তুলিকানৈপুণ্য দেখতে পাওয়া যায়, এসে এই বেলজিয়মে! শুধু আমাদের চোখে, একটা অভাব ঠেকলো, যদি এই আর্ট গ্যালারিগুলিতে, শুধু ভারতীয় চিত্রকলার একটু স্থান হতো, তাহলেই বোধ হয় ষোলকলা পূর্ণ হতো! শুধু চিত্র নয়, মর্ম্মর-মূর্ত্তির সম্পদেও, এই মিউজিয়মগুলি পৃথিবীর মধ্যে একটা উচ্চ স্থানের দাবী রাখে! নিজে শিল্পী নই, তবু সুন্দর যা, মনোরম যা' মনের লুপ্ত শিল্পীভাবকে অন্তঃ ক্ষণেকের জন্যও একটু সাড়া দিয়ে জাগিয়ে দেয়! হয় ত শিল্পীর দক্ষ তুলির প্রত্যেকটি রেখা ও বর্ণ-বিন্যাসের অর্থ বুঝি না, তবু সেগুলির সমন্বয়ে অঙ্কিত গোটা ছবিখানিকে ভাল লাগে; আমার শিল্পজ্ঞানের রসাতল ঐ পর্য্যন্ত! কিন্তু এ হিসাবে বন্ধুবর সন্তোষ মুখুয্যে আমার চেয়ে সমজ্‌দার অনেক বেশী! ছবিখানাকে যখন আমি গোটা ছবিরূপেই দেখি, তিনি তার প্রত্যেকটি অংশ আলাদা করে চুল চিরে দেখেন, প্রকৃত সমালোচকের চোখে! সময় সময় তন্ময় হয়ে বন্ধুবর হয় ত আধ ঘণ্টা একখানা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে, অনেক সময়ই অরসিকের মত তাকে তাড়া দিতে হয়েছে! বন্ধুবর আবার আর একখানির সম্মুখে গিয়ে তন্ময় হয়ে গেলেন! বাস্তবিকই তন্ময় হবার মতই জিনিষ বটে! আমারও যে সময় সময় দাঁড়িয়ে দেখতে ইচ্ছা না হচ্ছিল এমন নয়, তবে আমাদের সময় অল্প আর দেখার সামগ্রী অনেক বেশী, এই অভিজ্ঞানটুকুই, শীগ্‌গির শীগ্‌গির, "পিবন্তীব চক্ষুভি" করে যতটুকু দেখা সম্ভব তারই জন্য মনে তাড়া দিচ্ছিল! বেলা ন'টা হতে আরম্ভ করে সমস্ত দুপুর আমরা দুটি আর্ট গ্যালারি দেখলুম! বাস্তবিকই কেমন করে যে অতটা বেলা সেদিন কাটিয়ে ছিলুম শুধু ছবির পর ছবি দেখে, এখনো তা বুঝতে পারি

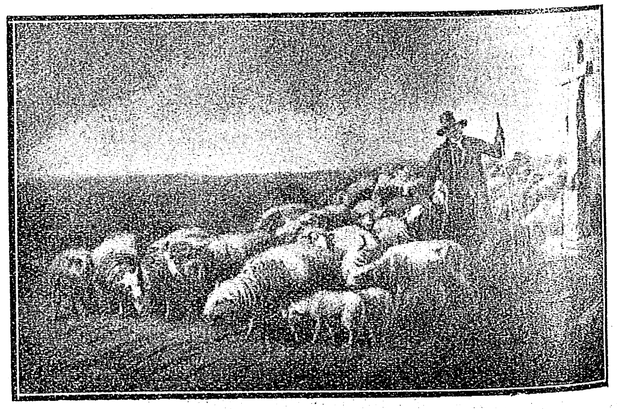

মেষপালের গৃহ প্রত্যাবর্ত্তন। (ব্রুসেলস্ মিউজিয়ম)

না! অনেক কিছুই ভাল লাগলো। তার পর বন্ধুবর ও আমি দুজনে ভাল-লাগা ছবির তালিকা দুটি মিলিয়ে দেখি, গোটাকয় ব্যক্তিগত বৈষম্য ছাড়া—আমাদের ভাল-লাগার মধ্যে শতকরা নব্বুইটি স্থলেই সাম্য ছিল! সুতরাং আর্টগ্যালারির দ্বারেই যে সব ছবি বিক্রী হয়—সে হতে, আমাদের দুজনের ভোটে যেগুলি লাগলো তারই অনেকগুলি কিনে নেওয়া হ'ল। পাঠক পাঠিকাদের জন্য, ভাল ভাল ক'খানি, এরই সঙ্গে নিবেশিত কচ্ছি!

আমাদের সবচেয়ে ভাল লেগেছিল নাভেজের অঙ্কিত, মরুভূমিতে "আগর ও ইস্‌মাইল" চিত্রখানি। এখানি আধুনিক চিত্র! চিত্রখানি শিল্পীর এক অভূতপূর্ব্ব সৃষ্টি! যতদূর দৃষ্টি যায়, মরুভূমি ধূ ধূ কচ্ছে; মরুভূমি পর্য্যটনের শ্রমে, ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় পথিক ইস্‌মাইল, সুষুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে, এমন কি হাতের যষ্টি পর্য্যন্ত শ্লথ-হাতে যেন হাত হতে খসে পড়ছে। পায়ের নীচে বোঝার গুরুভার ধরার বুকে ন্যস্ত! সুষুপ্ত বালকের মুখের ভাব বাস্তবিকই অতি চমৎকার। আর তার চেয়ে বেশী চমৎকার, আগরের বেদনাময়ী মুখশ্রী! প্রসুপ্ত বালককে ঘিরে, তার সেই উৎকণ্ঠাকাতর, আকুলতা-মাখা, সৌম্য, ম্লান, আকুল দৃষ্টি, শিল্পীর অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচায়ক। নাভেজ যদি আর কোন ছবি না এঁকে শুধু এই একখানি ছবিই এঁকে যেতেন, তাতেই বোধ হয়, তাঁর নাম শতাব্দীর পর শতাব্দী শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে পরিচিত হতো জগতে!

গ্রাম্যপথ। (ব্রুসেলস্ মিউজিয়ম)

সন্ধ্যায় "মেষপালের গৃহপ্রত্যাবর্ত্তন" ছবিখানিও অঙ্কিত;—তুলিকার সাহায্যে, বাস্তব ও প্রকৃতির অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যে অতি নিপুণভাবে চিত্রিত।

কথানি ল্যাণ্ডস্কেপ, টেনিয়ার্সের "গ্রাম্য পথ", ও "ছায়ায় বিশ্রাম" এবং হবেমার জলে "প্রতিবিম্ব," প্রত্যেক-খানি ছবি বাস্তবিকই অতি সুন্দর। দৃশ্যপট হিসাবে, এগুলির মূল্য খুবই বেশী নিঃসন্দেহ।

গ্রাম্যপথ। (ব্রুসেলস্ মিউজিয়ম)

তা ছাড়া কতকগুলি মর্ম্মর-মূর্ত্তিও শিল্পীর ঔৎকর্ষের

TIGHT BINDING.

পরিচায়ক। পাথর কেটে যে এমন জীবন্ত প্রাণময়ী মূর্ত্তি তৈরী করা যেতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হতো না! আমার অনেক দিন আগের কল্পনায় আঁকা, মাতৃমূর্ত্তির

:জলে প্রতিবিম্ব (ব্রুসেলস্ মিউজিয়ম)

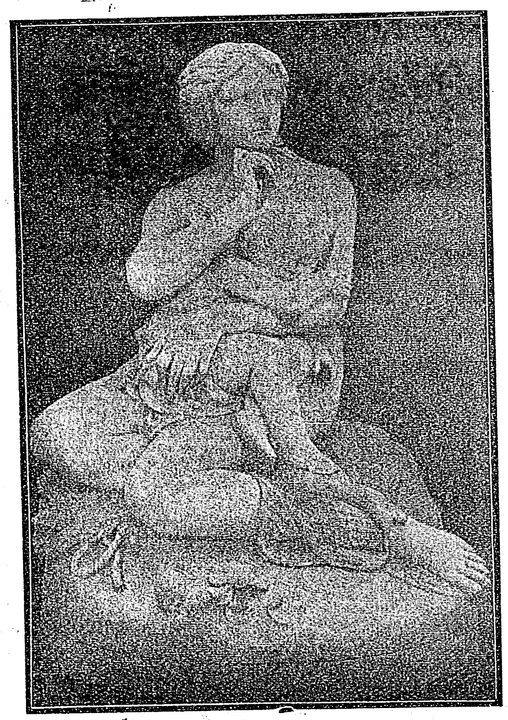

মাতৃমূর্ত্তি (ব্রুসেলস্ মিউজিয়ম)

জাজ্বল্যমানস্বরূপ মর্ম্মর মূর্ত্তি দেখতে পেলুম, বেলজিয়মের মিউজিয়মে, শিল্পী ব্রেকিলিয়ারের হাতে গড়া!

"নীরব নিথর ঘুমাই যখন,
মোর পানে চেয়ে কর জাগরণ,
অপলক স্থির, নিস্পন্দ নয়ন ;
স্নিগ্ধ কর দুটি, বুলাও আমার মাথে।

সুষুপ্ত সন্তান বুকে, জননীর অপলক, নিষ্ক হীন স্থিরদৃষ্টি, সে এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য! সারা দিন খেলাধূলার পর, অশান্ত শিশু খেলাধূ ফেলে, শান্তিময় জননীর কোলে অঘোর ঘু অচেতন ; কী সারল্যময় তার সেই নিদ্রাভা নত চক্ষু দুটি! কী স্নিগ্ধ পবিত্রতাময় তা সেই নির্ভরশীল কোমল আনন! আর তা পাশে, কী স্বর্গীয় পবিত্রতামাখা, সন্তানের মঙ্গ কামনারত, জননীর স্নিগ্ধ মুখমণ্ডল, আর সুন্দর, "নিস্পন্দনয়ন, অপলক- স্থির" জননী দৃষ্টি! দুই বন্ধুতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলুম, কখ সন্তানের পানে, কখনো জননীর মুখের পানে! কো ছেড়ে কোন্‌টা দেখি? কোন্‌টার চেয়ে কোন্‌টা বেশী সু তাও পর্য্যন্ত ঠিক কর্ব্বার ক্ষমতা নেই।

শিল্পী ডিলেন্সএর "উপাসনারতা একটি বালিকা প্রতিমূর্ত্তিও খুব চমৎকার লাগলো! সুগঠিতদেহা কিশো একান্ত নির্ভরতার সঙ্গে হাঁটুগেড়ে বসে, যুক্তকরে, নিমীলি নেত্রে প্রার্থনা কর্চ্ছে! সারল্যময়, প্রার্থনারত ভা ভাবটি সত্যসত্যই অভূতপূর্ব্ব ও অবর্ণনীয়।

সেদিন মধ্যাহ্নভোজন সারতে হলো আর্টগ্যালারি নিকটেই একটি রেস্তরাঁয়। রেস্তরাঁয় এক কাপ চা যাহা অ খাবারের সঙ্গে পাওয়া গেল, তাহা খুবই ভাল বলতে হ বন্ধুবর ও আমি দুজনেই একবাক্যে অভিমত প্রকাশ ক যে ভারতবর্ষ ছাড়ার পর, এ রকম এক কাপ চা বিলা কখনো ভাগ্যে জুটে নাই! সত্যসত্যই বিলাতে চা কখনো তৃপ্তি হয় নাই, ফরাসী দেশে ত নয়ই, ওখানে মদের পরিবর্ত্তে লোকে জলটুকু পর্য্যন্ত ছোঁয় না।

রাত্রিতে একটা সিনেমা-হলে ক-ঘণ্টা কোন রকমে কাটানো গেল। কোনরকমে কাটানো গেল, কারণ ফরাসী ভাষায় সবাক্‌চিত্র পরিহার কর্ত্তে মনস্থ করেও পারা গে না, অনেক দূরে একটি নির্ব্বাক চিত্রশালা আছে সেখানে গিয়েও শুনতে পাওয়া গেল, নির্ব্বাকও

সবাক হয়ে গেছে! সুতরাং অতখানি গিয়ে আর ফিরতে প্রবৃত্তি হলো না, অথচ তা' হজম কর্ত্তে কষ্টও হলো বেশ কিছু! যতক্ষণ ছবি হচ্ছিল, দেখছিলুম বটে, তবে "হিউগো" সাহেবের দৌলতে, বুঝতে পাচ্ছিলুম একটু আধটু মাত্র!

পরদিন বেলা প্রায় দশটায়, নর্দ ষ্টেশন হতে রওয়ানা হওয়া গেল এণ্টওয়ার্পের পথে! পথে ভীড় এত বেশী ছিল যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট থাকা সত্ত্বেও একেবারে আগাগোড়া পথটা দাঁড়িয়েই কাটাতে হলো। তার উপর আবার উপদ্রব—T. T. C. এসে বল্লেন, কুক্ কোম্পানীর দেওয়া টিকেট অনুসারে আমাদের নর্দ ষ্টেশনে না উঠে মিডি ষ্টেশনে উঠা উচিত ছিল, তা না করার দরুণ দুজনকে তেরো ফ্রাঙ্ক করে অর্থাৎ নগদ ছাব্বিশ ফ্রাঙ্ক দিতে হবে। কি আর করা যায়, দিতে হলো আক্কেল-সেলামি! গাড়ীতেই দুচার জন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে আমাদের মস্তবড় একটা ভুল ধারণা ভেঙ্গে গেল। জার্ম্মাণ যুদ্ধের পূর্ব্বে সমগ্র ইয়োরোপে এণ্টওয়ার্পের মত সুদৃঢ় শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার মত দুর্গ আর একটিও ছিল না। নেপোলিয়ন তাই ভবিষ্যদ্‌বাণী করে-ছিলেন, যাদের তোপের মুখে এণ্টওয়ার্পের পতন হবে, তারা দুনিয়াতে হবে অপরাজেয়। অবশ্য ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ীর সে ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হয়নি! অভেদ্য দুর্গ এণ্টওয়ার্পেরও পতন হয়েছিল বিরাট জার্ম্মাণ-বাহিনীর সম্মুখে, কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে তাদেরও পতন ঘটতে বেশী দিন দেরী হয় নি। মনে ধারণা ছিল, জার্ম্মাণ-বাহিনীর তোপের মুখে ধ্বংসাবশিষ্ট দুর্ভেদ্য এণ্টওয়ার্প দেখতেই হবে; কিন্তু সহযাত্রীদের মুখে শুনতে পেলুম, তার চিহ্নমাত্র নাই। শুধু শেলড্‌ট্ নদীতীরে, ওয়ার মিউজিয়ামে, যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রাদি রক্ষিত আছে! তাদের নিকট হতেই এণ্টওয়ার্পে দ্রষ্টব্য অন্যান্য যা কিছু তার সংবাদ পাওয়া গেল।

সেদিনটাও ভাল ছিল না, অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছিল, আর তার উপর বরফ পড়ছিল। ইংলণ্ড ছেড়ে এসে প্রায় সাত দিন পরে এই প্রথম বরফ দেখতে পেলুম এণ্টওয়ার্পে এসে! গাড়ী হতে নেমে ভাবনা হলো, কোন্‌দিকে, অজ্ঞাত অপরিচিত স্থানে যাই? একটু এদিক্ ওদিক তাকিয়েই চোখের সম্মুখে

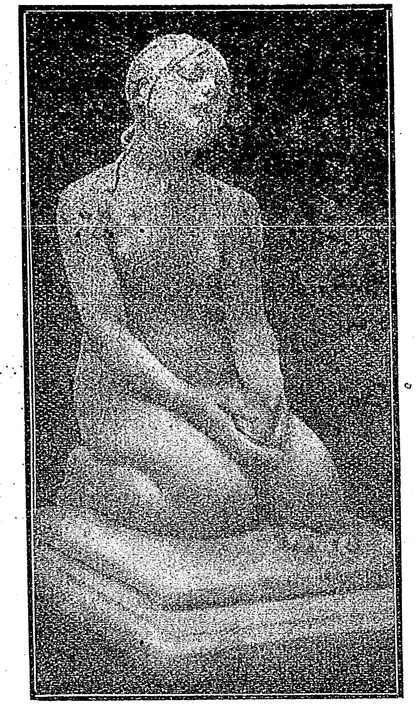

প্রার্থনারতা বালিকা (ব্রুসেলস্ মিউজিয়ম):

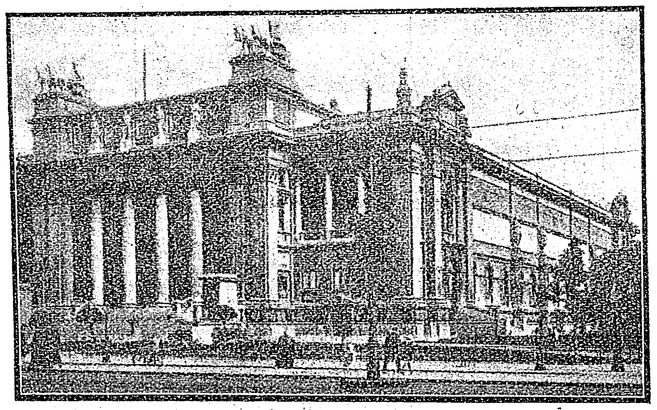

আর্ট গ্যালারি। (এণ্টওয়ার্প)

পড়লো বেশ উঁচু একটি গীর্জ্জার চূড়া! বরাবর লক্ষ্য করে এসেছি, উঁচু যা কিছু, বন্ধুবরের লক্ষ্য সর্ব্বদাই তার প্রতি।

TIGHT BINDING.

তাই যেই উঁচু চূড়া দেখা, অম্নি বল্লেন, ওটা দেখতে হবে। আমি বল্লুম, তা হবে পরে, এখুনি প্রথম আর্টগ্যালারিতে যাওয়া দরকার ; কারণ, সাড়ে তিনটায় বোধ হয় তা' বন্ধ হয়ে যাবে! এণ্টওয়ার্পে আর্টগ্যালারি বিশ্ববিখ্যাত। যেই তার নামোল্লেখ, অম্নি বন্ধুবর উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠ্‌লেন "ব-বেশ তাই।" ভাবাবেশের সময় বন্ধুবরের মুখে একটু কথা বাঁধে—বুঝতে পার্লুম আমার কথায় তাহার ভাবের সঙ্গে বেশ একটু আবেশ এসে লেগেছে! পথেই একজন

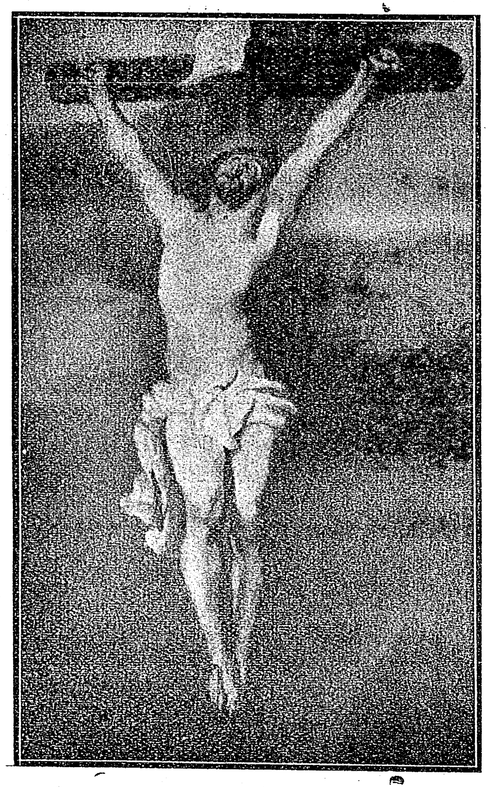

ক্রুশ-বিদ্ধ খৃষ্ট। (এণ্টওয়ার্প আর্ট গ্যালারি)

কনেষ্টবলকে জিজ্ঞেস করে, ট্রামে উঠে, আর্টগ্যালারির দরজায় এসে পৌঁছলুম।

বাহির হতে দেখে, আর্টগ্যালারির বিশেষত্ব বিশেষ কিছুই মনে হলো না। প্যারিসের লুভ, অথবা লণ্ডনের ব্রিটিশ আর্টগ্যালারির মত বড় নয়। মাঝারি গোছের বাড়ীখানা, দেখতে অনেকটা বড়বড় থামওয়ালা, কলিকাতার সিনেট হাউসের মত! যাই হউক বাহিরের চেহারায় একটুও মনোনিবেশ না করে ঢুকে পড়্‌লুম ভিতরে! দেখলুম, আর্টগ্যালারিটি চিত্র-সম্পদে বাস্তবিকই অতুলনীয়। ব্রুসেল্‌স্ এর দুটি আর্টগ্যালারি, আর এটির যদি একত্র সমন্বয় হয়, তবে পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ আর্টগ্যালারির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে বেলজিয়মে রক্ষিত শিল্প-ভাণ্ডার। শুধু চিত্র নয়—কতকগুলি মর্ম্মরমূর্ত্তিও আমাদের চোখে অতি চমৎকার লাগলো! এণ্টওয়ার্প আর্টগ্যালারির, আমাদের উভয়ের মতে ভাল লাগা, কথানা ছবির প্রতিকৃতি, পাঠক পাঠিকাদের জন্য এতৎসঙ্গে সন্নিবেশিত

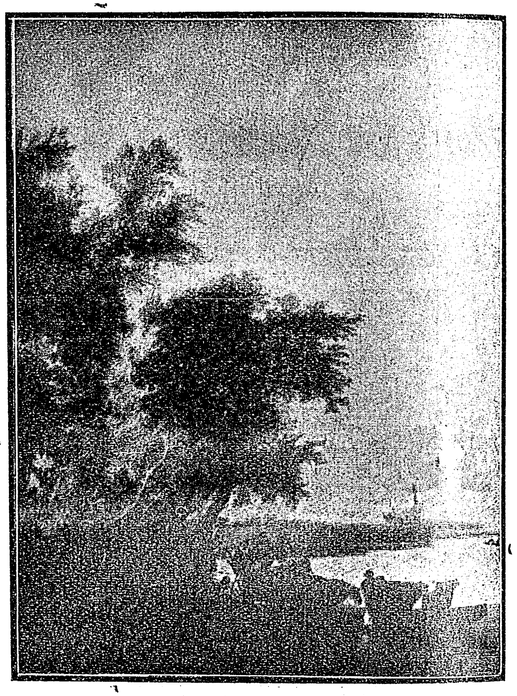

খেয়া (এণ্টওয়ার্প আর্ট গ্যালারি)

কর্চ্ছি। এ হতেই তাঁরা এণ্টওয়ার্পের প্রসিদ্ধ চিত্রশালার একটা মোটামুটি ধারণা কর্ত্তে পার্ব্বেন।

সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী ভ্যান্‌ডাইকের "ক্রুশবিদ্ধ খৃষ্ট" ছবিখানি অত্যন্ত চমৎকার। হস্তপদ ক্রুশে বিদ্ধ, খৃষ্টের কী অপূর্ব্ব মহিমোজ্জ্বল দৃষ্টি!

শিল্পী ভ্যান্ লিরিয়াসের, 'লেডী গডিভা'র ভীতচকিত, সন্ত্রস্ত দৃষ্টি, যাহা তুলিকার মুখে চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে ; দেখেই মনে হয় সার্থক শিল্পীর শ্রম ও সাধনা।

ভ্যান্ কুইকের "কাঠুরিয়া পরিবার" চিত্রখানিও বেশ! কাচ্চা, বাচ্চা, পুত্র, কন্যা, ও স্ত্রীর সঙ্গে—কাঠের বোঝা বয়ে কাঠুরের, শ্রান্ত কলেবরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের দৃশ্য, অত্যন্ত সজীব বলে মনে হয়। মনে হয় তৎকালীন প্রত্যেকটি মুখভঙ্গিমার সহিত আমরা যেন পরিচিত!

বারেণ্ড ভান্ ওর্লির, "বিচারের দিন" ছবিখানিও রংএর খেলার জন্য অত্যন্ত মনোরম দেখায়! উপরে আকাশে দেবদূতদের মেলা বসেছে, নীচেই অসংখ্য ঊর্দ্ধদৃষ্টি নরনারী

বিচারের দিন। (এণ্টওয়ার্প আর্ট গ্যালারি)

বিচারের প্রতীক্ষায় দাড়িয়ে আছে। নানাবিধ রংএর সংস্পর্শে, তুলিকার মুখে এতগুলি লোকের মুখচ্ছবি যথাযথ-ভাবে ফুটিয়ে তোলা, বাস্তবিকই শিল্পীর কুশলতার পরিচায়ক। এক রংএর প্রতিকৃতি হতে, আসল চিত্রখানির ধারণা করা সম্ভব নয়, তবু একটু আভাষ পাওয়া যায়!

হলাণ্ডস্কুলের রুইস্‌ডেল অঙ্কিত "খেয়া" চিত্রখানিও আমাদের চোখে চমৎকার লেগেছিল! গাছের নীচে, নদীর বুকে, পার হবার জন্য একখানা খেয়া নৌকা, তার উপর ওপারের যাত্রী গাড়ী ঘোড়া লট্‌বহুর নিয়ে অনেকগুলি লোক! দৃশ্যপট হিসাবে এখানার মূল্য খুবই বেশী বলেই মনে হ'ল।

ব্রুসেলস্ মিউজিয়মে দেখা মর্ম্মর-মূর্ত্তির মত, এখানেও অনেকগুলি মর্ম্মরমূর্ত্তি দেখে শিল্পীর ঔৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া গেল! "খাদ্য বিতরণ" দৃশ্যটি বাস্তবিকই শিল্পীর এক অভূতপূর্ব্ব সৃষ্টি! জননীর সম্মুখে তিনটি শিশু। জননী একটিকে স্তনদান কর্চ্ছেন, আর বাকী দুটিকে একটি চামচে করে খাবার দিতে যাচ্ছেন। দুটি শিশুই একসঙ্গে হাঁ করে,—কে আগে খাবে, তারই

লেডী গডিফা (এণ্টওয়ার্প আর্ট গ্যালারি)

প্রতিযোগিতা চলছে! জননীও কার মুখে আগে দিবেন ঠিক না কর্ত্তে পেরে, মাঝামাঝি এক স্থানে চামচ ধরে আছেন। ছেলেদের মুখে খাবার সেই তীব্র ইচ্ছা, এবং জননীর মুখে তৃপ্তিতে উজ্জ্বল স্মিতহাস্য যা' ফুটে উঠেছে, তা' বাস্তবিকই অপূর্ব্ব! দেখে আরো দেখতে ইচ্ছা হয় ; মনে হয় যেন সম্মুখে মর্ম্মরমূর্ত্তি না দেখে, সজীব মূর্ত্তিই দেখছি ; এমনকি, ভ্রম হয় যেন হাস্যভরে জননীর ঠোঁট দুটি নড়ছে! সত্যসত্যই এমন জীবন্ত মূর্ত্তি জীবনে খুব কমই দেখেছি।

আর্টগ্যালারিতে ছবি কিনতে গিয়ে অনেকক্ষণ

আলাপ হলো ছবি-বিক্রেত্রীর সঙ্গে। বেলজিয়ানদের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, গত জার্ম্মাণ যুদ্ধের বীভৎসতা—অনেক কিছু সম্বন্ধে। আমাদের বিদেশী জেনে মেয়েটিও মস্তবড় একটা বক্তৃতা দিলে আমাদের কাছে। তাতে লাভই হলো,—সে দেশ সম্বন্ধে বেশ একটু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা

কৃষক পরিবার (এণ্টওয়ার্প আর্ট গ্যালারি)

গেল! কিন্তু আমাদের সময় কম, বেশীক্ষণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় চল্লো না। মেয়েটিকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম আর্টগ্যালারি হতে, সেই উঁচু চূড়াওয়ালা গীর্জ্জাঘরটির পথে!

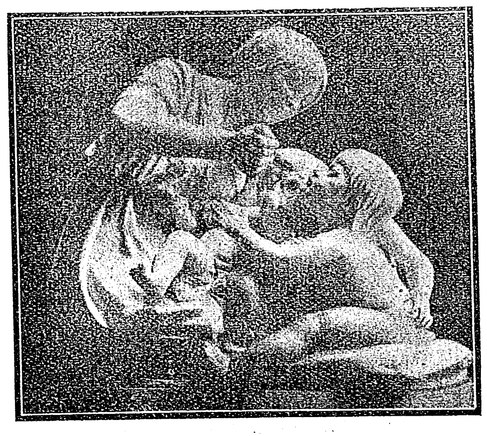

"খাদ্য বিতরণ" (এণ্টওয়ার্প আর্ট গ্যালারি)

ফরাসীদেশের মত বেলজিয়মও রোমান ক্যাথলিক। গীর্জ্জাটি অনেক শতাব্দীর পুরাতন। উঁচু চূড়াটি ১২৩ মিটার উঁচু, পাঁচতলা, তাতে একটি ঘড়ি আছে! ভিতরে ঢুকে খানিকক্ষণ মূর্ত্তিগুলি দেখে বেরিয়ে এলুম! একটু এগিয়ে গিয়েই সুপ্রসিদ্ধ স্কোয়ার ব্রাবোতে পৌঁছান গেল! এটি এণ্টওয়ার্পের একটি জনবহুল প্রসিদ্ধ স্থান। চারদিকেই ছ'সাত তলা বাড়ী, বেশীর ভাগই বড়বড় দোকান! মাঝখানে উঁচু একটি ব্রোন্‌জ মূর্ত্তি, একটি দীর্ঘকায় লোক হাত হতে একটি অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলছে! শুনতে পেলুম এণ্টওয়ার্প নামটি এই হতেই হয়েছে। (এণ্ট—হাত, ওয়ার্প—অস্ত্র!) সেস্থানে বেশীক্ষণ কালবিলম্ব না করে আমরা চল্লুম নদীতীর লক্ষ্য করে!

এণ্টওয়ার্পের নদী শেলড্‌ট্ মোটেই বড় নয়! তবু ছোট নদী দিয়েই ব্যবসার জাহাজগুলি সমুদ্র হতে আসে। নদীতীর বাণিজ্যের স্থান বলে লোকাকীর্ণ; তবে সেদিন বৃষ্টি হচ্ছিল, আর অবিরত তুষারপাত হচ্ছিল বলে লোকজন কম ছিল। আমরা খানিকক্ষণ নদীতীরে বেড়িয়ে গিয়ে ওয়ার মিউজিয়মে ঢুকলুম। ছোট্ট মিউজিয়মটি, বেশী কিছু নেই; শুধু জার্ম্মাণযুদ্ধে, এণ্টওয়ার্প দুর্গের ভগ্নাবশেষ অনেকগুলি কামান ও গোলা প্রভৃতি রাখা আছে! বড় আশা করে এসেছিলুম, জার্ম্মাণযুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ দুর্গপ্রাকার দেখতে পাব; কিন্তু দুধের আশা ঘোলেই মেটাতে হল মিউজিয়মে রক্ষিত ধ্বংসাবশেষগুলি দেখেই!

যখন বেরিয়ে এলুম তখন সন্ধ্যা হয় হয়। অবিরত বরফ পড়ছে, এবং বেশ শীত লাগছিল। হাত পা আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখে অগত্যা ঢুকলুম গিয়ে একটা কাফেতে! চিমনীর পাশে বসে হাত পা গরম কর্ত্তে কর্ত্তে কিছু চা, বিস্কুট ও মিষ্টির সদ্ব্যবহার করা গেল! তখন আর ব্রুসেলস্ এর গাড়ীর বড় বিলম্ব নাই, সুতরাং আমাদের গন্তব্য স্থল হল ষ্টেশন!

ব্রুসেলস্‌এ পৌঁছে সেই রাত্রেই রাইনল্যাণ্ডের পথে গাড়ীতে উঠ্‌লম ব্রুসেলস্ মিডি ষ্টেশনে! ব্রুসেলস্ ও এণ্টওয়ার্পে আমরা যে তিনটি দিন ছিলুম, বেলজিয়মের চিত্রশালাগুলি আমাদের অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছিল। শিল্পী না হয়ে শিল্পের সমজদার হতে বাধ্য হয়েছিলুম বন্ধু দুটি! ভাল যা', সুন্দর যা', নয়নানন্দদায়ক যা', সকলের চোখেই তা' আনন্দ দেয়, আমাদের দিয়েছিল;—তেমনটি জীবনে খুব কম স্থানেই পেয়েছি! বন্ধুবর ও আমি ব্রুসেলস্ ছাড়বার মুহূর্ত্তে, দুজনেই একবাক্যে অভিমত প্রকাশ কর্লুম বেলজিয়মের চিত্রসম্পদ, সত্যসত্যই—অপূর্ব্ব!

চিরন্তনীর জয়

কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

"তুমি?—তুমি হঠাৎ কোথা থেকে ভাই?"

প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বিকাশ অনিলকে বাহিরের ঘরে একরকম টানিয়াই লইয়া গেল।

অনিলচন্দ্র বলিল, "হ্যাঁ, অনেক দিন তোমাদের কোন পত্র লিখিনি। তা, মনীশ এখন কোথায়?"

"সে এখন কলকাতায় নেই, ভাই। শুনেছ, চিত্র-জগতে সে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।"

অনিলচন্দ্র বলিল, "তোমাদের সংবাদ আমি রাখি। যদিও মাস ছয়েকের মধ্যে তোমাদের চিঠি লিখিনি বটে। সে এখন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী, সে সংবাদ আমার ভালই জানা আছে। তার পর তুমি এখন কি করছ?"

বিকাশ সহাস্যে বলিল, "বাঙ্গালীর ত দু'টি পথ, হয় কেরাণীগিরি, নয় ত মাষ্টারী বা ওকালতি। আমি এখন—কলেজে একটা প্রফেসারি জুটিয়ে নিয়েছি। তার পর তুমি? সিভিলের সার্ব্বিসের পদ পেয়েছিলে জানি, নাও নি সে খবরও রাখি। এখন কোথায় আছিস্ বল ত ভাই?"

অনিলচন্দ্র সতীর্থ ও বাল্যবন্ধুর দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "আমারও ঐ গতি।—পুরের কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিয়েই আছি। মনীশ কোথায় গেছে বল্‌লি?"

"—পুরের নবীন মহারাজ তার চিত্রশিল্প-প্রতিভায় মোহিত হয়ে গেছেন। তাকে দিয়ে কতকগুলো ছবি আঁকিয়ে নেবার জন্য, পূজোর সময় তিনি তাকে সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে গেছেন। আজ সকালেই তা'র ফিরবার কথা। লাহোর থেকে যে চিঠি পেয়েছি তাতে তাই লিখেছে।"

এমন সময় বিকাশের পিতা বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিলেন। পুত্রের অন্যতম অকৃত্রিম সুহৃদ অনিলচন্দ্রকে তিনি উত্তম-রূপেই জানিতেন। এক সময়ে মনীশ ও অনিল উভয়েই তাঁহারই প্রিয়পাত্র ছিল।

অনিলচন্দ্র বন্ধুর পিতা ও প্রথম-জীবনের আদর্শ শিক্ষা-গুরুকে দেখিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিল। বিকাশের পিতা সস্নেহে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "তোমার সাফল্যের সংবাদ আমি শুনেছি, বাবা। তিন বিষয়ে এম্-এ দিয়ে প্রত্যেক বারে প্রথম স্থান অধিকার করেছ, এ সংবাদ আমার অগোচর নেই। সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষাতেও তুমি জয়লাভ করে সে পদ নাও নি, তাও আমি জানি। এজন্য তোমার প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা হয়েছে, বাবা।"

শিক্ষক মহাশয়ের প্রশংসা-বাক্যে অনিলচন্দ্র ঘামিয়া উঠিল। লজ্জার অরুণ রাগ তাহার সুগৌর মুখমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিল। সে মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন মানুষ হতে পারি।"

"হ্যাঁ বাবা, সে আশীর্ব্বাদ আমি সর্ব্বদাই তোমাদের তিন বন্ধুকেই করে থাকি। মনীশও খুব নাম করেছে।"

বিকাশ ইতিমধ্যে বাড়ীর মধ্যে গিয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "অনিল, আয় ভাই, মা তোকে ডাক্‌ছেন।"

"যাও বাবা, যাও" বলিয়া বিকাশের পিতা জামা জুতো খুলিতে লাগিলেন।

চলিতে চলিতে বিকাশ বলিল, "তুই কোথায় উঠেছিস্?"

অনিল বলিল, "আমার মামা ভবানীপুরে নূতন বাড়ী তৈরী করেছেন। মা ও বাবা সেখানে এসেছেন। আমি কাল কলকাতায় দুপুরে এসে পৌঁছেছি। সেখানেই আছি।"

বিকাশের মাতা হাস্য মুখে পুত্র সম অনিলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কাছে বসাইলেন। নানা কুশল প্রশ্নাদির পর বিকাশের মাতা বলিলেন, "তা বাবা অনিল, তোরা তিন বন্ধু কি যে প্রতিজ্ঞা করে বসে আছিস—বিয়ের নামই নেই।"

বিকাশ তখন ব্যস্ত ভাবে ঘরের এক কোণে একখানি ছবি খুলিয়া লইয়া মুছিতেছিল। অনিলচন্দ্র মাথা নত করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

বিকাশের মাতা পুনরায় বলিলেন, "এমন সব সোনার চাঁদ ছেলে, লেখাপড়া শেষ করে সবাই টাকা রোজগারও

আরম্ভ করেছে, অথচ এরা সংসারীর কাজ কর্ত্তে ভয় পায়, কি যে দিন কাল পড়েছে!"

বিকাশ এবার সম্মুখে আসিয়া ছবিখানি একখণ্ড কাপড়ের সাহায্যে মুছিতে মুছিতে বলিল, "সকল মায়েরই ঐ এক কথা।"

মাতা দীপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এক কথা ত হবেই। তোরা সব অন্যায় করবি। আর মা বাপ সে অন্যায় কাজের কথা তোদের মনে করিয়ে দেবে না?"

বিকাশ হাসিতে হাসিতে বলিল, "বিয়ে না করা কি পাপ কাজ?"

"পাপ নয়? সংসারে থাক্‌বি অথচ সংসার-ধর্ম্ম পালন করবি না, এটা অন্যায় কাজ নয়? পাপ নয়? সন্ন্যেসী হয়ে যা না, কেউ তোদের ছুঁয়ে বে না।"

বিকাশ সেইরূপই হাসিতে লাগিল। তার পর বলিল, "মাসীমা—মনীশের মাও ঐ কথা বলেন।"

"সবাই তাই বল্‌বে, বাবা। তোরা আজকাল বক্তৃতা দিস, কাগজে লিখিস বিধবাদের বিয়ে দাও। তাতে ত খুব উৎসাহ দেখতে পাই। কিন্তু কুমারীগুলো যে বিয়ে না হয়ে দিন দিন কোন্ পথে ভেসে চলে যাবে, সে ভাবনা কারও নেই। কি যে তোরা স্বদেশী করিস্, যাবা!"

এবার পুত্রদিগের তরফ হইতে কোনও উত্তর আসিল না। অনিল মৃত্তিকা-নিক্ষিপ্ত দৃষ্টিতেই বসিয়া রহিল। বিকাশও মুখ ফিরাইয়া লইয়া মনোযোগ সহকারে ছবির গায়ের ময়লা তুলিতে লাগিল।

মাতা বলিয়া চলিলেন, "এই যে তোরা তিনটি ভাল ছেলে,—তিনটি মেয়েকে সংসারে সুখী করতে পারিস্; কিন্তু সত্যিকার দেশ-ভক্তি তোদের আছে বলে আমি ত মনে করি না। তা যদি থাকৃত, তবে তিনটি মেয়ের জীবনের দুর্ভাবনা—তিনটি পরিবারকে কন্যাদায়ের বিশ্রী ভাবনা থেকে উদ্ধার করে ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করতে পারতিস্ না?"

বিকাশ এবার কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু থামিয়া গেল। এ যুক্তির বিরুদ্ধ যুক্তির উল্লেখ করিয়া সে তাহার জননীর স্নেহাতুর প্রাণে বেদনা দিতে চাহিল না।

অনিলচন্দ্র মুখ তুলিয়া চাহিতেই তাহার আননের ব্যথাতুর ভাব বিকাশকে আহত করিল। অনিল কেন এখনও বিবাহ করে নাই, তাহার সম্পূর্ণ হেতু সে জানিত না; কিন্তু তাহার মনে এ সম্বন্ধে একটা আভাস অনেক দিন হইতেই জাগিয়া উঠিয়াছিল। মনীশকে কেন্দ্র করিয়া তাহারা উভয়েই যে এখনও পর্য্যন্ত দাম্পত্য-জীবনে অগ্রসর হয় নাই, এ সত্য বিকাশ ত মনের কাছে অস্বীকার করিতে পারে না!

ছেলেদের নীরব দেখিয়া বিকাশের মাতা আর কোন কথা বলিলেন না। অনিল বলিল, "মনীশের আজ পৌঁছুবার কথা আছে, একবার সেখানে গেলে হয়। তার সঙ্গে আমার দরকারী কথা আছে।"

বিকাশ বলিল, "চল্ সেখানে যাই। এতক্ষণ হয় ত সে পৌঁছে গেছে।"

মা বলিলেন, "অনিল, বিকাশ, তোরা কিছু খেয়ে যা।"

অনিল বলিল, "না মাসীমা, আমি ভোর বেলা ভবানীপুর থেকে জলখেয়ে বেরিয়েছি, এখন ক্ষিদে নেই।"

বিকাশ বলিল, "মনীশ বোধ হয় আজই আস্‌বে। আজ রাতে আমরা তিনবন্ধু একসঙ্গে এখানে খাব। তুমি তার যোগাড় করে রেখ। কেমন অনিল?"

অনিল বলিল, "সেই ভাল।" তার পর, দুই বন্ধু বাহির হইয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

এমন ভাবে এই তিন বন্ধুর পরস্পর মিলন দীর্ঘকাল ঘটে নাই। বিকাশের দ্বিতলের এক পার্শ্বস্থ কক্ষে বসিয়া তিন বন্ধু সন্ধ্যার অবকাশ নানা আলোচনায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছিল।

বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবন-সঙ্গমের মধু-স্মৃতিভরা মুহূর্ত্তগুলি, অতীত যবনিকার অন্তরাল হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রফুল্ল যৌবন-মধ্যাহ্নের মিলন-ক্ষেত্রে যেন অভিনব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেখা দিতেছিল। ডিস্-রেলীর ছাত্র-জীবন সংক্রান্ত অমোঘ বাণীটি আজ বিকাশের মনে বারবার উদিত হইতেছিল।

শিক্ষা-মন্দির—বিশ্ববিদ্যালয় জীবন-প্রভাতে বহু বন্ধু মিলাইয়া দেয়। কিন্তু সংসারের রথচক্রের পেষণে মানুষ যখন পিষ্ট হইতে থাকে—অর্থ, যশ, কীর্ত্তির পশ্চাতে ধাবিত হইয়া মানুষ যখন ব্যর্থতার হাহাকারে ভাঙ্গিয়া পড়ে, অথবা

সার্থকতার উচ্চ চূড়ে উন্নীত হয়, তখন পূর্ব্বের বন্ধুত্ব কোথায় বিলীন হইয়া যায় তাহা অনুমান করাই কঠিন হয়। জীবনের চক্ররথ মধ্যপথে থামিয়া না গেলে—বন্ধুর সংসার-বর্ত্তের এখানে সেখানে মাঝে মাঝে হয় ত পুরাতন বন্ধুর সাক্ষাৎ মিলিয়া যায়; তখন হয় ত তথা-কথিত মৌখিক অর্থহীন কুশল-প্রশ্ন অথবা উভয় পক্ষ হইতে একটু কাষ্ঠ হাসির বিনিময় অতীতকে বিদ্রূপ করিতে থাকে।

মানব-জীবনের এই সাধারণ পরিণতি সম্বন্ধে বন্ধুত্রয়ের জীবনে এখনও পর্য্যন্ত কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জন্মে নাই। এখনও বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের মাদকতাভরা তাহাদের জীবনের সমুদয় রঙ্গীন অংশে বাস্তবের নিকষকৃষ্ণ যবনিকা দুলিয়া উঠে নাই। এখনও অনাবিল বন্ধুত্বের প্রবল প্রবাহধারা তর তর বেগে অন্তরকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে।

রন্ধনশালার তত্ত্বাবধান ও ছেলেদের প্রেয় আহার্য্যগুলি প্রস্তুতের অবকাশে বিকাশের জননী, তাহাদের অগোচরে মাঝে মাঝে মিলন-আনন্দে অভিভূত আলোচনা-মগ্ন যুবক তিনটিকে দেখিয়া যাইতেছিলেন। বহু—বহু দিন তিনি এমন দৃশ্য দেখেন নাই। ভগবান! ইহাদিগকে সুখী কর, তৃপ্তি ও আনন্দ দান কর!

বিকাশ বলিয়া উঠিল, "আজ কিন্তু আমরা তিনজন এই ঘরেই ঘুমুবো!"

অনিল বলিল, "আমি মাকে বলে এসেছি, আজ আর ভবানীপুরে আস্‌তে পারবো না।"

মনীশ বলিল, "মা জানেন এখানেই আমার রাত্রিবাস।"

পল্লী সহরের অতীত জীবন-যাত্রার দৃশ্যগুলি তাহাদের বোধ হয় মনে পড়িতেছিল। অনিল মনীশের দক্ষিণ করপুট চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কিন্তু ভাই, তোমার প্রতিশ্রুতি ভুলো না। আমাদের স্বদেশী মেলায় তোমার একখানা নূতন ভাল ছবি দেওয়া চাই-ই।"

মনীশ বলিল, "তা নিশ্চয় দেব। এখনো ত একমাসের উপর সময় আছে। একখানা ছবি এর মধ্যে হয়ে যাবে।"

বিকাশ বলিল, "আচ্ছা, অনি, তুই সারা দিন সেখানে কি করে কাটাস বল্ ত, ভাই? সঙ্গী তোর বড় কেউ আছে বলে ত মনে হয়না।"

মনীশ হাসিয়া বলিল, "কেন, কেতাব-কীটের সঙ্গীর অভাব কি? কাউপার যেমন বলেছিলেন গ্রন্থাগার তাঁর সহধর্ম্মিণী। ও যে রকম কেতাব-কীট তাতে সঙ্গীর অভাব ওকে দুঃখ দিতে পারে না।"

বিকাশ বলিল, "সে কথা ঠিক। তা ছাড়া চরকাও ত আছে।"

অনিলচন্দ্র সরল প্রাণে উচ্চশব্দে হাসিয়া উঠিল। বন্ধুরা তাহার সম্বন্ধে অভ্রান্ত।

মনীশকে সে বলিল, "তোর সে ব্যায়ামচর্চ্চা এখনও চল্‌ছে ত?"

বিকাশ বলিল, "ওর চেহারা দেখে বুঝতে পাচ্ছিস না, ভাই? বঙ্কিমবাবুর সে বর্ণনাটা মনে আছে ত? ভাষাটা ঠিক মনে পড়ছে না, কোমলতায় এমন বলময়। ও তাই। রোজ ঘণ্টাখানেক স্যাণ্ডোর প্রক্রিয়া ও চালাবেই।"

মনীশ হাসিয়া বলিল, "বিকাশ এ বিষয়ে যে সাধুপুরুষ নয় তা ত তুমি জানই। ও আবার আমায় জুজুৎসু আর লাটি খেলাও শিখিয়েছে।"

অনিল বলিল, "ওসব একটু আধটু জেনে রাখা ভাল। বাঙ্গালীকে যদি জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করতে হয়, তবে বলিষ্ঠ, ব্যায়ামপটু দেহ ও সুস্থ সবল মনের অধিকারী হতে হবে। কলেজে এ বিষয়টা আমি ছাত্রদের মধ্যে বিশেষভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছি।"

চিন্তিতভাবে বিকাশ বাতায়ন-পথে বাহিরের দিকে চাহিয়া মুহূর্ত্তমাত্র চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পর গম্ভীর ভাবে বলিল, "ভাই, একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছ কি না জানি না। কলকাতায় ত দেখ্‌তে পাচ্ছি, ছেলেরা যেন নারীসুলভ কমনীয়তার পক্ষপাতী হয়ে উঠেছে। খেলাধূলার উৎসাহ অনেকের মধ্যে আছে বটে; কিন্তু যাদের মধ্যে সাহিত্যিক মনোবৃত্তি একটু আছে, ললিত-কলার যারা পক্ষপাতী, তারা যেন পৌরুষের চর্চ্চা করাটাকে অপরাধ বলে মনে করে।"

মনীশ বলিল, "এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার মত-বিরোধ নেই। বাঙ্গালী তার পূর্ব্ব পুরুষগণের পৌরুষ হারাতে বসেছে। এটা দুর্লক্ষণ।"

অনিলচন্দ্র বলিল, "কিন্তু মফঃস্বলের ছেলেদের মধ্যে এ দোষটা কম দেখ্‌তে পাচ্ছি। সহর ও মফঃস্বলে এ পার্থক্য কেন বুঝতে পাচ্ছি না। আমরাও ত এখনো তরুণদলের

বাইরে গিয়ে পড়ি নি। আমাদের শিক্ষার সঙ্গে এ মনোবৃত্তির যোগ নেই।"

মনীশ বলিয়া উঠিল, "আমাদের প্রথম শিক্ষা মেসো-মশায়ের কাছে, সে কথাটা ভুঁলে যেও না।"

অনিল বুঝিল, বিকাশের পিতার কথাই মনীশ বলিতেছে। শ্রদ্ধায় তাহার চিত্ত অবনত হইয়া পড়িল। সে বলিল, "সে সৌভাগ্য সত্যি সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তাঁর আদর্শ আমার জীবনে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে।"

বিকাশ কথাটার মোড় ঘুরাইয়া দিয়া বলিল, "মনীশ, তোর দেশভ্রমণের একটা মজার অভিজ্ঞতার কথা কি বল্‌বি বলছিলি যে। সেটা ত শোনা হয় নি।"

অনিল বলিল, "হ্যাঁ ভাই, সেটা শোনা যাক্‌।"

মুহূর্ত্তে মনীশ যেন গম্ভীর হইয়া পড়িল। ডিবা হইতে একটা পাণ তুলিয়া লইয়া চর্ব্বণ করিতে করিতে সে বলিল, "মহারাজার সঙ্গে কাশী হয়ে সোজা আমরা আগ্রায় যাই। মহারাজা লোকটা সৌখীন, সে কথা বলা বাহুল্য। সঙ্গে একখানা মোটর। ওটা চালাবার কৌশল অনেক দিন আগেই শিখে নিয়েছিলুম। কোথাও যখন একলা বেড়াতে যেতাম, তখন নিজেই হাঁকাতাম। তোরা ত জানিস নির্জ্জনতার আমি ভারী ভক্ত। ও রোগটা তোদের দু'জনেরও আছে। আগ্রায় যাবার উদ্দেশ্য অনেকগুলো ছিল। মানুষের শিল্প-প্রতিভার অনেকগুলো অতুলনীয় নিদর্শন সেখানে মূর্ত্ত হয়ে আছে। সেদিন পূর্ণিমা। ভারী ইচ্ছে হল, সাজাহানের প্রেমস্বপ্নের মূর্ত্ত-বিগ্রহের সাম্‌নে বসে বাঁশী বাজাব।" মনীশ সহসা নিমীলিত নেত্রে কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল।

বন্ধুযুগল মনীশের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার প্রতিভা-প্রদীপ্ত সুন্দর মুখমণ্ডলে একটা আনন্দদীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

নয়ন উন্মীলিত করিয়া সহাস্যমুখে সে বলিল, "সে সুন্দর, পবিত্র, মনোরম দৃশ্যের কথা জন্মে কখনও ভুল্‌ব না। কোন লোক যে পারে বিশ্বাস করি নে। আকাশে মেঘের বিন্দুমাত্র রেখাও নেই। যমুনার দিকে তাজের পেছনে একটা নির্জ্জন স্থান খুঁজে নিয়ে বসে পড়লাম। লোকজন সেদিন ছিল না বল্‌লেই হয়। অনেকক্ষণ ধরে জ্যোৎস্না-ধারায় অভিষিক্ত তাজের মহিমা দেখে—সৌন্দর্য্যের জোয়ারে প্রাণটা কাণায় কাণায় ভরে উঠলো। বাঁশীটা বাজাতে আরম্ভ করে দিলুম।"

মনীশ আবার নীরব হইল। বিকাশ তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি স্থির করিয়া বসিয়া ছিল। অনিলচন্দ্রও মুগ্ধ-ভাবে শুনিতেছিল। সহসা সে যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল; কিন্তু কোন কথা বলিয়া সে মনীশের একাগ্রতাকে ভঙ্গ করিতে চাহিল না।

"তারপর, কতক্ষণ বাঁশী বাজিয়েছিলুম মনে নেই। বার বার সুরটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাজিয়ে শেষে ঘড়ী বার করে চেয়ে দেখ্‌লাম, দশটা বাজে। আর রাত করা ঠিক নয়। মহারাজা আমায় সঙ্গে না নিয়ে কোন দিন খান না। মোটরখানা চাবি দিয়ে অচল করে বাইরে রেখে এসেছিলুম। বাঁশীটা পকেটে রেখে তাজকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লাম। খানিক দূর গিয়ে ফটক পার হবার সময়—"

মনীশ থামিল। সোজা হইয়া সে উঠিয়া বসিল।

বন্ধুরা দেখিল, বন্ধুর আয়ত নয়ন-যুগল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মুখে রোষবহ্নি অকস্মাৎ এমন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল কেন?

"দেখ্‌লাম, দুটো জোয়ান লোক একজন পুরুষকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। তাঁর দুইজন সঙ্গিনী স্ত্রীলোক চেঁচিয়ে উঠেছেন। পাষণ্ডরা সঙ্গের তরুণীকে ধরবার জন্য হাত বাড়িয়েছে।"

অনিল সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বাধা দিয়া মনীশ বলিল, "না বন্ধু, পারেনি তারা। একজন পদাঘাতে লুটিয়ে পড়ল। আর একজনকে গলা টিপে শুইয়ে দিলাম। এতদিনের শক্তি সাধনা ব্যর্থ হয় নি, ভাই। শুধু ছবি আঁকার তুলি টেনে জীবনটা নারীর মত কোমল করে পৌরুষহীন করে তুলি নি।"

রুদ্ধ নিশ্বাসে বিকাশ বলিল, "এ যে উপন্যাসের মত চমকপ্রদ! তার পর?"

"বদমাস্‌রা বেগ দেবার চেষ্টা একটু করেছিল, কিন্তু বন্ধু, তোমার জুজুৎসু শিক্ষা আর অব্যর্থ মুষ্টির আঘাত কাজে লেগে গেল। মোটরে করে তার পর তাঁদের তুলে নিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে দিলুম।"

অনিলচন্দ্রের নয়ন যুগল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। বিকাশ বলিল, "রোমান্স ঐখানেই শেষ। আর কিছু এগোল না?"

মনীশ গম্ভীর ভাবে বলিল, "তার মানে?"

"না, ভাই, আমায় ক্ষমা কর। তুমি যে ও-সবের অতীত তা জানি।"

অনিলচন্দ্র চমৎকৃত হইয়াছিল। ভ্রমণ-প্রত্যাগত বীরেশ বাবুর মুখে সেদিন এই ঘটনার কথা সে শুনিয়াছিল; কিন্তু তাহার নায়ক যে তাহারই অন্তরঙ্গ বন্ধু মনীশ, ইহা সে ভ্রমেও কল্পনা করিতে পারে নাই।

সে কি বলিতে যাইবে, এমন সময় বিকাশের মা আসিয়া বলিলেন, "তোরা ওঠ। ঠাঁই হয়েছে, আর দেরী নয়—দশটা বাজে।"

অনিলচন্দ্র কি ভাবিয়া প্রসঙ্গের আলোচনাটা স্থগিত করিল। তার পর তিন বন্ধু আহারের জন্য বিকাশের মাতার অনুসরণ করিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

অপরাহ্ণের আলোক জানালার মধ্য দিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। পরীক্ষকগণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কন্যার অবয়ব—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমালোচকের ন্যায় পরীক্ষা করিতে-ছিলেন। বীরেশবাবু উৎকণ্ঠিত চিত্তকে সংযত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ ও নিমন্ত্রিত হইয়া প্রতুলচন্দ্রের সহিত অনিলচন্দ্রও পরীক্ষা-সভার এক পাশে আসিয়া বসিয়া ছিল।

অনিলের সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া বীরেশবাবু চারিদিকে কন্যার জন্য পাত্র সন্ধান করিতেছিলেন। বিক্রমপুরের কোনও শিক্ষিত পরিবারের উচ্চশিক্ষিত একটি পাত্রের পক্ষ হইতে, পাত্রের পিতা, মাতুল ও খুল্লতাত গৌরীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। ছয় জোড়া তীক্ষ্ণ চক্ষুর দৃষ্টির আঘাতে গৌরী অগ্রহায়ণ মাসেও ঘামিয়া উঠিতেছিল।

কেতাবতী বিদ্যার পরীক্ষার পর শিল্প-নৈপুণ্যের পরীক্ষা গৃহীত হইল। গৌরী সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিনী তাহা তাঁহারা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। সুতরাং এই পরীক্ষার দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া গৌরী বোধ হয় স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল। পাত্র-পক্ষের তরফ হইতে পাত্রীর রূপ-গুণের পরীক্ষার কার্য্য সমাপ্ত হইলে কন্যাপক্ষীয়রা অনুমান করিলেন, পাত্র-পক্ষ এ বিষয়ে বোধ হয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

গৌরী তখন ভিতরে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইল। বীরেশবাবু স্বয়ং তাহাকে অন্দরে প্রবেশ করিবার দ্বার পার করিয়া দিয়া আসিলেন।

পরামর্শান্তে পাত্রের মাতুল বলিয়া ফেলিলেন, কন্যা সম্বন্ধে তাঁহাদের পক্ষ হইতে বিশেষ কিছু আপত্তি হইবে না। অন্যান্য বিষয়ের ব্যবস্থা যদি সঙ্গতভাবে হয়, তাহা হইলে এখনই তাঁহারা কথা পাকা করিয়া যাইতে পারেন। অগ্রহায়ণের শেষ দিকে তাঁহারা বিবাহ দিতে চাহেন। কারণ, পাত্র বিবাহের পরই বিলাত যাত্রা করিবে। সুতরাং বীরেশবাবু যদি তাঁহাদের দাবী মিটাইতে পারেন, তাহা হইলে এইখানেই বিবাহ দেওয়াতে তাঁহাদের আপত্তি হইবে না। পাত্র বিলাতে যাইবে বলিয়া অগ্রহায়ণের মধ্যে যে কোনও স্থানে বিবাহ দিবেন, অবশ্য যদি দরে বনে।

অনিলচন্দ্র এতক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে অন্য দিকে চাহিয়া ছিল। 'দর' কথাটা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র সে একবার বক্তার দিকে ফিরিয়া চাহিল।

বীরেশবাবু বিনীত ভাবে বলিলেন, "আপনাদের অভিপ্রায় জান্‌তে পারলে আমি অগ্রসর হতে পারি। তবে অনুগ্রহ করে মনে রাখ্‌বেন, আমি ধনী নই।"

পাত্রের মাতুল আদালতে পেস্‌কারী করেন। এখানকার জজ আদালতেই তিনি কাজ করিতেছেন। সেই সূত্রেই পাত্রপক্ষ কন্যা দেখিতে আসিয়াছেন। তিনি বিজ্ঞভাবে হাসিয়া বলিলেন, "বীরেশবাবু, আপনি পণ্ডিত লোক, সুতরাং আপনাকে বলাই বাহুল্য যে, পণ্ডিত জামাই পেতে গেলে টাকার মায়া করলে চলে না।"

অনিল চেয়ারের উপর চঞ্চল হইয়া উঠিল। প্রতুলচন্দ্রও আসনে সোজা হইয়া বসিলেন।

বীরেশবাবু বলিলেন, "তা জানি, নগেনবাবু। কিন্তু অবস্থার অতিরিক্ত ত মানুষের কোন কাজ করবার সামর্থ্য নেই।"

এবার প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "তা আপনাদের দরটা কি তাই বলুন না, নগেনবাবু।"

মুন্‌সেফদের মধ্যে প্রতুলচন্দ্র বিচারকালে কড়া হাকিম, সে কথা নগেনবাবু জানিতেন। বিশেষতঃ জজ সাহেবের সঙ্গেও তাঁহার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ন্যায় বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে সে খবরও তাঁহার অগোচর ছিল না। সুতরাং নগেনবাবু কণ্ঠস্বর বেশ মোলায়েম করিয়াই বলিলেন,

"ওঁদের আঁচ, মেয়েকে বীরেশবাবু যা ইচ্ছে হয় দেবেন, তবে হাজার তিনেক টাকার কমে যেন অলঙ্কারগুলো না হয়। বরাভরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনও বক্তব্য ওঁদের নেই। ঘর সাজান আস্‌বাবপত্র, সোনার রিষ্টওয়াচ্, অর্গান এ সব ত উনি নিজেই দেবেন। সে সম্বন্ধে কোন কথা বলা বাহুল্য। তবে ছেলের বিলেতে পাঁচ বছর থাকতে হবে, সেজন্য হাজার দশেক টাকা ওঁদের দরকার আছে। এ আর পাত্র হিসাবে এমন বেশী কিছু নয়; কি বলেন বীরেশবাবু?"

বীরেশচন্দ্র এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন। পাত্রপক্ষের ক্ষুদ্র তালিকার ভারে তিনি ধীরে ধীরে সম্মুখের আসনে বিবর্ণ মুখে বসিয়া পড়িলেন।

প্রতুলচন্দ্র রসলেশহীন কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "পাত্রটির যাতায়াতের জাহাজ ভাড়া কি ঐ দশ হাজারের মধ্যে?"

এবার পাত্রের খুল্লতাত বলিলেন, "নগেনবাবু সে কথাটা বল্‌তে ভুলে গেছেন। হিসাব করে যা পড়ে সেটা অবশ্য বীরেশবাবুই পরে দেবেন। তার জন্য কোন চুক্তি অবশ্য আমরা কর্‌তে চাই নে।"

অনিলচন্দ্রের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে এতক্ষণ চুপ করিয়াই বসিয়া ছিল। এইবার সে তাহার স্বভাব-সুলভ ধীর কণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা নগেনবাবু, আপনার ভাগিনেয় এম্-এ-তে কোন্ ক্লাশ, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

নগেনবাবু এই নূতন জনপ্রিয় তরুণ অধ্যাপকটিকে বিশেষ ভাবেই চিনিতেন। তিনি বলিলেন, "এম্-এ পাশ সে এখনও করে নি। বি-এ পাশ করেই বিলেত যাচ্ছে।"

"ওঃ!" বলিয়াই অনিল চুপ করিয়া গেল।

বীরেশবাবু ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, "নগেনবাবু, আপনি ত আমার অবস্থা জানেন। এত টাকা দেবার সঙ্গতি আমার নেই।"

পাত্রের পিতা এবার কথা কহিলেন। তিনি বলিলেন, "আপনি কত খরচ করতে পারেন, বীরেশবাবু?"

"মোট পাঁচ হাজার টাকার বেশী মেয়ের বিয়েতে খরচ করবার সামর্থ্য আমার নেই।"

পাত্রের খুল্লতাত উঠিয়া দাঁড়াইয়া তিক্ত কণ্ঠে হাসিয়া বলিলেন, "বিক্রমপুরের কুলীনশ্রেষ্ঠ বসুবংশের সঙ্গে তা হলে আপনার কুটুম্বিতা করা শোভা পায় না।"

অনিলচন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমরা কিন্তু গাভার প্রসিদ্ধ ঘোষবংশের এম্-এ-তে ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট ছেলেকে মাত্র দু হাজার টাকা খরচ করে ঘরে এনেছিলুম। প্রতুলবাবু এখানকারই মুন্‌সেফ্, ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন।"

বীরেশবাবু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আপনাদের দাবী মেটাবার সাধ্য আমার নেই। কি আর করব—মেয়ের অদৃষ্ট!"

পাত্রপক্ষ গম্ গম্ শব্দে ঘর কাঁপাইয়া বাহির হইয়া গেলেন। প্রতুলচন্দ্র অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার শ্যালকের পানে চাহিলেন। অনিলচন্দ্র তখন নতনেত্রে ভূমিতলে কি দেখিতেছিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

শয্যার উপর দেহভার এলাইয়া দিয়া অনিলচন্দ্র অনেকক্ষণ চুপচাপ পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ভৃত্য অনেকক্ষণ ঘরে আলো জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছে। অনিলচন্দ্রের সে দিকে খেয়ালই ছিল না। সে নীরবে উপরের দিকে চাহিয়া চিন্তারাজ্যে আপনাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছিল।

কনিষ্ঠা সহোদরার নিকট হইতে সে মৃদু তিরস্কার পাইয়াছিল। প্রতুলচন্দ্র তাহার সম্বন্ধে প্রকাশ্যে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ম্মম। কিন্তু অনিলচন্দ্র প্রতিবাদ করিতে ত পারে নাই। এ সকল কথার বিরুদ্ধে বলিবার কিই বা আছে!

বীরেশ বাবুর কন্যা প্রিয়দর্শনা, সে সম্বন্ধে প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক বরং তাহাকে বিশেষ অনুকূল মতই প্রকাশ করিতে হইয়াছে। গুণের দিক দিয়া এমন কন্যা হাজারে একটা পাওয়াও কঠিন, সে কথা অনিলচন্দ্র সুস্পষ্ট ভাষায় নিজেই প্রকাশ করিয়াছে। বংশমর্য্যাদা এবং পিতৃ-মাতৃ পরিচয়? সে বিষয়ে অভিযোগ করিবার কিছুই নাই, বরং এমন সর্ব্ববিষয়ে গুণবান পিতা এবং মাতা কয়টি বাঙ্গালী পরিবারে দেখিতে পাওয়া যায়?

তবে?—তবে অনিলচন্দ্রের সমক্ষে এই কন্যাকে গ্রহণ না করিবার কি সঙ্গত কারণ উপস্থিত থাকিতে পারে? চির-কৌমার্য্যকে সে নীতি বা বিশ্বাস হিসাবে বরণ করিয়া লয় নাই, এটুকু সে সহোদরা ও ভগিনীপতির নিকট প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। সংসারী

মানবের পক্ষে, যাহারা উপার্জ্জনক্ষম, সুস্থ-সবল-দেহ, তাহারা কোন কারণেই বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবার গুরু দায়িত্ব অস্বীকার করিতে পারে না, করা কর্ত্তব্য নহে, এ কথা তাহাকে মানিয়া লইতেই হইয়াছে। ব্যর্থ প্রেমের জন্য সে চিরকুমার-ব্রত পালন করিয়া চলিতেছে না, ইহাও অনিলচন্দ্র তীব্র প্রতিবাদের সহিত, সরল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছে।

তবে কন্যাদায়গ্রস্ত এই সমধর্ম্মী প্রবীণ অধ্যাপকের কন্যাকে বিবাহ করিতে তাহার বাধা কোথায়? তাহার পিতা ও মাতা এ প্রস্তাব শুনিবামাত্র সাগ্রহে মত করিবেন। সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের কাছে তাহার কোন অজুহাতই বিচারসহ হইবে না, তাহা অনিলচন্দ্র উত্তমরূপে জানে। এতকাল বিবাহ না করিবার যে সকল আপত্তি সে পর পর প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি এখন অন্তর্হিত। অর্থোপার্জ্জন সে স্বয়ং করিতেছে, পিতার সঞ্চিত সম্পত্তিও স্বচ্ছন্দ জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে নিতান্ত সামান্যও নহে। দেশের কাজে আত্ম-নিয়োগ যাহারা করে, তাহারা যে বিবাহ করিলেই দেশ-সেবা ব্যর্থ হইয়া যায়, এমন যুক্তি গায়ের জোরে ছাড়া প্রতিপন্ন করাও ত চলে না।

সবই সত্য। কিন্তু কোথায় তাহার বাধা সে কথা ত প্রকাশ করিয়া বলা চলে না, সঙ্গতও নহে। তাহার জননীর অন্তরের ব্যথা দূর করিবার জন্য বিবাহ করিবার কথা মনে পড়িবামাত্র আর এক জনের জননীর কথা তাহার অন্তরের দ্বারে তীব্রভাবে আঘাত করিল।

যদি সে কোনও দিন তাঁহার মুখে হাসি ফুটাইয়া তুলিতে পারে, তবেই সে নিজেও তাহার জননীর হৃদয়-ব্যথা দূরীভূত করিয়া দিবে। নহিলে তাহার জীবনে শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই। সে যদি প্রথম হইতেই বন্ধু-জননীর দুঃখের হেতু না হইত, সে যদি বন্ধুকে উৎসাহ না দিত, তাহা হইলে আজ তাহার বন্ধু-জননীকে এমন নৈরাশ্যপূর্ণ দুঃখময় জীবন যাপন করিতে হইত না।

সেদিনও তিনি তাহার হাত ধরিয়া কত অনুনয় বিনয় করিয়া বন্ধুর মতপরিবর্ত্তনের আবেদন জানাইলেন। তিনি ত জানেন না, তাঁহার পুত্র কতখানি ব্যর্থতা অন্তরে গোপন করিয়া চির-কৌমার্য্যকে বরণ করিয়া লইয়াছে। সে কথা প্রকাশ করা অসম্ভব। শুধু তিনজন ব্যতীত চতুর্থ কোন নরনারী তরুণ জীবনের এই বিয়োগান্ত অবস্থার হেতু ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই। জীবন থাকিতে সে কথা তাহারা প্রকাশ করিতেও পারিবে না।

বন্ধুর কল্পনাকে, কামনাকে সার্থক করিয়া তোলার পক্ষে এমন বাধা ঘটিবে ইহা যদি সে ঘুণাক্ষরেও পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিত, তাহা হইলে এমন অবস্থা যাহাতে না ঘটিতে পারে তাহার ব্যবস্থার জন্য অন্ততঃ চেষ্টা করিতে পারিত; কিন্তু তরুণ, উদার, কল্পনাপ্রবণ মন কোন দিক হইতেই বিন্দুমাত্র প্রতিবন্ধকতার আভাস পর্য্যন্ত অনুমান করিতে পারে নাই। যাহা শোভন, সঙ্গত এবং অনিবার্য্য বলিয়া মনে হইয়াছিল, যে পথ সত্য, শিব ও সুন্দরের অনুমোদিত বলিয়া তাহারা মনে করিয়াছিল, সেই পথে সেই শোভন ব্যাপারটিকে তাহারা সার্থক করিয়া তুলিতে অগ্রসর হইয়াছিল।

চিন্তার ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া অনিলচন্দ্র অস্থির হইয়া উঠিল। এমন সময় ভৃত্য আসিয়া জানাইল, আহার্য্য প্রস্তুত। অনিলচন্দ্র ভৃত্যকে বলিয়া দিল, সে ও পাচক আহারাদি শেষ করিয়া ফেলুক। আজ তাহার বিন্দুমাত্র ক্ষুধা নাই।

ভৃত্য বহুদিনের পুরাতন। মাতা তাহাকে পুত্রের সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। সে সঙ্গে থাকিলে তাঁহার পুত্রের কোন অসুবিধা হইবে না।

নিমাই দাদাবাবুর এমন ক্ষুধামান্দ্য কোন দিন লক্ষ্য করে নাই। সে বিস্মিত ভাবে বলিল, "কিছু খাবেন না? দিদিমণি অনেক রকম খাবার তৈরী করে আজ পাঠিয়ে দিয়েছেন যে। না খেলে তিনি দুঃখিত হবেন।"

অনিলচন্দ্র বলিল, "তবে ঠাকুরকে এখানে খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে যেতে বল। যদি খানিক পরে ক্ষিদে পায়, খাব।" নিমাই দেখিল, তাহার দাদাবাবুর মুখ শুধু বিষণ্ণ নহে, বিবর্ণ। কোন কারণ অনুমান করিতে না পারিয়া সে বিড় বিড় করিয়া কি বকিতে বকিতে রন্ধনাগারের দিকে চলিয়া গেল। অনিলচন্দ্র টেবলের সম্মুখে চেয়ারে আসিয়া বসিল। টেবলের এক ধারে পিতা মাতা, অপর ধারে তাহার, মনীশ ও রিকাশের আলোকচিত্র। তিন বন্ধুতে একসঙ্গে এই চিত্র তুলিয়াছিল।

নির্নিমেষ নেত্রে সে মনীশের প্রতিভাপ্রদীপ্ত সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে জানিত, মনীশ,

বিকাশ ও তাহার মধ্যে যে অনাবিল বন্ধুত্ব বিদ্যমান, সহসা মানুষের মধ্যে তাহা দুর্লভ। তাহার বিশ্বাস, তাহাদের তিনজনের মধ্যে মনীশের প্রতিভার দীপ্তি সমধিক উজ্জ্বল। মনীশের কল্পনায় প্রচুর সৃষ্টি-ক্ষমতা সঞ্চিত হইয়া আছে। প্রথম জীবনে ব্যর্থতার যে আঘাত-বেদনা সে পাইয়াছে, যদি তাহা না ঘটিত, তবে সহস্রধারায় মনীশের প্রতিভা চারি দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িত। নিজের চরিত্রের দৃঢ়তা সম্বন্ধে অনিলচন্দ্রের নিষ্ঠা ও বিশ্বাস পর্য্যাপ্ত থাকিলেও, মনীশের চিত্ত কিরূপ দৃঢ় তাহা সে ভাল করিয়াই জানিত। দুর্ব্বলতা তাহার মনের কোনও প্রান্তে উদিত হইতে সাহস পায় না। সেই গভীর, উদার, মহৎ হৃদয়ে নীচতার স্থান নাই। তাহা চপল, চটুল নহে। একবার যাহা তাহার মনে স্থান পায়, গভীর ভাবে তাহা রেখা কাটিয়া অচল অটল হইয়া থাকে।

সুতরাং এই দৃঢ়চেতা বন্ধুর মত পরিবর্ত্তনের আশা সুদূরপরাহত। কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহা না ঘটে, ততদিন তাহার পক্ষেও কৌমার্য্যকে পরিহার করা অসম্ভব। না এ বিষয়ে অন্য কোন পথ নাই। সে সম্পূর্ণ ভাবেই নিয়তির হস্তে এ বিষয়ে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

সংসারী মানুষ তাহার এই মনোভাব ও দৃঢ় সংকল্পের কথা শুনিয়া হাসিবে। বিদ্রূপ করিবে, ইহা সে জানে। তাই সে তাহার মনের কথা বন্ধুদিগের নিকট হইতেও গোপন করিয়া রাখিয়াছে। অনিলচন্দ্র নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

যাহা চিত্তক্ষেত্রের নিভৃততম স্থানে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে, তাহাকে ধ্যানের সাহায্যে অনুভব করিয়া আনন্দ লাভ করা যায়, কিন্তু লেখনী বা তুলিকার সাহায্যে তাহাকে কি সম্পূর্ণভাবে রূপ দেওয়া চলে?

গৌরী তাহার অঙ্কিত চিত্রপটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই কথাই ভাবিতেছিল। আসন্ন মেলার প্রদর্শনীতে সে একখানি চিত্র দিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছে। নানা স্থান হইতে প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পীরা তাঁহাদের বিচিত্র প্রতিভার দ্যোতক নানা প্রকার চিত্রশিল্প পাঠাইতেছেন। এ প্রতিযোগিতায় তাহার এই অক্ষম প্রয়াসসঞ্জাত অতি সাধারণ চিত্রের কোন মর্য্যাদাই থাকিবে না, তাহা সে ভালরূপেই জানে; কিন্তু তথাপি পিতার নির্দ্দেশানুসারে তাহাকে একখানি চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিতেই হইবে। অভিজ্ঞ বিচারকের দৃষ্টিতে তাহার চিত্র প্রশংসার যোগ্য বিবেচিত হইবে না, জানিয়া শুনিয়াই সে এ বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছে।

তবে এ কথা সে জানে যে, যত্নের ত্রুটি সে করে নাই। সমগ্র অন্তর দিয়া সে বর্ণ ও তুলিকার সদ্ব্যবহার করিয়াছে। এজন্য দীর্ঘ দিবা ও দীর্ঘ রাত্রি সে পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করে নাই!

চিত্রের অঙ্কন কার্য্য এতদিনে সমাপ্ত হইয়াছে। তুলিকার শেষ রেখাপাত, শেষ বর্ণবিন্যাস করিয়া আজ সে মুক্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিতে পাইয়াছে। ভালই হউক, আর মন্দই হউক, আগামী কল্য সে পিতার দ্বারা চিত্রখানি প্রদর্শনী ক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিবে।

পিতা স্বয়ং চিত্রবিদ্যার গভীর অনুরাগী। তিনি যথাসম্ভব তাহাকে উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে সে যে চিত্র দিতে চলিয়াছে, তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় পিতাকে সে এতদিন জানায় নাই, তিনিও জানিতে চাহেন নাই।

পাছে তাঁহার সমালোচনা বা মন্তব্যে তাহার কল্পনা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়ে, এজন্য তিনি সম্পূর্ণভাবে এ সম্বন্ধে আলোচনায় নিরস্ত ছিলেন। সে বরাবর দেখিয়া আসিতেছে, শিক্ষাদান কালে তাহার পিতা সকল রকমে তাহার কাছে আলোচ্য বিষয় বিশদ করিয়া তুলিয়া ধরেন। কিন্তু যখন গৌরী তাহাকে আয়ত্ত করিবার জন্য সাধনা করিতে থাকে, তখন তিনি আর কোনও প্রকার কৌতূহল প্রকাশ করেন না।

সন্ধ্যাকালে গৃহস্থালীর সকল কার্য্য শেষ করিয়া গৌরী নিজের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—সপ্তমীর চাঁদ শীতের আকাশে ঈষৎ কুহেলিমাখা।

শীতের রাত্রিতেও সে বাতায়ন রুদ্ধ করিয়া রাখিতে অভ্যস্ত হয় নাই। খোলা জানালা দিয়া মৃদু জ্যোৎস্নাধারা-ধৌত সন্ধ্যার আকাশ পানে কিয়ৎকাল সে চাহিয়া রহিল। সম্মুখে নদীর স্রোত বহিয়া চলিয়াছে।

ধীরে ধীরে সে অঙ্কিত চিত্রখানির আবরণ উন্মুক্ত করিয়া প্রদীপ্ত আলোকে তাহা সমালোচকের দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিতে লাগিল। যে সময়ের চিত্র স্মরণ করিয়া সে অঙ্কিত করিয়াছে তখন ফুল্ল-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীর

বিচিত্র মাধুর্য্যলীলায়িত অবস্থা। আজিকার এই ক্ষীণদীপ্তি চন্দ্রমার আলোকে তাহা কতকটা অনুভব করা যায় মাত্র।

সহসা তাহার সেই রজনীর ভয়াবহ অবস্থার কথা মনে পড়িল। সে রাত্রির ঘটনা তাহার মানসপটে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া যায় নাই কি? সেই স্মরণীয় বিপৎসঙ্কুল অবস্থায় তাহার মানসিক উদ্বেগ এখনও তাহার বুকের মধ্যে উদ্বেল হইয়া উঠে। দুরন্ত রিপু-তাড়িত, মনুষ্য-পশুর ক্ষুধিত, লুব্ধ দৃষ্টির চিত্র সে কোন দিনই ভুলিতে পারিবে না। দেবদূতের মত যে প্রচণ্ড শক্তিশালী যুবক আসন্ন অপমান ও লাঞ্ছনা হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, বহুবার সে তাঁহার উদ্দেশে হৃদয়ের ভক্তি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছে।

পিতা ও মাতা কতবার এই অপরিচিত যুবকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন। অনেক সময় তাহার মনে হয়, এই অপরিচিত, পথের ক্ষণিক দেখা মানুষটির হৃদয় কি মহৎ! নিজের পরিচয় দিয়া কৃতজ্ঞতা আদায়ের স্পৃহা মাত্রও তাঁহার ছিল না। বিংশ শতাব্দীর এই ঘোর স্বার্থপরতাপূর্ণ যুগে এমন বাঙ্গালীও কি সত্যই আছে? না, সেই পূর্ণিমা রজনীর সে ঘটনা স্বপ্নদৃষ্ট অবস্থার ন্যায় বাস্তবতাশূন্য?

গৌরী কতবার মনে করিয়াছে, সে বোধ হয় দুঃস্বপ্নই দেখিয়াছিল। নহিলে উপন্যাসের মত রোমাঞ্চকর ঘটনার মধ্যে যিনি ঔপন্যাসিক নায়কের ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি ঐন্দ্রজালিকের মায়াদণ্ডের স্পর্শে অন্তর্হিত দৃশ্যের ন্যায় কোন পরিচয়ের আভাসমাত্র না দিয়া বিরাট পৃথিবীর জনকোলাহলের মধ্যে কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গেলেন?

গৌরীর মন চিন্তার রাজ্যে এমনই ভাবে চলিতে চলিতে সহসা বাস্তব পৃথিবীর রাজ্যে ফিরিয়া আসিল। সে মনে মনে যেন একটু সঙ্কোচ ও লজ্জা অনুভব করিতে লাগিল। সত্য বটে, নারীচিত্ত সাহসী বীরের পক্ষপাতিনী হইয়া পড়ে—ইহা নারীর স্বভাবধর্ম্ম। কিন্তু এমন ভাবে নাম-গোত্রহীন ক্ষণিক-দেখা অপরিচিত পুরুষের সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া লাভ কি?

না, লাভ কিছুমাত্র নাই। তবে তাহার চিত্ত এমন ভাবে প্রায়ই কেন, ঘটনার স্মৃতি মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, সেই অজ্ঞাতকুলশীল মানুষটির সংবাদ জানিবার জন্য আকুলতা অনুভব করে? ইহা কি মানব-মনের একটা চিরন্তন অবস্থা? গৌরী চিত্রপটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিতে লাগিল।

চিন্তার বিচ্ছিন্ন সূত্রজাল অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে নিজেদের অবস্থার কথা তাহার মনে পড়িল। পিতার সদাপ্রসন্ন মুখ সে আজকাল সকল সময়েই বিষণ্ণ দেখে, মাতার আননে চিন্তা ও নৈরাশ্যের কালিমা। তাহার ভবিষ্যৎ চিন্তায় তাঁহারা যেন বিমূঢ়, অভিভূত হইয়া পড়িতেছেন।

কেন? এত দুশ্চিন্তা কিসের? তাহার বিবাহ হইতেছে না, কেহ তাহার নারীজন্ম অনুগ্রহপূর্ব্বক সার্থক করিয়া তুলিতেছে না বলিয়াই ত? নারী এমনই হেয়, এমনই বিক্রেয় পণ্য? তাহার কোন সত্তা নাই, কোন মর্য্যাদা নাই? যাহারা বিবাহ করিতে আসে, তাহারাই এক-তরফা মতামত প্রকাশ করিবে, পছন্দ করিবে, অথবা প্রত্যাখ্যান করিবে? এ অধিকার কে তাহাদিগকে দিয়াছে? নারীর তরফ হইতে অনুরূপ ব্যবস্থা কেন হইবে না?

পিতা মাতার কাছে এ সকল কথা উত্থাপন করিতে তাহার সঙ্কোচ হয় বলিয়াই এতদিন সে কোন কথা বলে নাই। এখন সে মার কাছে বলিবে, আজীবন সে কুমারীই থাকিবে। সে যে বিদ্যার আলোচনা করিতেছে, তাহাতে কি নিজের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা একান্তই অসম্ভব? তাহা ছাড়া পিতা যে সামান্য অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহার অবিদ্যমানে সে অর্থ কি তাহাদের সামান্য প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে? তবে?

গৌরী ধীরে ধীরে চিত্রপটের উপর আবরণ অন্যমনস্ক ভাবে টানিয়া দিতে দিতে মনে মনে ভাবিল, পৃথিবীর দুরন্ত মানুষ এবং মনের দুর্দ্দম প্রকৃতির আঘাতের শঙ্কা আছে বটে; কিন্তু মানুষ ইচ্ছা করিলে, সাধনা করিলে, এ সকল নিদারুণ বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে কেন পারিবে না?

এমন চরিত্রবান্ পিতা, এমন সাধ্বী জননীর রক্তধারা তাহার ধমনীতে প্রবাহিত। পবিত্র বংশের চিরাচরিত নিষ্ঠা ও সংযম কেন তাহাকে শক্তি প্রদান করিবে না?

না, সে আজীবন কুমারীই থাকিবে। পুরুষ যখন লাভ-লোকসান খতাইয়া—বাহিরের রূপ ও ঐশ্বর্য্যের ভিত্তির উপরই পত্নী-নির্ব্বাচন করিয়া স্বার্থপরতার চরম নিদর্শন দেখাইতে পারে, তখন নারীরও কর্ত্তব্য, তাহার এই নীচাশয়তার প্রশ্রয় না দেওয়া।

গৌরী সংকল্প স্থির করিয়া ঘরের বাহির হইতেই মাতার আহ্বান তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বন্ধুকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া অনিল বলিল, "তুই এসেছিস্ ভাই! আঃ! সত্যি আজ আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে!"

মনীশ সহাস্য মুখে বলিল, "অঙ্গীকার পালন করতে কোন দিন ভুলে গেছি কি, অনি?"

গাঢ় স্বরে অনিল বলিল, "না,—সে দোষ তোর প্রধান শত্রুও তোকে দিতে পারবে না। কিন্তু এতটা দৃঢ়তা যদি তোর না থাকৃত!"

বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া মনীশ বলিল, "তার মানে?"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া অনিল বলিল, "ব্যাখ্যা আমি কর্‌তে পারব না। থাক্ ও প্রসঙ্গ।"

মনীশ কি বুঝিল, সেই জানে। কিন্তু সে আর এ বিষয়ে কথা বাড়াইল না।

ভৃত্য নিমাই দাদাবাবুর বন্ধুর জিনিসগুলি গুছাইয়া রাখিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

মনীশ জামা জুতা খুলিয়া ফেলিয়া বলিল, "এখানে এসে দেখ্‌ছি ভালই করেছি। প্রথমে ভেবেছিলাম ছবিখানা ইনসিওর করে পাঠিয়ে দেব; কিন্তু শেষে ভাবলাম অনিকে কথা দিয়েছি, বেড়িয়েই আসি। এখানে এসেই দেখ্‌লাম, চমৎকার জায়গা। প্রকৃতি-লক্ষ্মী দু'হাতে তাঁর ঐশ্বর্য্য-সম্ভার ছড়িয়ে দিচ্ছেন। ভারী ভাল লেগেছে আমার।"

অনিশ বলিল, "বিকাশ আসবে না ভাই?"

"সে নিশ্চয় আসবে। তার ছুটি আর পাঁচ দিন পরে আরম্ভ হবে। কলেজ বন্ধ হইলেই সে রওনা হবে।"

প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া স্নান শেষে মনীশ আরাম করিয়া অনিলের পাঠ-কক্ষে বসিল। নিমাই উভয়ের জন্য জলখাবার লইয়া আসিল।

মনীশ বলিল, "এবার ত স্থিত-ভিত হয়েছিস, এখন বিয়ে করে ফেল্। তা হ'লে অভাগা বন্ধুদের আতিথ্য সৎকারের জন্য তোকে এমন ব্যস্ত হতে হবে না।"

অনিল উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া বলিল, "এ যে ভূতের মুখে রাম নাম! তা বন্ধু, দৃষ্টান্তটা তুমিই আগে দেখাও! সে অভিযোগ ত তোমার সম্বন্ধেও সমানভাবে চলে।"

মনীশ সহসা গম্ভীর হইয়া গেল। পরিহাসচ্ছলে সে যে প্রসঙ্গের আলোচনায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই যেন তাহার অন্তরকে বিদ্ধ করিল। প্রসঙ্গের মোড় ফিরাইয়া দিয়া মনীশ বলিল, "ঐ বাংলোটা কার রে? বেশ সুন্দর দেখ্‌তে ত!"

অনিল বলিল, "তা জানিস নে বুঝি? না, তুই কেমন করেই বা জান্‌বি। ওখানে মুন্‌সেফ প্রতুলবাবু থাকেন, আমার ভগিনীপতি রে—তুই তাঁকে আগে কখনও দেখিস নি। ঠিক্ ঠিক!"

নিবিষ্ট দৃষ্টিতে সেই বাংলোর প্রতি চাহিয়া মনীশ গম্ভীর ভাবে বলিল, "ওঁরা এখানে কত দিন আছেন?"

"তা অনেক দিন—আমার এখানে আসবার অনেক আগে প্রতুলবাবু এখানে বদলী হয়েছেন।"

এ আলোচনা এইখানেই শেষ হইল। আহারাদির পর উভয় বন্ধু খানিক বিশ্রাম করিল। তার পর অনিল বলিল, "তা হ'লে ছবিখানা এবার মেলা কমিটীর আপিসে পাঠিয়ে দেওয়া যাক্,—কেমন?"

মনীশ বলিল, "তা দিলেই হয়। তবে কমিটীর সেক্রেটারী ত অনিলচন্দ্র বসু?"

অনিল হাসিতে হাসিতে বলিল, "সে কথা ঠিক। কিন্তু আপিস ঘর ত এখানে নয়, তা ছাড়া চিত্র-শিল্পগুলি মিসেস টম্‌সনের কাছেই পাঠাতে হয়। চিত্রের আবরণ পর্য্যন্ত তিনি নিজে প্রথমে খুলবেন। তার আগে ছবি দেখবার নিয়ম নেই। এ ছবি বেশ করে প্যাক্ করা আছে ত?"

মনীশ আসবারপত্রের মধ্য হইতে ছবিখানি সন্তর্পণে বাহির করিয়া বলিল, "কমিটীর নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়েছে।"

অনিল সেই অবস্থায় মনীশের ছবি ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নীর কাছে ভৃত্য নিমাইয়ের হাতে দিয়া পাঠাইয়া দিল।

অপরাহ্ণকালে বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া অনিল বলিল, "চল, প্রতুলবাবুর সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ পরিচয় করে দিয়ে আসি। কোন আপত্তি আছে?"

মনীশ চলিতে চলিতে বলিল, "আপত্তি আবার কিসের?"

প্রতুলবাবু বাহিরের ঘরে বসিয়া তখন একখানি বই মনোযোগ সহকারে পড়িতেছিলেন। একজন অপরিচিত

যুবকের সহিত শ্যালককে আসিতে দেখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

অনিল বলিল, "ইনি প্রতুলবাবু, আমার ভগিনীপতি। আর ইনি আমার বন্ধু প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী মনীশ গুহ।"

অভিবাদনানন্তর প্রতুলবাবু সানন্দে মনীশকে বসাইলেন। প্রফুল্ল কণ্ঠে বলিলেন, "চিত্র-শিল্পের মারফতে আপনার পরিচয় আমার কাছে নূতন নয়। আমি আপনার চিত্রের অনুরাগী। আগে জান্‌তাম না,—আপনি অনিলবাবুর বন্ধু। অল্প দিন হ'ল সে সংবাদ অনিলবাবুর প্রমুখাৎ জেনেছি।"

আলাপ অল্পক্ষণেই বেশ জমিয়া উঠিল। মনীশ এই মার্জ্জিতরুচি পণ্ডিত ব্যক্তিটির সহিত আলাপ আলোচনায় আনন্দলাভ করিল।

জলযোগের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়া উভয়ে বলিয়া উঠিল, তাহারা অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই সে কার্য্য শেষ করিয়া আসিয়াছে। এখন একটু সহর ঘুরিয়া দেখিবার ইচ্ছায় বাহির হইয়াছে।

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "আমি আপনাদের সঙ্গী হ'তে পারলে সুখী হতাম; কিন্তু নূতন ডেপুটীবাবু একটু পরেই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। সুতরাং আমার অপরাধ নেবেন না, মনীশবাবু।"

মনীশ হাসিয়া বলিল, "না, না, সে কি কথা। আপনি বসুন, আমরা ঘুরে আসি।"

বাংলোর চারিদিকে ফুলের বাগান—গোলাপের স্নিগ্ধ মধুর দীপ্তিতে বাগানটি যেন হাসিতেছিল। তাহার সৌন্দর্য্য-লুব্ধ দৃষ্টি চারিদিকে একবার নিক্ষিপ্ত হইল। তার পর বন্ধু-যুগল রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল।

পরিচ্ছন্ন সহরের বিভিন্ন অংশ দর্শন করাইয়া অনিলচন্দ্র বন্ধুকে লইয়া নদীর দিকে চলিল। নদী তীরের মধুর সৌন্দর্য্য শীতের সন্ধ্যাতেও মনোরম।

সেদিন পূর্ণিমা। সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে পূর্ব্ব-গগনে পূর্ণিমার বৃহৎ চন্দ্র দেখা যাইতেছিল। শীতের কুহেলিকা আজ তেমন গাঢ় নহে। অল্পক্ষণেই চারি দিকে রজতধারার দীপ্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। মনীশের কবি-চিত্ত এ দৃশ্যে উল্লসিত হইয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল, "চমৎকার!"

নদীর ধারে একটি ক্ষুদ্র ঝোপ। দুই বন্ধুতে সেইখানে বসিল। তাহারা যেখানে আসিয়াছিল, তাহার অনতি-দূরে নৌকা ভিড়িবার স্থান। সখের জল-ভ্রমণ করিয়া কেহ কেহ এখানে নৌকা বাঁধিয়া তীরে উঠিয়া থাকে। নির্জ্জন নদীতীরে বসিয়া বসিয়া দুই বন্ধুতে কত সুখ দুঃখের আলোচনা চলিতে লাগিল।

শীতের নদী—তরঙ্গশূন্য। জ্যোৎস্না-স্নাত নদী-জলের উপর দিয়া একখানি জেলে-ডিঙ্গি বন্ধু-যুগলের অদূরে তীর-লগ্ন হইল। একটি পুরুষ ও দুইটি নারী ধীরে ধীরে তীরে উঠিলেন। বন্ধু-যুগল সেখান হইতে উঠিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল। পার্শ্বেই চন্দ্রালোকিত রাজপথ।

পুরুষটি অগ্রে, তাঁহার পশ্চাতে দুইটি নারী ধীরে ধীরে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া রাজপথে উঠিলেন। বন্ধু-যুগলকে তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন না। সহসা অস্ফুট কণ্ঠে মনীশ বলিয়া উঠিল, "আশ্চর্য্য!"

অনিল বন্ধুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "ব্যাপার কি?"

অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মনীশ তন্দ্রা-জড়িত কণ্ঠে বলিল, "এই তিনজনকে যেন কোথায় আমি আগে দেখেছি। ঠিক মনে হচ্ছে না; কিন্তু এটা ঠিক, এঁরা আমার চোখে নতুন নন্। হাঁ নিশ্চয়! মনীশ একবার যা দেখে, জীবনে তা কোন দিনই ভুল্‌বে না। তাই ত কোথায় এঁদের দেখেছি!"

অনিলের চক্ষুযুগল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বন্ধুর প্রতি নিবিষ্ট ভাবে চাহিয়া বলিল, "তোমার ভুল হয় নি ত?"

"পাগল, এত ভুল হলে কি ছবি আঁক্‌তে পারতাম? কিন্তু কোথায় দেখলাম এঁদের!"

তিনটি নরনারী তখন রাজপথের অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন। বন্ধুর হাত ধরিয়া অনিল বলিল, "চল রাত হয়েছে। কোথায় এঁদের দেখেছ সে কথা বাসায় গিয়ে ভাল করে ভেবে দেখো।" "চল" বলিয়া মনীশ নীরবে বন্ধুর সহিত বাসার দিকে ফিরিল। অনিলচন্দ্রও আর কোন কথা পথের মধ্যে বলিল না।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

মেলা আরম্ভ হইয়াছিল। জেলার হাকিম উদ্বোধন-কার্য্য সমাপ্ত করিয়াছিলেন। সহরের গণ্যমান্য এবং কর্ম্মীসম্প্রদায় এই স্বদেশী মেলাকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সে চেষ্টা

বহুলাংশে সার্থক হইয়াছিল। দূর পল্লী হইতে বহু লোক মেলা দেখিতে সহরে আসিতেছিল; কৃষিবিভাগ, উদ্যান-পণ্য-শিল্প-বিভাগ, চিত্র-শিল্প প্রভৃতি নানা বিষয়ের প্রদর্শনের আয়োজন হইয়াছিল।

আজ চিত্র-শিল্পাগারের উদ্বোধন হইবে। মিসেস টম্‌সন উহার উদ্বোধন-কার্য্য উপলক্ষে একটি বক্তৃতা করিবেন। সে জন্য সহরের সকলেই মেলা-প্রাঙ্গণের পটমণ্ডপে সমবেত হইয়াছিলেন। বিকাশ আজ সকালেই বন্ধুর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে। আহারাদির পর বন্ধুত্রয় সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। পল্লীসহরে এমন একটা মেলার আয়োজন দেখিয়া বিকাশ অত্যন্ত বিস্ময়ানুভব করিল।

মনীশ বলিল, "এ প্রচেষ্টার মূলে আমাদের সন্ন্যাসীকল্প বাল্যবন্ধু অনিলের প্রাণপণ আগ্রহ ও চেষ্টা আছে, এ কথা অনেকের মুখেই শুন্‌ছি।"

অনিল লজ্জিত ভাবে বলিল, "কি যে বল্‌ছিস্ তোরা। ক্বায অবশ্য মানুষ করে, কিন্তু মূলে যে তাঁরই কল্যাণ চেষ্টার আশীর্ব্বাদ রয়েছে, সেটা ভুলে গেলে চলবে কেন, ভাই!"

বিকাশ বলিল, "সে কথা ঠিক, কিন্তু যন্ত্রীর গুণগানের সঙ্গে যন্ত্রের গুণপনার প্রশংসা মানুষ যদি না করে, তাহ'লে সেটা অশোভন হয় না কি?"

মেলার প্রবেশ-দ্বারে তাহারা আসিয়া পড়িয়াছিল। মণ্ডপতলে দর্শকগণ সমবেত হইয়াছিলেন। অনিল বন্ধু-যুগলকে লইয়া সভানেত্রীর আসনের নিকটেই উপবেশন করিল।

মিসেস্ টম্‌সন্ নির্দ্দিষ্ট সময়ে হর্ষধ্বনির মধ্যে সভাক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রসন্ন আনন চারিদিকে নিক্ষিপ্ত হইল। অদূরে উপবিষ্ট অনিলচন্দ্রকে দেখিয়া, তাহার অভিবাদনের বিনিময়ে অভিবাদন ফিরাইয়া দিয়া তিনি আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

সভার কার্য্য যথারীতি আরম্ভ হইলে সভানেত্রী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মিষ্ট বচনে বলিলেন, "আপনাদের সযত্ন-সংগৃহীত চিত্রপূর্ণ চিত্রাগারের দ্বার উন্মোচন উপলক্ষে আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করতে চাই। মেলা-কমিটী আমাকে চিত্র-সম্বন্ধে গুণাবলীর বিবেচনা করে, যে চিত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হবে তা নির্ব্বাচন করবার ভার দিয়েছেন। অবশ্য এ কাযে সাহায্য করবার জন্য কয়েকজন গুণী ব্যক্তি দ্বারা তাঁরা একটা কমিটীও গঠন করে দিয়েছেন।

"সংগৃহীত চিত্রগুলি আমরা সকলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে দেখেছি। আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি মতে বিচারে যা নির্দ্দিষ্ট হয়েছে, তার একটা সংক্ষিপ্ত সার আপনাদের কাছে নিবেদন করছি। তার পর চিত্রাগারে প্রবেশ করে আমাদের নির্ব্বাচন ঠিক হয়েছে কি না, তা ত আপনারা পরীক্ষা করে দেখবার অবকাশ পাবেন।

"চিত্র-শিল্পে বাঙ্গালাদেশের উন্নতি দেখে আমি সত্যই বিস্মিত হয়েছি। অবশ্য অনেক চিত্র-শিল্পী মৌলিক পরিকল্পনার পরিচয় দিতে পারেন নি, এ কথাটাও এই সঙ্গে বলে রাখা সঙ্গত মনে করি। বিদেশী প্রতিভাবান চিত্রকরের অনুকরণে, শুধু অনুসরণে নহে, তাঁরা ছবি এঁকেছেন। কিন্তু মৌলিক পরিকল্পনা এবং খাঁটি ভারতীয় পরিকল্পনার পরিচয়ও কেহ কেহ দিয়েছেন—অবশ্য তাঁদের সংখ্যা অল্প।

"সংগৃহীত চিত্রগুলির মধ্যে দু'খানি ছবি আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, এই দুই চিত্র-শিল্পীর বিষয়-বস্তু একই। কমিটী এই বিচিত্র সাদৃশ্য দেখে সন্ধান নিয়ে জেনেছেন, এই দু'জন প্রতিভাবান চিত্র-শিল্পী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করেন, পরস্পর পরস্পরের সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু চিন্তারাজ্যে অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে থাকে। জানি না, কোন্ বিস্ময়কর মুহূর্ত্তে এঁরা দু'জনেই একই বিষয়কে চিত্র-রচনার উপযোগী বলে মনে করেছেন—"

ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী টেবিলের উপর হইতে একতাড়া কাগজ তুলিয়া লইয়া খুলিতে লাগিলেন। শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ বিস্ময়ে বক্তৃতা শুনিতেছিলেন। মনীশ চমৎকৃতভাবে অনিলের দিকে ফিরিয়া বলিল, "এ বড় অদ্ভুত কাহিনী ত!" অনিল নীরবে মৃদু হাসিল। বিকাশ বলিল, "সাহিত্যে এমন বিচিত্র সাদৃশ্যের কথা পড়া গেছে বটে।"

সভানেত্রী পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "আপনারা শুনে বিস্মিত হবেন, এই দুই চিত্র-শিল্পীর একজন পুরুষ, তিনি ইতিমধ্যেই চিত্রশিল্পে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন বলে শুনেছি। অপরা নারী, হিন্দুগৃহের কুমারী কন্যা!—" শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে একটা অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি উত্থিত হইল।

মিসেস্ টম্‌সন্, কণ্ঠস্বর আরও উন্নত করিয়া বলিলেন, "মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অগোচরে, বস্তু-তান্ত্রিক জগতের

অতীত মনোরাজ্যে কি অদ্ভুত লীলা চলে, মানুষ এখনও তার সম্পূর্ণ সন্ধান পায় নি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কোন নৈসর্গিক বা অনৈসর্গিক অবস্থার মধ্যে পড়ে পরস্পরের অপরিচিত এই তরুণ চিত্র-শিল্পী এবং এই তরুণী অন্তঃপুর-চারিণী একই বস্তুকে উপলক্ষ করে চিত্র অঙ্কিত করেছেন। নিপুণতার দিক দিয়ে পুরুষ চিত্র-শিল্পী যে অভিনব সৌন্দর্য্য তাঁর অঙ্কিত চিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতে সংগৃহীত চিত্রগুলির মধ্যে তাঁর চিত্রখানি শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নেই। কিন্তু তরুণী চিত্র-শিল্পীও ভাবের দিক দিয়ে যে ব্যঞ্জনা প্রকাশ করেছেন, তাতে তাঁর ছবিখানিও শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। তাই আমরা স্থির করেছি, এই দু'খানাই একই বন্ধনীর মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করেছে।"

সভানেত্রী এই পর্য্যন্ত বলিয়া একবার দর্শকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তার পর কোন্ কোন্ চিত্র দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে তাহার পরিচয় দিয়া তাঁহার অভিভাষণ সমাপ্ত করিলেন।

মনীশ চিত্রার্পিতবৎ বসিয়া এই অভিভাষণ শ্রবণ করিতেছিল। তার পর মৃদুস্বরে বলিল, "মিসেস্ টম্‌সনের বর্ণনাভঙ্গী ত চমৎকার!"

সভানেত্রী তার পর বলিলেন, "এখন হয় ত আপনারা প্রথম দু'জন চিত্রশিল্পীর নাম জান্‌বার জন্য কৌতূহলী হয়েছেন। পুরুষ-শিল্পীর নাম মিঃ মনীশ গুহ—"

মনীশ সহসা চমকিত হইয়া উঠিল। বিকাশ বলিল, "এ আমি জান্‌তাম। রসজ্ঞ সমালোচকরা মনীশের প্রতিভাকে অস্বীকার কর্‌তে পারেন না।"

শ্রোতৃবৃন্দের করতালি-ধ্বনি থামিলে কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলিয়া মিসেস্ টম্‌সন্ বলিলেন, "আর এই তরুণী চিত্র-রচয়িত্রী আমাদের এই সহরের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বীরেশ বাবুর কন্যা কুমারী গৌরী ঘোষ"—উচ্চ করতালি-ধ্বনিতে প্রায় দুই মিনিট কাল সভাস্থল মুখরিত হইয়া উঠিল।

মনীশ বিস্মিতভাবে বলিল, "এ মেয়েটিকে তুমি চেন অনিল?"

বিকাশ বলিল, "আশ্চর্য্য! বীরেশবাবুর নাম শুনেছি, দূর সম্পর্কে তাঁর স্ত্রী মার বোন্ হন। মেয়েটির পাত্র জুটছে না বলে সেদিন মাকে তিনি পাত্রের খোঁজের জন্য পত্র লিখেছেন। আমাকেও তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে বলে দিয়েছেন। তাঁর মেয়ে এমন গুণবতী!"

অনিল এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। এবার বলিল, "বীরেশ বাবু তোর আত্মীয় হন, সে খবর ত আমার জানা ছিল না!" মনীশ আপন মনে বার দুই অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল, "আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!"

মিসেস্ টম্‌সনের কথা আবার শুনা গেল। তিনি বলিতেছিলেন, "এবার আমি গিয়ে চিত্রাগারের দ্বারোন্মোচন করব। তার পর আপনারা যথারীতি চিত্রগুলি দর্শন করে ধন্য হবেন। কেবল একটা কথা আমি এখানে না বলে পারছি না। এই মেয়েটি বাইরের কোন সাহায্য না পেয়ে, তাঁর বাপের কাছে উপদেশ ও প্রথম শিক্ষা পেয়ে নিজের প্রতিভা-বলে যে সুন্দর ছবিখানি এঁকেছেন, এ জন্য আমি তাঁকে আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও প্রীতি জ্ঞাপন করছি। আর কমিটীর নির্দ্দিষ্ট পুরস্কার ছাড়াও আমি তাঁকে একটি মেডেল দিতে চাই।"

আবার সমবেত কণ্ঠে জয়ধ্বনি সভা-প্রাঙ্গণকে মুখরিত করিয়া তুলিল। বীরেশবাবু সভাক্ষেত্রের এক প্রান্তে বসিয়া ছিলেন। তিনি উদ্গত-প্রায় আনন্দ-অশ্রুধারাকে অতি কষ্টে সংবরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

দ্বারোন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে বহু ব্যক্তি চিত্রাগারের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে ভিড় একটু কমিলে অনিলচন্দ্র বন্ধুযুগলের সহিত চিত্রাগারে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই মনীশ তাহার চিত্র দেখিতে পাইল। "জ্যোৎস্নালোকে তাজ" চিত্রের পার্শ্বেই দেখিল আর একখানি চিত্র। তাহার শিরোনামা শুধু "জ্যোৎস্নালোকে।" অনিল বলিয়া উঠিল, "চমৎকার!" বিকাশ বলিল, "আশ্চর্য্য সাদৃশ্য, কিন্তু—"

তিনজনেই গৌরী-রচিত চিত্রখানির সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখিল, এই চিত্রখানিতে তাজ জ্যোৎস্নার ওড়নায় সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া দাঁড়াইয়া। তাহার কিছু দূরে একটি ভয়ার্ত্তা নারী। তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য একজন দুর্ব্বৃত্ত হস্ত প্রসারিত করিয়াছে। তাহার নয়নে লালসার কি উগ্র দীপ্তি! আর একজন বলিষ্ঠ তরুণ আক্রমণকারীর গলদেশ চাপিয়া ধরিয়াছে!

মনীশ আপন মনেই বলিয়া উঠিল, "চমৎকার! চমৎকার! কিন্তু এ দৃশ্য—" বিকাশ বলিয়া উঠিল, "মনীশ! এ যে তোর গল্পের ছবি বলেই মনে

হচ্ছে !" অনিলচন্দ্র সহসা আপনাকে দৃঢ় বলে সংবরণ করিল।

মনীশ ঈষৎ বিচলিত ভাবে বলিল, "তাই ত দেখছি। তবে—ওঃ! অনিল, সেদিন জ্যোৎস্না রাতে যাঁদের দেখেছিলুম !—মনে পড়েছে, তাঁরাই, তাঁরাই !"

মনীশের মনের কোনও প্রান্তে আর সন্দেহের অবকাশ মাত্র রহিল না। সে তখন বলিল, "নিশ্চয় এঁদের সঙ্গে তোমার জানা শোনা আছে, অনি ?"

মৃদু হাসিয়া অনিল বলিল, "তা আছে বৈ কি। তবে শুধু বীরেশবাবুর সঙ্গে। বহু বচন হিসাবে নয় !"

বিকাশ হাসিয়া বলিল, "অনিলের স্বভাবটা এক রকমই রয়ে গেল। রহস্য করবার অবকাশ পেলে, কখনই ছাড়বে না।"

অন্যান্য চিত্র দর্শনের পর মনীশ মাঝে মাঝে আত্মগত ভাবে বলিয়া উঠিতে লাগিল, "আশ্চর্য্য কিন্তু! ভারী আশ্চর্য্য !"

বিকাশ বন্ধুকে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু অনিলচন্দ্র তাহার গা টিপিয়া নিষেধ করিল। বিকাশ অনিলের ইঙ্গিতের উদ্দেশ্য না বুঝিলেও সে বন্ধুর সতর্কতার সম্মান রক্ষা করিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

শীতের প্রভাত। তখনও কুহেলিকার যবনিকা চারি দিক আচ্ছন্ন করিয়া ছিল। সূর্য্যোদয়ের বিলম্ব আছে।

হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা লইয়াই নিদ্রোত্থিত বন্ধুত্রয়ের মধ্যে আলোচনা চলিতেছিল। অনিলচন্দ্র তাহার স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় বলিয়া চলিয়াছিল, সমাজের লোক যতই শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রসর হইতেছে, মনুষ্যত্বের উচ্চাদর্শ হইতে ততই তাহারা নীচে নামিয়া চলিয়াছে। প্রতীচ্য সভ্যতার বস্তুতান্ত্রিক প্রভাব, প্রাচ্য সভ্যতার অনাড়ম্বর উদারতাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ, এই ভাবে চলিলে, কখনই আশাপ্রদ হইবে না। এ কথা সে জোর করিয়া বলিতে পারে।

বিকাশ বলিল, "কিন্তু আমরাই ত সে সমাজের লোক। আমরা ইচ্ছা করলে অনেক অনাচারের প্রতিবিধান করিতে পারি। খাঁটী বাঙ্গালী জীবনকে অবলম্বন করতে বাধা কোথায় ?"

মনীশ বলিল, "তাই করাই ত দরকার। তরুণ দলের পর্য্যায়ে আমাদের নাম নিশ্চয়ই আছে। সংস্কারের দিকে শক্তি প্রয়োগ করাই ত দরকার।"

অনিল বলিল, "কিন্তু আমাদের মন যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েই রয়েছে। এই ধর না কেন বিবাহে পণপ্রথা। এটার সংস্কার কি সাধ্যের অতীত ?"

মনীশ বলিল, "এটা ত সহজেই হতে পারে। হচ্ছেও অনেক।"

অনিল হাসিয়া বলিল, "অনেক নয়, কদাচিৎ দু' একটা। এই ধর না কেন, বীরেশবাবুর মেয়ে। দেখতেও চমৎকার—অবশ্য গৌরবর্ণ নয়, কিন্তু চেহারা খুব সুন্দর। গুণের কথা কি আর বল্‌ব! লেখাপড়া, সূচিশিল্প, গান বাজনা চমৎকার শিখেছেন। আর চিত্রশিল্পের পরিচয় ত নিজের চোখেই পেয়েছ। অথচ মেয়েটির বিয়ে হচ্ছে না। যে আসে, সেই দশ পনের হাজার চেয়ে বসে।" এই বলিয়া সম্প্রতি যে ঘটনা সে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিল। বিকাশ উত্তেজিত ভাবে বলিল, "এরা কি মানুষ!" মনীশ চেয়ারের উপর একবার নড়িয়া চড়িয়া বসিল।

বিকাশ র‍্যাপারখানা গায় জড়াইতে জড়াইতে বলিল, "আমরাও ত এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারি। অবশ্য আমার মাস্‌তুতো বোন। তোমরা দুজন ত বিয়ে কর নি! একজন কেন এমন চমৎকার মেয়েটিকে বিয়ে কর না। তোমাদের কারুরই ত অন্নবস্ত্রের অভাব নেই।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে বন্ধু-যুগলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। মনীশ চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় দ্বারপ্রান্তে মনুষ্য-পদশব্দ শ্রুতিগোচর হইল।

"অনিলবাবু উঠেছেন না কি ?"

"কে প্রতুলবাবু ? আসুন, আসুন !"

বাহিরে যাইবার সজ্জায় ভূষিত হইয়া প্রতুলচন্দ্র কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনিল বলিল, "এত সকালে কোথায় চলেছেন ?"

"আর ভাই, আমার বোন্ মেলা দেখ্‌বে বলে ভারী উৎসুক হয়েছে। কিন্তু লোকের অভাবে আস্‌তে পারছে না। বোনাই মফঃস্বলে আদায়ের চেষ্টায় গেছেন। তাই তাকে আনবার জন্য যাচ্ছি। ষ্টীমার ৮টায় ছাড়বে।

সেখানে পৌঁছুতে ১২টা বাজ্‌বে। আজই তাকে নিয়ে ফিরব। তবে আস্‌তে রাত্রি হবে। আপনার বোন্ রইল। কথাটা বল্‌বার জন্য এসেছিলাম!" প্রতুলচন্দ্র বিদায় লইলেন। আলোচনায় বাধা পড়ায় প্রসঙ্গটা আর উঠিল না।

মধ্যাহ্ন আহারের পর বিকাশ বলিল, "বীরেশ বাবুর বাড়ীটা—মাসীমার বাড়ীটা নদীর ধারে, সহরের দক্ষিণে বলছিলে না ? সেখানে আমি একবার যাব। তোমরা গল্প কর, আমি সেখান থেকে ঘুরে আসি।"

বিকাশ চলিয়া গেলে দুই বন্ধু শয্যার উপর শয়ন করিয়া পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করিল। দিবা নিদ্রার স্বভাব কাহারও ছিল না। চিত্রাগার হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে মনীশ একটু স্বল্পভাষী হইয়া পড়িয়াছিল, ইহা অনিল লক্ষ্য করিয়াছিল। এরূপ অবস্থা তাহার যে নূতন তাহা নহে। যখনই কোন একটা কল্পনা তাহার চিত্তে জাগ্রত হইয়া উঠে, সেই সময় মনীশ কম কথা কহে, ইহা অনিল ও বিকাশের অগোচর ছিল না। তার পর যখন তাহার কল্পনা বর্ণ ও তুলিকার সহযোগে রূপ গ্রহণ করে, তখন মনীশের এই গাম্ভীর্য্য বা অন্যমনস্ক-ভাব অন্তর্হিত হয়।

দূরে কোতোয়ালীর ঘটিকা-যন্ত্রে ৪টা বাজিয়া যাইবার শব্দ শ্রুত হইল। নিমাই আসিয়া দুইজনের জলখাবার দিয়া গেল। দুই বন্ধু জলযোগ সারিবার পর অনিল বলিল, "একবার ও-বাসা ঘুরে আসি। মনীশ চল্ না আমার সঙ্গে।" মনীশ বলিল, "যাবো ?"

"একা বসে কি করবি ? ওখানে খানিক বসে তার পর বেড়াতে গেলে হবে। বিকাশ সন্ধ্যার আগে ফিরবে বলে মনে হয় না। তার পর না হয় একবার তিন জনে মেলার দিকে যাওয়া যাবে। কি বলিস ?" "তাই চল্।" মনীশ জুতা জোড়া পায় গলাইয়া দিল।

প্রতুলবাবুর বাংলোয় উপস্থিত হইয়া মনীশ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বোনের শরীর এখন ভাল আছে ?" তরলিকার বিবাহের পর আজ সর্ব্ব প্রথম মনীশ অনিলচন্দ্রকে তাহার সহোদরা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল।

অনিলচন্দ্র অন্যমনস্কভাবে বলিল, "সে ভালই আছে। তার শরীর আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে। তার সঙ্গে দেখা করবি ?" "মন্দ কি !" অনিলচন্দ্র বন্ধুর দৃষ্টিতে একটা উজ্জ্বলতা এবং কণ্ঠস্বরে ঔৎসুক্যের ব্যঞ্জনা অনুভব করিল কি ? বাহিরের ঘরে মনীশকে বসাইয়া অনিল ভিতরে চলিয়া গেল।

মনীশ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। তাহার হৃদ্‌পিণ্ড যেন দ্রুত তালে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। একটা অনুভূতির দহন জালা যেন ক্রমেই তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। সে ঘরের মধ্য হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পৌষের শীতল বাতাস তাহার ললাটের স্বেদবিন্দু মুছাইয়া দিল। সোপান বাহিয়া নীচে নামিয়া সে উদ্যানে বিচরণ করিতে লাগিল। অদূরে গোলাপ-বীথির ডালে ডালে কতকগুলি বড় বড় গোলাপ ফুটিয়া উদ্যানের শোভা বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। গাছগুলি একটি বাতায়নের নিম্নেই অবস্থিত।

অন্যমনস্কভাবে মনীশ সেই দিকে চলিল। তাহার উদ্দেশ্যের কোনও স্থিরতা তখন ছিল না। গোলাপ-কুঞ্জের কাছে পৌঁছিয়া সে হাত বাড়াইয়া একটি প্রকাণ্ড গোলাপ তুলিতে যাইবে, এমন সময় তাহার প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত হইয়া গেল। জানালার অপর পারে ঘরের মধ্যে দুইটি কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট শ্রুত হইল। একটি তাহার বন্ধু অনিলের, অপরটি—সে কাণ পাতিয়া শুনিল, হ্যাঁ সেই সুপরিচিত কণ্ঠস্বর, কিন্তু যৌবন-ধর্ম্মের প্রভাবে এখন তাহা আরও গুঞ্জন-মাধুর্য্য অর্জ্জন করিয়াছে! সে মন্ত্রমুগ্ধবৎ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না। তাহার মূর্ত্তিও কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না।

তরলিকার কণ্ঠ উচ্চ সপ্তকে উঠিয়াছিল। সে বলিল "তুমি কি বলছ, দাদা!—আমি এখন শুধু তোমার বোন্ নই। আমি একজনের স্ত্রী—সহধর্ম্মিণী। তিনি বাড়ী নেই, তাঁর অগোচরে আমি তোমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করব ?"

অনিল মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "সে ত তোমার অজানা নয়, আগে তাকে দাদা বলেই ডাকতে। এতে দোষ হতে পারে—বিশেষতঃ এ যুগে ?"

ঝঙ্কার দিয়া তরলিকা বলিয়া উঠিল, "তার মানে ? লেখাপড়া শিখে তোমাদের কি বুদ্ধি শুদ্ধি হয়েছে, বুঝতে পারি নে। হিঁদুর মেয়ে স্বামীর মত না নিয়ে বাইরের মানুষের সঙ্গে দেখা করতে যাবে কেন ? তোমার বন্ধুই বা একজন পরস্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য এত লালায়িত কেন ?"

অনিল বলিল, "তুই অত রাগ্‌ছিস কেন, বোন্ ?"

"রাগ হবে না? এসব লোকের মতিগতি দেখ্‌লে হিন্দুর মেয়ে সহ্য করতে পারে? আমার স্বামী যখন বাড়ী নেই, তখন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসা হল। কেন, তোমার বন্ধু ত অনেক দিন হল এখানে এসেছেন। এ বাড়ীতেও এসেছেন। আমার স্বামীকে বল্‌তে পারেন নি, তরলিকা আমার বোন্ হয়, তার সঙ্গে দেখা কর্‌ব? ছিঃ! ছিঃ!—তুমি আবার তার হয়ে ওকালতি করছ? না, তাকে বলগে দেখা হবে না। তার সঙ্গে সম্পর্ক কি? তার পর আমার স্বামীর অসাক্ষাতে আমি তার সঙ্গে দেখা করব না। হিঁদুর ছেলে হয়ে, হিঁদুর মেয়ের সঙ্গে পরস্ত্রীর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয়, এসব কি জানা নেই?"

মনীশচন্দ্রের দেহ টলিতে লাগিল। তাহার মাথায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল। নাক কাণ দিয়া অগ্নি-তরঙ্গ তীব্র উচ্ছ্বাসে নির্গত হইতে লাগিল। সে আর দাঁড়াইল না। সোজা ফটক পার হইয়া বন্ধুর বাসভবনে আসিল। স্পন্দিত দেহ-ভার বহন করা অসাধ্য দেখিয়া সে শয্যার উপর এলাইয়া পড়িল।

বুকের উপর হাত রাখিয়া সে কেবল বারকয়েক অতি কষ্টে উচ্চারণ করিল, "উঃ। উঃ!"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

অনিলচন্দ্র বাহিরে আসিয়া মনীশকে দেখিতে না পাইয়া চিন্তিত হইল। তবে কি মনীশ তাহাদের আলোচনা শুনিতে পাইয়াছে? মনীশ ত তরলিকার সহিত দেখা করিবার প্রস্তাব করে নাই, বরং সেই উপযাচক হইয়া দেখা-সাক্ষাতের প্রস্তাব করিয়াছিল। তরলিকা যে এই সহজ ব্যাপারটিকে এমন দূষ্যভাবে গ্রহণ করিবে, ইহা তাহার কল্পনাতেও আসে নাই। এখন সে বুঝিতে পারিয়াছে, এ প্রস্তাব উত্থাপিত করা সঙ্গত হয় নাই। সে এখন পরের স্ত্রী, হিন্দু ঘরের কুললক্ষ্মী। বিশেষতঃ—না, সত্যই তাহার সাংসারিক বুদ্ধি অল্প।

অনিলচন্দ্র দ্রুতপদে বাসার দিকে ফিরিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মনীশ নিমীলিত নয়নে, নিস্পন্দ ভাবে শয্যায় শুইয়া আছে।

অনিলের পদশব্দে মনীশ উঠিয়া বসিল। অনিল দেখিল, বন্ধুর আননে একটা বিচিত্র পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। তাহার নয়নযুগলে অস্বাভাবিক দৃঢ়তার দীপ্তি।

মনীশ স্থির দৃষ্টিতে অনিলের পানে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া অকম্পিত কণ্ঠে ডাকিল, "অনিল!"

বিস্মিতভাবে অনিল বলিল, "কি?"

"বীরেশবাবু আমাদের স্বজাতি?"

"নিশ্চয়।"

"তিনি আমার মত পাত্রে তাঁর মেয়েকে দান করতে রাজি আছেন? অবশ্য বিনাপণে?"

অনিলচন্দ্র চমকিত হইয়া উঠিল। পরে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিল, "তোমার মত পাত্র পেলে তিনি চরিতার্থ হবেন, আমি জানি।"

"তবে তুমি আজই প্রস্তাব কর, আমি তাঁর মেয়ে গৌরীকে আমার গৃহলক্ষ্মীর পদে বরণ করবার জন্য প্রস্তুত। এই মাঘ মাসের প্রথমেই যে শুভদিন থাকে, আমি রাজি।"

অনিলচন্দ্র কয়েক মুহূর্ত্ত বন্ধুর মুখের দিকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া চাহিয়া রহিল।

সত্য? ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা তবে বিংশ শতাব্দীতে ভঙ্গ হওয়া সম্ভবপর? কিন্তু কেমন করিয়া এমন সম্ভব হইল?

অনিলচন্দ্র মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক। মানব-মনের গোপনতম মনোবৃত্তির প্রকাশ-ভঙ্গীর সূক্ষ্মতম তত্ত্বগুলি সে বহুবার বহুরূপে আলোচিত হইতে দেখিয়াছে। সে কয়েক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিল। তার পর সহসা তাহার নয়নে একটা আলোক-দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কি তবে মনের গতির এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের মূলসূত্রটি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে?

মনীশ এতক্ষণ বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। সহসা সে মুখ ফিরাইয়া বন্ধুর দিকে চাহিল। দেখিল, অনিলচন্দ্র তাহারই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার সমগ্র আননে একটা রক্তোচ্ছ্বাস বহিয়া গেল। তার পর হৃদয়াবেগ সংযত করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "বিশ্বাস হচ্ছে না বন্ধু? আমি সত্য কথাই বলেছি। মনের উপরে এত দিন কল্পনার যে মায়াজালখানা পড়েছিল, সত্যের তীব্র আলোকে তার মিথ্যা রূপ ধরা পড়ে গেছে। মরীচিকা কখনো প্রকৃত শীতল জলে ভরা দীঘি হতে পারে না। এতদিন শুধু শুধু আমার মাকে, আমার পার্থিব দেবতাকে কষ্ট দিয়েছি। এখন সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাক্। বন্ধু, আমায় ভুল বুঝো না।"

তরুণের স্বপ্ন

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অনন্তচরণ চট্টোপাধ্যায়

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

অনিলচন্দ্র বোধ হয় এতক্ষণে প্রস্তুত হইতে পারিয়াছিল। সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "মেয়েটিকে একবার চোখে দেখ্‌বে না? শেষে যদি অনুতাপ আসে?"

গাঢ় স্বরে মনীশ বলিল, "কোন প্রয়োজন হবে না। আমার জীবনের প্রিয় বন্ধুদের মধ্যে একজন যখন তাকে দেখেছে, তুমি বিশ্বাস করতে পার, তখন আমি নিজের চোখে তাকে আর দেখ্‌ব না। নারী জাতি সম্বন্ধে আমার বিশেষ সম্ভ্রমবোধ আছে, সে কথা বোধ হয় তুমি ভালই জান। বারবার পুরুষ তার গৃহলক্ষ্মীকে বরণ করবার জন্য বেগুন, পটল, শাক, মাছের মত তাকে পরীক্ষা করে দেখ্‌বে, এটা আমার কাছে অসহ্য। অনিলচন্দ্র যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তাকে দেখ্‌বার আর দরকার হবে না। বিশেষতঃ আগরার তাজমহলে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে আমি সে মূর্ত্তি দেখেছি। নতুন করে আর দেখ্‌তে যাবার দরকার নেই।"

ধীরে ধীরে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অনিল বলিল, "তবে তাই হোক্। তুমি বস। এ শুভ মুহূর্ত্ত আমি বৃথা যেতে দিতে পারি নে। আমি বেরুচ্ছি, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আস্‌ব।"

নিমাই এমন সময়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "দাদাবাবু, এ বেলা কি রান্না হবে?"

অনিল প্রফুল্ল কণ্ঠে বলিল, "তোর যা খুসী, নিমাই। আজ ভালরকম ভোজের ব্যবস্থা করতে পারবি?"

বিস্মিত ভাবে নিমাই বলিল, "কেন পারব না? কিন্তু আজ কি হয়েছে, দাদাবাবু?"

অনিল বন্ধুর দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "আজ খুব ভাল খবর এসেছে। তাই এখানে উৎসব করা যাবে।"

সে আর দাঁড়াইল না। ছড়িগাছা হাতে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

তুলসীতলে প্রদীপ দিয়া, লক্ষ্মীর পূজা সারিয়া গৌরী নিজের ঘরে আসিয়া বসিয়াছিল। আজ তাহার বাবা এখনও তাহাকে নিয়মিত পাঠে সাহায্য করিবার জন্য আসেন নাই। সে পাঠ্য-পুস্তকগুলি লইয়া আলোকের সম্মুখে বসিল।

কিন্তু পড়ার দিকে আজ তাহার চিত্ত যেন অগ্রসর হইতে চাহিতেছিল না। গত্য কল্য মেলার চিত্র-শিল্পাগারের উদ্বোধন উপলক্ষে মিসেস্ টম্‌সন তাহার শিল্পপ্রতিভা সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, পিতার মুখে সে তাহা শুনিয়াছিল। সহরের সাপ্তাহিক পত্র একটা অতিরিক্ত সংস্করণ আজ ছাপিয়াছে, তাহাতেও সে তাহার প্রশংসার কথাগুলি পাঠ করিয়াছে। আজ পুনঃ পুনঃ সেই কথাগুলিই তাহার মনে পড়িতেছিল।

নিজের শক্তি সম্বন্ধে তাহার কোন বিশ্বাসই ছিল না। তাহার অঙ্কিত চিত্র যে বিশেষজ্ঞগণের কাছে প্রশংসিত হইবে, এমন দুরাশা মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার মনের কোন প্রান্তে স্থান পায় নাই। শুধু প্রশংসা পাওয়া নহে। বাঙ্গালার উদীয়মান, সর্ব্বজন-প্রশংসিত শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীর সমপর্য্যায়ে তাহার আসন নির্দ্ধারিত হইয়াছে!

গৌরী ভাবিতে লাগিল। বাস্তবিক, এ কি বিস্ময়! উভয়ে একই বিষয়-বস্তু লইয়া ছবি আঁকিয়াছে! কেমন করিয়া ইহা সম্ভবপর হইল?

গৌরী চিন্তাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে তন্ময় হইয়া গেল। নানারূপ সম্ভব অসম্ভব কল্পনা তাহার মনের মধ্যে জটলা পাকাইয়া তুলিল।

সহসা পার্শ্বের কক্ষে পিতা ও মাতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহার চমক ভাঙ্গিল। তাহার সম্বন্ধে বাবা মাকে কি বলিতেছেন? গৌরী উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল।

মাতা বলিলেন, "সত্যি না কি?"

পিতা বলিলেন, "অনিলবাবু এইমাত্র সেই প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। বিকাশও তাই বল্‌ছে।"

গৌরী শুনিল মাতা বলিতেছেন, "বিকাশ একটু আগে এসেছিল, তা কোন কথা বলে নি ত?"

"না, তখন বলে নি, এখন বল্‌ছে। পাত্র এক পয়সাও চায় না। তোমার কি মত?"

মাতা বলিলেন, "ছেলেটির স্বভাব-চরিত্র কেমন খোঁজ নেবে ত?"

বীরেশবাবু বলিয়া উঠিলেন, "অনিলবাবু ও বিকাশের পরম বন্ধু, শ্রেষ্ঠ চিত্রকর! তা ছাড়া আগরার তাজ দেখতে গিয়ে রাত্রি বেলা কি বিপদে পড়েছিলুম্ মনে আছে ত? এই মনীশ গুহই গুণ্ডাদের হাত থেকে গৌরীকে রক্ষা করেছিল। আরও শুনতে চাও?"

গৌরী চমকিয়া উঠিল। তাহার বুকের স্পন্দন দ্রুত-তালে নাচিয়া উঠিল। মনীশ গুহ! নব-যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীই তাহার মান-মর্য্যাদার রক্ষাকর্ত্তা! তিনিই আজ তাহার পাণিপ্রার্থী!

বীরেশবাবু বলিতেছিলেন, "ছেলে গৌরীকে দেখতেও চায় না। বন্ধুদের কাছে তার গুণের পরিচয় পেয়েছে, তাই যথেষ্ট বলে মনে করে। বিকাশ, অনিলের শৈশবের বন্ধু। মা আছেন, বিষয়-সম্পত্তি আছে; ব্যাঙ্কে নগদ টাকাও যথেষ্ট। চরিত্রটি গঙ্গার জলের মত পবিত্র। এমন পাত্র—মহাদেবের ন্যায় সুন্দর জামাই—তোমার মেয়ের তপস্যা এতদিনে বুঝি সার্থক হয়!"

গৌরী তখন তপস্যারতা গৌরীর ন্যায়ই নিমীলিত নেত্রে বসিয়া ছিল। পরীক্ষা দিবার জন্য সে আর কখনও পরীক্ষার্থিগণের সম্মুখে আসিবে না। তাহাতে যদি আজীবন কুমারীও থাকিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ; আজ কি সর্ব্বান্তর্যামী, অনাথ-শরণ তাহার সে মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন! তিনি নিরুপায়ের উপায়, দরিদ্রের বন্ধু, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় স্বরূপ এ কথা মিথ্যা নহে, মিথ্যা নহে!

* * * *

মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের শুভ্র রজনীতে মনীশ ও গৌরীর মিলন-মন্ত্র উচ্চারিত হইল। বাসর-ঘরে দম্পতি নীত হইল। অনিল ও বিকাশ সেখানে আসিয়া মহিলাবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আপনারা এখানে আমাদের দু'জনকে খানিকক্ষণ বসবার অনুমতি দিন। আমাদের শৈশব বন্ধু আজ আমাদের একটা গান শুনিয়ে দেবেন। ও গানটা এই ঘরে বসে শুনবার পর আমরা চলে যাব।"

মনীশ অনিলকে জনান্তিকে ডাকিয়া বলিল, "তোমার মতলব কি, অনি?"

হাসিয়া অনিল বলিল, "কিছু না। শুধু তোমাকে একটা গান গাইতে হবে।"

"কি গান?"

অনিল তেমনই প্রশান্তভাবে হাসিয়া বলিল, "চিরন্তনীর জয়!—যে গানটা আমরা তিন জনে অনেকবার গেয়েছি। সেইটি।"

মনীশের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে বুঝিল, অনিল এই গানটি রচনা করিয়াছিল। গানের মর্ম্ম প্রেম চিরন্তন। সে কখন কোন্ আধারে তাহার অভিব্যক্তি ফুটাইয়া তুলে মানুষ তাহা জানে না, বলিতে পারে না। বিদ্রোহ করিয়া উহাকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিলেও চিরন্তন সত্য একদিন তাহার জয় ঘোষণা করিবেই।

মনীশ বলিল, "বন্ধু, তোমাদের আদেশ শিরোধার্য্য।"

গান শেষ হইয়া গেলে অনিল বিকাশের হাত ধরিয়া সে ঘর ত্যাগ করিল।

তাহার মুখের উপর তখন শুধু তৃপ্তির একটা অনাবিল দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল কি?

শেষ

মাধবী

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

শুধু ভালোবাসিয়াছি; সেই প্রেম মোর
কুসুমের মতো শুভ্র; কৌমুদী-বিভোর
আকাশের মতো দীপ্ত; জাহ্নবীর সম
অন্তরের সুধামন্ত্রে সুপবিত্রতম।

যে যুগল নামে তব আত্মীয় স্বজন
তোমারে আসিছে ডাকি, কোরেছি বর্জ্জন
আমি তাহা ওগো সখি! বলিয়া 'মাধবী'
জানায়েছি মাধুরীর তুমি মূর্ত্ত ছবি।

যোগ্য নাম 'মাধবী' তোমার; মধু তব
দৃষ্টিতে, বাণীতে, হাস্যে; নিশিদিন দ্রব
পরাণ-পরাগ তব মৃদু মধুধারে,
মধু তব সারা অঙ্গে, মধু অঙ্গহারে।

নিমেষে সোহাগভরে মরুভূরে চুমি
ঢাকো তারে পত্রে পুষ্পে হে মাধবী তুমি
তোমার পুলক রসে প্রজাপতি ভুলে
মেলিয়া চিকণ পাখা কৃষ্ণচূড়া-ফুলে।

মরমের রাঙারাখী অনুরাগে দিয়া
তোমারে নিয়াছি আমি আপন করিয়া
সবুজ আঁচল তব ভরেছি কৌতুকে
চাঁপা, নাগকেশরেতে, অশোকে, কিংশুকে।

হৃদয়ের অর্ঘ লহ, মাধুরীর রাণী
তুমি যে বেসেছ ভালো, বহু ভাগ্য মানি
মন চুরি করা জেনো অপরাধ নয়,
যেথা তাহা মৃত্যুহীন শুধু বিনিময়।

ভারতে যাদব-বংশ

অধ্যাপক শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ

আজ মহাপুরুষ কৃষ্ণের একটি অদ্ভুত ঐতিহাসিক কীর্ত্তি,—যাদব-বংশকে জরাসন্ধের হাত হইতে রক্ষা করার জন্য আবালবৃদ্ধবনিতা সমগ্র বংশের বহু সহস্র লোককে মথুরা হইতে ছয় শত মাইল দূরবর্ত্তী সুরাষ্ট্রে লইয়া যাওয়া আমাদের আলোচ্য। কৃষ্ণ যাদববংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে যাদবগণের সমুদ্র অতিক্রম করিয়া ভারতে আগমন করিবার কথা আছে। এই জন্য আদৌ তাহারা আর্য্য জাতীয় ছিল কি না সেই বিষয়ে কোন কোন পণ্ডিত সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। আচার-ব্যবহারে যে তাহারা সাধারণ আর্য্যগণ হইতে অনেকটা ভিন্ন প্রকৃতির ছিল, মহাভারত, হরিবংশ ইত্যাদিতে তাহার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। তাহারা স্বভাবতঃই কিছু উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ছিল, এবং ইহাও দেখা যায় যে, সুরা ও রমণীতে তাহাদের আসক্তি কিছু অতিরিক্ত ছিল। যাহা হউক, পরবর্ত্তী কালে তাহারা ভারতীয় আর্য্যসমাজে সম্পূর্ণ মিশিয়া গিয়াছিল, এবং সুরাষ্ট্র হইতে আরম্ভ করিয়া বিন্ধ্য-পর্ব্বতের দুই ধারে, ভারতের সমগ্র পশ্চিম-উপকূল ব্যাপিয়া দক্ষিণে লঙ্কাদ্বীপ পর্য্যন্ত ও পূর্ব্বে মথুরা পর্য্যন্ত তাহারা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। হরিবংশে যাদবগণের বংশ-বিস্তার সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব আছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, অযোধ্যার সূর্য্যবংশে হর্য্যশ্ব নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি মধুপুরীর (মথুরা) রাজা মধুদৈত্যের (দ্রাবিড়বংশীয়?) কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া তিনি শ্বশুরবাড়ী আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্বশুর মধুদৈত্য তাঁহাকে সুরাষ্ট্র প্রদেশে স্থাপিত করিলেন এবং গিরিদুর্গ-সমন্বিত তাঁহার রাজ্য যে আমর্ত্ত নামে বিখ্যাত হইবে তাহাও বলিয়া দিলেন। হর্য্যশ্বের পুত্র যদু। যদু সমুদ্রোদরবাসী (সম্ভবতঃ আরব সাগরের সোম দ্বীপের রাজা) সোম রাজার পঞ্চ কন্যা বিবাহ করেন। যদুর পাঁচ পুত্র,—মুচুকুন্দ, পদ্মবর্ণ, মাধব, সারস ও হরিত। ইহাদের মধ্যে মাধব পিতৃরাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করেন। অন্য চারিজন দেশবিজয়ে বহির্গত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। মুচুকুন্দ বিন্ধ্য ও ঋক্ষবাণ পর্ব্বতের মধ্যে রাজ্য স্থাপন করিয়া নর্ম্মদাতীরে মাহিষ্মতীপুরীতে রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিলেন। পদ্মবর্ণ পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার মধ্যে বেণা নদীর তীরে করবীর নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন

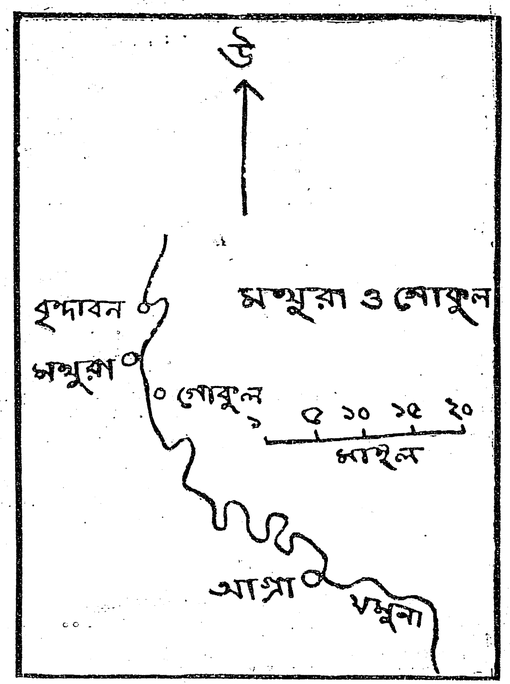

গোকুলের মানচিত্র

করিলেন। [এই স্থান বর্ত্তমান পর্ত্তুগীজ অধিকার গোয়া প্রদেশের সীমার অব্যবহিত দক্ষিণে অবস্থিত এবং বর্ত্তমানে কারোয়ার নামে পরিচিত, প্রায় সমুদ্রতীরবর্ত্তী বিখ্যাত স্থান।] সারস বনবাসী নামক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্রৌঞ্চপুরে রাজধানী স্থাপন করিলেন। "হরিত···বহুরত্নপূর্ণ সমুদ্রদ্বীপ পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজ্যের

মুদগর নামক বিখ্যাত ধীবরগণ সমুদ্রগর্ভে বিচরণ করতঃ শঙ্খসকল আহরণ করিত। অপর সাবধান ধীবরগণ রাশি রাশি জলসম্ভূত প্রবাল ও উজ্জ্বল মুক্তাসমূহ সংগ্রহ করিত।

সুরাষ্ট্রের মানচিত্র

নিষাদগণ ক্ষুদ্র নৌকাযোগে অন্বেষণ করতঃ জলজাত রত্নরাশি আহরণ করিয়া মহানৌকায় সংগ্রহ করিত।

জুনাগড়ে উপর কোট দুর্গ

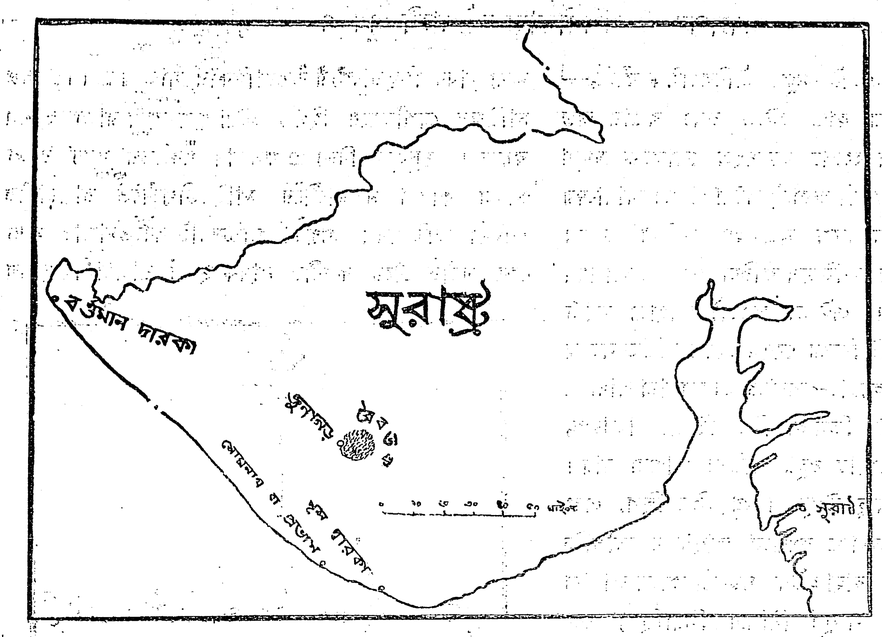

সেই রাজ্যের লোক সকল মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। সেই রত্নদ্বীপ নিবাসী মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকার রত্ন গ্রহণ করতঃ মহানৌকাযোগে দূরদেশে গমন করিয়া বাণিজ্যলব্ধ দ্রব্য দ্বারা ধনদসদৃশ একমাত্র হরিতেরই তৃপ্তিসাধন করিত।"

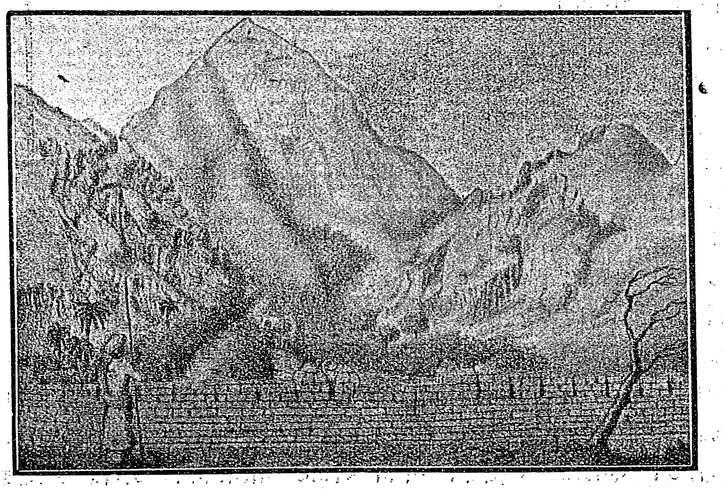

হরিবংশ। বঙ্গবাসী সংস্করণ, বঙ্গানুবাদ, ১৫৪ পৃঃ।

বনবাসীর কদম্ব রাজগণ পরবর্ত্তী কালে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন—উঁহা বর্ত্তমান কালের উত্তর কানাড়া প্রদেশ মাঙ্গালোর নামক বিখ্যাত সহর ইহার অন্তর্গত। রত্নদ্বীপ সিংহলেরই অপর নাম। হরিবংশের এই বিবরণ প্রাত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ দ্বারা সপ্রমাণ বা অপ্রমাণ করা কঠিন। যাদবগণের পশ্চিম ভারতে এই বিস্তৃতির অনুমানিক কাল খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতাব্দ। আর্য্য সভ্যতা অশোকের (খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দ) পূর্ব্বেই সিংহল পর্য্যন্ত প্রসৃত হইয়াছিল, এইমাত্র জোর করিয়া বলা যায়।

যদুর শ্বশুর সমুদ্রোদরবাসী নাগ যদুকে বর দিয়াছিলেন যে, তাঁহার সন্ততিগণ জলে-স্থলে সমান বিচরণশীল হইবে। যাদবগণের মহানৌকায় সমুদ্র যাত্রা দেখিয়া মনে হয়, তাঁহার সেই আশীর্ব্বাদ সার্থক হইয়াছিল। ভারত মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে এবং শ্যাম কাম্বোজ ইত্যাদি রাজ্যে খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই কি করিয়া ভারতীয় সভ্যতা প্রসৃত হইয়াছিল, যাদবগণের এই মহানৌকায় সমুদ্রে বিচরণ হইতে তাহা বুঝা যায়।

সুরাষ্ট্রে মাধব রাজা হইলেন। মাধবের ছেলে সাত্বত। সাত্বতের পুত্র ভীম। "রাজা ভীমের রাজত্বকালেই অযোধ্যায় রাম রাজ্যশাসন করিতেছিলেন।" সেই সময়েই সুমিত্রানন্দন শত্রুঘ্ন মধুপুরীতে মধুর পুত্র লবণকে যুদ্ধে নিহত করেন। লব ও কুশের সময় ভীম মধুপুরী বা মথুরা অধিকার করেন। ভীমের পরে অন্ধক রাজা হন। অন্ধকের পুত্র রেবত। তাঁহার নামানুসারে সুরাষ্ট্রের সুনামখ্যাত পর্ব্বত রৈবতক নাম ধারণ করে। রেবতের দুই পুত্র ঋক্ষ ও বিশ্বগর্ভ। ঋক্ষ সম্ভবতঃ সুরাষ্ট্রে রাজা হ'ন, বিশ্বগর্ভ মথুরায় প্রস্থান করেন। বিশ্বগর্ভের পুত্র বসু। বসুর পুত্র বসুদেব।

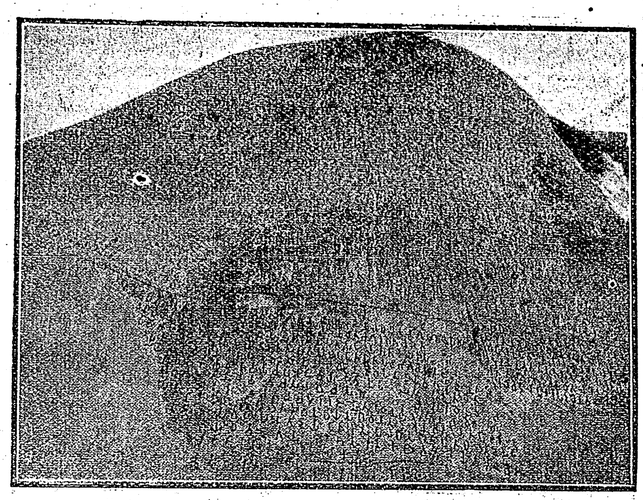

বসুদেবের ঘরে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম—কংস-বধ

মথুরায় তখন যাদবগণের আর এক শাখা ভোজ-বংশীয়গণ রাজত্ব করিতেছিল। ঐ বংশের শূরসেন বা উগ্রসেন যখন মথুরার রাজা, তখন উগ্রসেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবকের কন্যা দৈবকীর সহিত বসুদেবের বিবাহ হয়। বসুদেবের আর এক স্ত্রীর নাম রোহিণী। কিছু দিন পরে উগ্রসেনকে রাজাচ্যুত করিয়া উগ্রসেন-পুত্র কংস মথুরার সিংহাসন অধিকার করিলেন। কংস বসুদেবের গোষ্ঠীকে সুনজরে দেখিতেন না। নানা প্রকার গালগল্পের মধ্য হইতে সত্য বাহির করা বড় কঠিন। কংসের এই বাসুদেববংশ-ভীতির প্রকৃত কারণ কি, হরিবংশ পড়িয়া তাহা স্থির করা যায় না। যে আদিম মনোবৃত্তি হইতে মার্জ্জার বা ব্যাঘ্র তাহার নবজাত শাবক ভক্ষণ করিয়া ফেলে, যে মনোবৃত্তিবশে মিশরাধিপ অধীন ইহুদী-গণের নবজাত বালক মাত্রকেই নদীতে ফেলিয়া দিতে হইবে বলিয়া আদেশ দিয়াছিলেন, কংসের বসুদেববংশ-ভীতিও সেই মনোবৃত্তিরই বিকাশ বলিয়া মনে হয়।

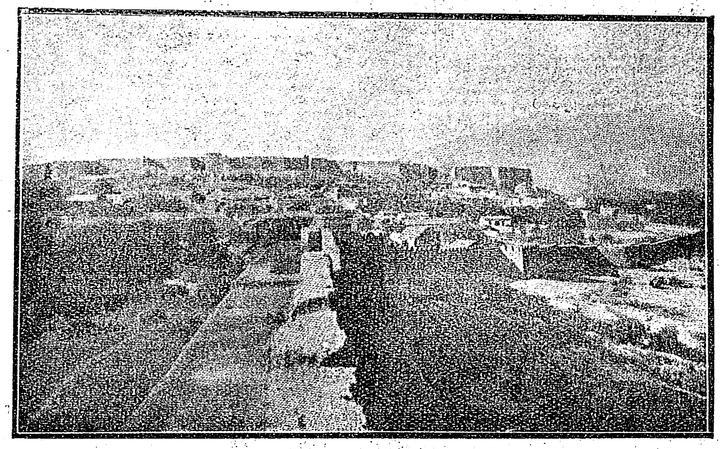

শিলালিপির টীলা

যাহা হউক, কংসের ভয়ে বসুদেব জ্যেষ্ঠপুত্র বলরাম সহ তাহার গর্ভধারিণী রোহিণীকে যমুনার পূর্ব্বপারে গোকুলে গোপ-পল্লীতে লুকাইয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

উপর কোট হইতে রৈবতকের দৃশ্য

কিছু কাল পরে দৈবকী-গর্ভে কৃষ্ণ জন্মিলে পর তাহাকেও আভীরগণের সর্দ্দার নন্দগোপের ঘরে লুকাইয়া রাখিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে হইয়াছিল।

গোকুলে কৃষ্ণ ও বলরাম বাড়িয়া উঠিল, ক্রমেই তাহারা অসাধারণ বলবীর্য্যের পরিচয় দিতে লাগিল। তাহাদের বলবীর্য্যের খ্যাতি যাইয়া মথুরা পর্য্যন্ত পৌঁছিলে, দুই পুত্রকে গোকুলে লুকাইয়া রাখার অপরাধে একদিন

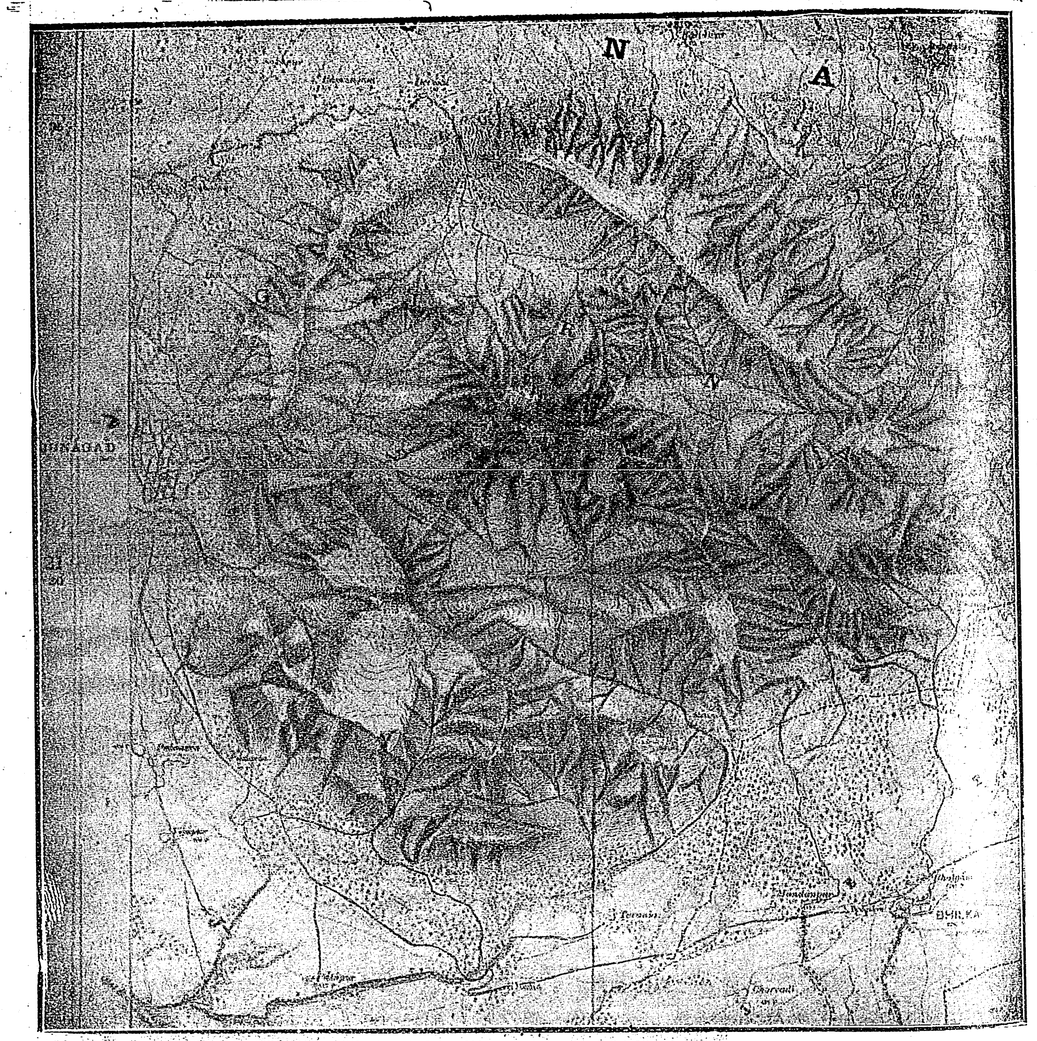

রৈবতকের মানচিত্র

কংস বসুদেবকে রাজসভামধ্যে খুব গালাগালি দিলেন,—যাদববৃদ্ধগণও কংসকে বেশ দুকথা শুনাইয়া দিলেন। ধনুর্যজ্ঞ উপলক্ষ্যে কৃষ্ণ ও বলরামকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিয়া কংস তাহাদিগকে মথুরায় আনিতে গোকুলে অক্রূর নামক যাদবকে পাঠাইয়া দিলেন। মহাবলশালী কিশোর কৃষ্ণ ও বলরাম মথুরায় যাইয়া মল্লগণকে পরাজিত ও নিহত করিলেন, অন্যায় যুদ্ধে কিশোরদ্বয়কে বধ করিতে আদেশ দিলে পর কংসও কৃষ্ণের হাতে নিহত হইলেন। কিশোর কৃষ্ণের পরামর্শে যাদবগণ কংসের পিতা উগ্রসেনকে রাজা করিলেন। উগ্রসেন কৃষ্ণ ও বলরামকে

অবন্তিতে শিক্ষার জন্য প্রেরণ করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দুই ভাই মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই প্রসঙ্গের পরে হরিবংশে বলরাম ও কৃষ্ণের বহু-রাষ্ট্র-ভ্রমণ-প্রসঙ্গ আছে। কংস প্রবল পরাক্রান্ত মগধ সম্রাট জরাসন্ধের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কংসের মৃত্যুর পরে সেই দুই বিধবা কন্যা অনবরত জরাসন্ধকে মথুরা আক্রমণ করিয়া কৃষ্ণ ও বলরামকে বধ করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। জরাসন্ধও অনেকবার মথুরা আক্রমণ করিয়া যাদবগণের পরাক্রমে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। রাম ও কৃষ্ণ দেখিলেন, তাহাদেরই জন্য বারবার মথুরা আক্রান্ত হইতেছে ও যাদবগণ বিপন্ন হইতেছে। দুই ভাই তখন মথুরা ছাড়িয়া দেশ ভ্রমণে বাহির হইলেন এবং দক্ষিণ দিকে চলিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বত পার হইয়া তথাকার এবং সহ্যাদ্রির নিকট ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থিত যাদবরাজ্যসমূহে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হরিবংশে আছে—মগধ সম্রাট জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে ধরিতে সসৈন্য পিছনে পিছনে ধাইয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান গোয়ার নিকটস্থ গোমন্ত নামক পর্ব্বতে কৃষ্ণ ও বলরাম আশ্রয় গ্রহণ করিলে চারি দিক হইতে ঐ পর্ব্বত ঘিরিয়া ফেলিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিয়াছিলেন। এই স্থানে রাম ও কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং জরাসন্ধ আবার বিফল-মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হ'ন। রাম এবং কৃষ্ণও কিছু দিন পরে মথুরায় ফিরিয়া যান। রাম ও কৃষ্ণের বহুরাষ্ট্রভ্রমণ এবং জরাসন্ধের সসৈন্য তাহাদের অনুসরণ ও গোমন্ত পর্ব্বতে তাহাদের সহিত যুদ্ধের উপাখ্যান হরিবংশে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়। বিস্তারিত আলোচনার স্থান ইহা নহে। মহাভারতের সভাপর্ব্বে (পরে দ্রষ্টব্য) সুরাষ্ট্রস্থিত রৈবতক পর্ব্বতেরই অপর নাম গোমন্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

যাদবগণের মথুরা হইতে অপযান

রাম ও কৃষ্ণ মথুরায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, জরাসন্ধ এবার কালযবন নামক এক দুর্দ্ধর্ষ যবন রাজার সহিত মিলিয়া দুই দিক হইতে মথুরা আক্রমণ করিয়া মথুরাকে একেবারে পিষিয়া ফেলিবার জোগাড় করিতেছেন। যাদবগণের এই বিপদ দেখিয়া দূরদর্শী রাজনৈতিক কৃষ্ণ যাদবগণকে মথুরা পরিত্যাগ করিয়া সুদূর যাদবরাজ্য সুরাষ্ট্রে প্রয়াণ করিবার পরামর্শ দিলেন। এই অপযানের কার্য্য ও কারণ সম্বন্ধে মহাভারত হইতে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানিতে পারি। বলা বাহুল্য মহাভারতের সাক্ষ্য এই বিষয়ে হরিবংশ হইতে গণ্যতর।

মহাভারত অনুসারে, কংসের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই জরাসন্ধ একবার মথুরা আক্রমণ করেন। হংস ও ডিম্বক

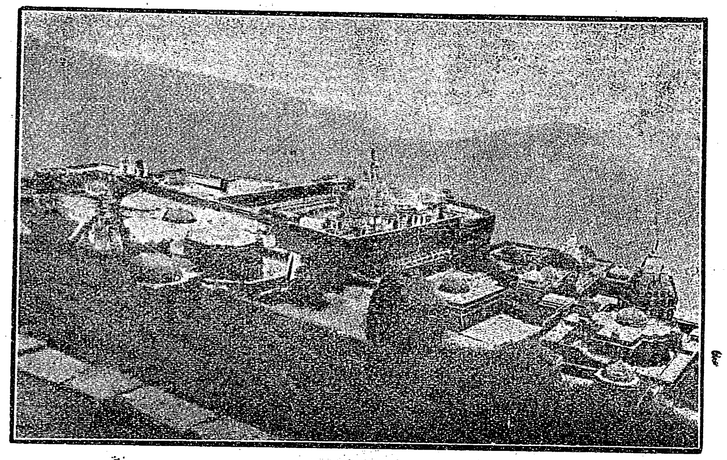

জৈন-মন্দির

নামক তাঁহার দুই সেনাপতির মৃত্যু হওয়ায় জরাসন্ধ সেইবারের মত ফিরিয়া গিয়াছিলেন। পরে কংসপত্নী নিজের বিধবা কন্যাগণের প্ররোচনায় জরাসন্ধ আবার মথুরা আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলেই যাদবগণ "বিমনা ও পলায়মান" হইল। ঐ জরাসন্ধের ভয়ে আমরা বিপুল ঐশ্বর্য্য পৃথক্ পৃথক বিভাগ দ্বারা সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়া পুত্র, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণের সহিত পলায়ন করি।.....তৎকালে আমরাও উহার ভয়ে মথুরা পরিত্যাগ করিয়া দ্বারবতী পুরীতে পলায়ন করিয়াছিলাম।" (বর্দ্ধমান রাজবাটীর মহাভারত সভাপর্ব্ব, চতুর্দ্দশ অধ্যায়। বঙ্গবাসী সংস্করণ, বঙ্গানুবাদ,

২২২ পৃষ্ঠা।) হরিবংশের জরাসন্ধ কর্ত্তৃক অষ্টাদশবার মথুরা আক্রমণ প্রসঙ্গ মহাভারতে নাই। জরাসন্ধ ও কালযবনের একযোগে মথুরা আক্রমণ প্রসঙ্গও মহাভারতে নাই।

যাদবগণের রাজধানী দ্বারবতীর অবস্থান নির্ণয়

সুরাষ্ট্রের মানচিত্রের সহিত সকলেই পরিচিত আছেন। মানচিত্রে দেখিবেন, বর্ত্তমান দ্বারবতী নগরী বা দ্বারকাপুরী

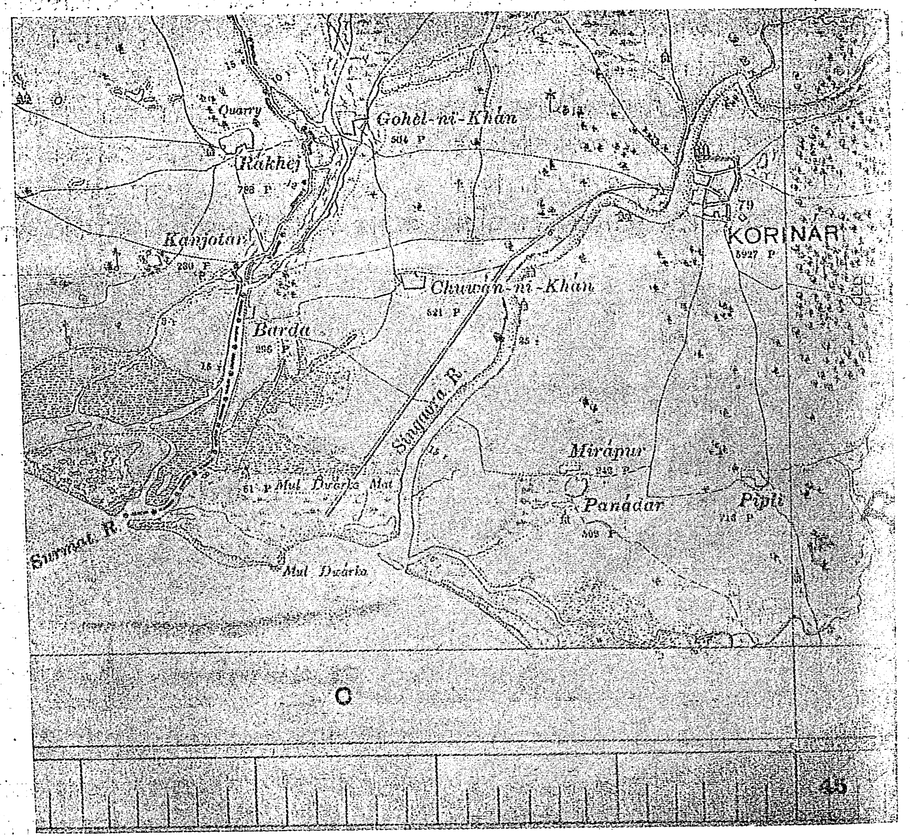

মূল দ্বারকার মানচিত্র

অতসী-কোরকাকৃতি সুরাষ্ট্রের একেবারে সূক্ষ্মাগ্র চঞ্চুপ্রদেশে অবস্থিত। এই স্থানেই দ্বারকাধীশ বা রণছোড়জির বিখ্যাত মন্দির ও মূর্ত্তি আছে। কিন্তু সুরাষ্ট্রের সকলেই জানে, কৃষ্ণের দ্বারবতী বা মূল দ্বারকা এই স্থানে ছিল না। মানচিত্রে আজিও মূল দ্বারকার অবস্থান প্রদর্শিত হইয়া থাকে। সঙ্গীয় মানচিত্র হইতেই বর্ত্তমান দ্বারকা ও মূল দ্বারকার অবস্থান দৃষ্ট হইবে। কিন্তু মহাভারত ও হরিবংশ মিলাইয়া পড়িয়া আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে আদি দ্বারবতী মূল দ্বারকায়ও অবস্থিত ছিল না। মূল দ্বারকা দ্বারবতী নগরীর দ্বিতীয় সংস্থান। আদি দ্বারকা কোথায় ছিল সেই বিষয়ে একটু আলোচনা করা যা'ক্।

মহাভারতের সভাপর্ব্ব চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের নিকট কৃষ্ণের আত্মবিবরণ বর্ণনায় আছে—"সকলে পশ্চিম দিকে প্রস্থান করিলাম। ঐ পশ্চিমাঞ্চলে রৈবতকে দ্বারা পরিশোভিতা কুলস্থলী নামে এক পরম রমণীয়া পুরীতে বাস করিলাম এবং তথাকার দুর্গ উত্তমরূপে সংস্কার করিলাম। ঐ দুর্গ দেবতাদিগেরও অগম্য, তথায় স্ত্রীগণও অনায়সে যুদ্ধ করিতে পারে, বৃষ্ণি-কুলোদ্ভব মহারথীদিগের

কথাই নাই। হে শত্রুঘাতিন্, এক্ষণে আমরা অকুতোভয়ে ঐ পুরীতে বাস করিতেছি। মাধবেরা ঐ গিরিবরের সংস্থানাদি পর্য্যালোচনা করিয়া এবং মগধেশ্বরের হস্ত হইতে উত্তীর্ণই হইয়াছি বিবেচনা করিয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপে জরাসন্ধের অনিষ্টাচরণে সর্ব্বতোভাবে উত্তাক্ত হওয়ায় আমরা সামর্থ্যযুক্ত হইয়াও প্রয়োজনবশতঃ আমরা গোমণ্ড পর্ব্বতে সমাশ্রিত হইয়াছি। ঐ পর্ব্বত তিন যোজন বিস্তীর্ণ। প্রতি যোজনের মধ্যে উহাতে একুশটি সৈন্যব্যূহরচিত এবং যোজনান্তে এক শত দ্বার নির্ম্মিত আছে। বীরদের বিক্রমই উহাতে তোরণ স্বরূপ হইয়াছে, এবং অষ্টাদশ বংশসম্ভূত যুদ্ধ দুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়গণ উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। হে রাজন্, আমাদের কুলে অষ্টাদশ সহস্র ভ্রাতা বর্ত্তমান আছে।"

মহাভারতের এই প্রসঙ্গটি হইতে বিবিধ প্রয়োজনীয় তথ্য অবগত হওয়া যায়। তাই এই অংশটুকু সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়াছি।

প্রথম দেখা যাউক মথুরা হইতে সুরাষ্ট্রে প্রয়াণকারী যাদবগণের মোট সংখ্যা কত ছিল।

মাঝারি আকারের একটা সহরের লোক-সংখ্যা সেই কালে ৬০।৭০ হাজারের উপরে ছিল বলিয়া সম্ভব মনে হয় না। তাহাদের মধ্যে ১০।২০ হাজার রহিয়া গিয়াছিল ধরিলে হাজার পঞ্চাশেক যাদব মথুরা পরিত্যাগ করিয়াছিল ধরিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এইটা নিতান্তই একটা মোটা রকমের আন্দাজ।

মহাভারতে কৃষ্ণ বলিতেছেন, যাদবগণ অষ্টাদশকুলে বিভক্ত এবং তাহাতে ১৮০০০ 'ভ্রাতা' বর্ত্তমান আছে। ভ্রাতা অর্থে যদি যুদ্ধক্ষম ব্যক্তি ধরা যায়, তবে হিসাবের একটা ভিত্তি পাওয়া যায়। সেই কালে যুদ্ধবিদ্যার জ্ঞানই ক্ষত্রিয়ের প্রধান গুণ বলিয়া বিবেচিত হইত এবং ১৪ বছর হইতে ৫০ বছর পর্য্যন্ত যোদ্ধারা সমরে লিপ্ত হইত বলিয়া ধরা যায়। বর্ত্তমান কালের লোক-গণনার অঙ্ক পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, হিন্দুসমাজে পুরুষের সংখ্যা ১৪ বছর পর্য্যন্ত মোট সংখ্যার তৃতীয়াংশ, ১৪ হইতে ৫০ বছর পর্য্যন্ত মোট সংখ্যার অর্দ্ধাংশ এবং বৃদ্ধ ষষ্ঠাংশ। কাজেই যাদবগণের মধ্যে পুরুষ প্রায় ১৮×২=৩৬০০০ ছিল এবং স্ত্রীগণও প্রায় সমান সংখ্যক ছিলেন ধরিলে উহাদের মোট সংখ্যা প্রায় ৭০০০০ ছিল ধরিতে হইবে। এই সত্তর হাজার লোকের মথুরা পরিত্যাগ করিয়া দুর্গম পথের উপর দিয়া চলিয়া প্রায় সাড়ে ছয় শত মাইল দূরবর্ত্তী রৈবতক পর্ব্বত পর্য্যন্ত যাইয়া বসতি স্থাপন করা ভারতের ইতিহাসে এক পরম আশ্চর্য্য ব্যাপার এবং যাদব-নায়ক মহাপুরুষ কৃষ্ণের এক অনন্যসাধারণ কীর্ত্তি।

দ্বিতীয়তঃ, যাদবগণ যে পুরীতে বাস স্থাপন করিয়াছিল, তাহার নাম কুশস্থলী অথবা দ্বারবতী। তথায় পূর্ব্ব হইতেই এক দুর্গ ছিল; যাদবগণ যাইয়া তাহা উত্তমরূপে সংস্কৃত করিয়া লইয়াছিল মাত্র। ঐ দুর্গ এত দুর্ভেদ্য ছিল যে স্ত্রীগণও তাহাতে অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে। ঐ দুর্গ ও পুরী রৈবত শৈল দ্বারা পরিশোভিত। এই রৈবত শৈল তিন যোজন বিস্তীর্ণ এবং উহার নানা স্থানে সৈন্য সমাবেশ দ্বারা উহা শত্রুর অধৃষ্য করা হইয়াছিল।

রৈবতক পর্ব্বতে যে সুরাষ্ট্র স্থিত, বর্ত্তমানে জুনাগড় রাজ্যের অন্তর্গত গির্ণার পাহাড়, তাহা সকলেই জানেন। এই পাহাড়ে অনেকগুলি শিখর আছে। ইহা আকারে প্রায় গোল এবং উত্তর দক্ষিণে অথবা পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় বার মাইল দীর্ঘ। কাজেই এ স্থানে চারি মাইলে এক যোজন ধরিতে হইবে। মনিয়র উইলিয়ম্স্এর সংস্কৃত অভিধানে যোজনের অন্যতম পরিমাণ চারি অথবা পাঁচ মাইল বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে দ্বারকা সমুদ্রতীরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। লক্ষ্য করা আবশ্যক যে দ্বারবতীর প্রথম উল্লেখে সমুদ্রের প্রসঙ্গ মাত্র নাই। অথচ মৌষল পর্ব্বে দেখা যায়, দ্বারবতী সমুদ্রতীরে প্রতিষ্ঠিত।

আদি দ্বারবতী যে রৈবতক পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী, এমন কি ঐ পর্ব্বতের উপরেই ছিল, হরিবংশে তাহারও প্রমাণ আছে। যাদবগণ মথুরা হইতে বাহির হইয়া পশ্চিম দিকে চলিতে চলিতে "সাগরানূপ শোভিত বিপুল দেশ দেখিতে পাইলেন।···তাহার অনতিদূরেই মন্দরের ন্যায় রমণীয় শিখরসমন্বিত রৈবতক পর্ব্বত সার্ব্বাঙ্গীন শোভা বিস্তার করিতেছে। সেই পর্ব্বতে···একলব্য বাস করিতেন··· এবং তদুপরি তাহার যে স্বায়ত অষ্টাপদ সদৃশী বিহার ভূমি নির্ম্মিতা হইয়াছিল তাহাই দ্বারবতী নামে প্রসিদ্ধ। কেশব সেই স্থানেই নগর স্থাপন করিতে অভিলাষী হইলেন এবং যাদবগণও তথা স নিবা করিতে চাহিলেন।···

এইরূপে সবান্ধব যাদবগণ দ্বারবতী পুরী প্রাপ্ত হইয়া দেবগণ যেরূপ সুরপুরে বাস করেন তদ্রূপ সুখে বাস করিতে লাগিলেন।"

হরিবংশ, ১১৩ অধ্যায়।

হরিবংশের ১১৫ অধ্যায়ে দ্বারবতীর একটি বর্ণনা আছে। উহাতে সমুদ্র-তীরবর্ত্তী দ্বারকা এবং রৈবতকের পশ্চিমস্থ দ্বারকার বর্ণনা মিশিয়া খিচুড়ী হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এই বর্ণনায়ও আছে যে দ্বারকার পূর্ব্ব দিকে—"মণি ও কঙ্কনময় তোরণ সমন্বিত এবং রমনীয় সানু গুহা চত্বর শোভিত লক্ষীবান্ রৈবতক শৈল শোভা পাইতেছে।" এই বর্ণনা সমুদ্রতীরস্থ মূল দ্বারকায় কখনও প্রযুক্ত হইতে পারে না।

আদি দ্বারবতী রৈবতক পর্ব্বতের খুব কাছে অথবা ঐ পর্ব্বতের উপরে থাকিবার আর একটি প্রমাণ মহাভারত হইতে উপস্থিত করিতেছি। এই স্থানে মনে রাখা আবশ্যক যে, দ্বারবতীর দ্বিতীয় সংস্থান-স্থল, যাহা বর্ত্তমানে মূল দ্বারকা বলিয়া পরিচিত, তাহা রৈবতক পর্ব্বত হইতে প্রায় ৫০ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রতীরে অবস্থিত।

দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়া পৈত্রিক রাজ্যার্দ্ধ লাভ করিয়া পাণ্ডবগণ খাণ্ডবপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিলে দ্রৌপদী সম্বন্ধে নিয়মভঙ্গ করার জন্য অর্জ্জুন বার বছরের জন্য দেশ ভ্রমণে বাহির হইলেন। গোটা ভারতবর্ষ ঘুরিয়া তিনি অবশেষে সুরাষ্ট্রের প্রভাস তীর্থে আগমন করিলেন। অর্জ্জুন প্রভাস তীর্থে আসিয়াছেন শুনিয়া কৃষ্ণ আসিয়া আদর করিয়া তাঁহাকে যাদব-রাজধানীতে লইয়া গলেন।

"অনন্তর তাহাঁরা দুইজনে প্রভাসে যথাভিলাষ বিহার করিয়া বাসের নিমিত্ত রৈবতক পর্ব্বতে গমন করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই কৃষ্ণের অনুজ্ঞানুসারে পরিচারকগণ সেই মহীধর মণ্ডিত করিয়া তথায় বিবিধ খাদ্যদ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। অর্জ্জুন বাসুদেবের সহিত তথায় ভোজনাদি করিয়া···শয্যায় নিদ্রাভিভূত হইলেন···বিভাবরী অবসানে ···উত্থিত হইলেন এবং যাদবগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া কাঞ্চনময় রথে দ্বারিকা গমন করিলেন।···(তথায়) কৃষ্ণের সহিত···রমণীয় ভবনে বহুদিবস বাস করিলেন।"

মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ২১৯ অধ্যায়।

প্রভাস হইতে মূল দ্বারকা ২২ মাইল সোজা পূবদিকে। প্রভাস অর্থাৎ সুলতান মামুদ লুণ্ঠিত সোমনাথও সমুদ্রতীরে, মূল দ্বারকাও সমুদ্রতীরে। আদি দ্বারবতী তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিলে তথায় যাইতে ৫০ মাইল উত্তরস্থিত রৈবতক হইয়া যাওয়ার কোন দরকার ছিল না। তর্কের স্থলে বলা যায়, রৈবতকের মত চমৎকার জায়গাটি দেখাইবার জন্য কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে প্রথম রৈবতকে লইয়া গিয়াছিলেন, পরে সমুদ্রতীরবর্ত্তী রাজধানীতে লইয়া যান। কিন্তু দ্বারবতী যে এই সময় সত্যই রৈবতকের নিকটবর্ত্তী ছিল, সুভদ্রাহরণের বিবরণে তাহা পরিষ্কার বুঝা যায়।

বর্ত্তমান কালে ফাল্গুন মাসে রৈবতক-যাত্রা-উৎসব উপস্থিত হইয়া থাকে। এই প্রথা অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে বলিয়া বোধ হয়। রৈবতক পর্ব্বত সম্বন্ধীয় উৎসবেই অর্জ্জুন প্রথম সুভদ্রার দর্শন লাভ করেন। শত শত যাদব কেহ বা যানে কেহ বা পদব্রজে রৈবতকে যাইতেছিল, কৃষ্ণার্জ্জুনও যাইতেছিলেন। রৈবতকে সখী-পরিবৃতা সুভদ্রাকে দেখিয়া অর্জ্জুন মোহিত হ'ন এবং কৃষ্ণের পরামর্শ এবং ক্ষত্রিয় আচার অনুসারে তাহাকে হরণ করিয়া বিবাহ করিতে মনস্থ করেন। যুধিষ্ঠিরের নিকট অনুমতি চাহিয়া দূত পাঠান হইল। দূত যুধিষ্ঠিরের সম্মতি লইয়া ফিরিয়া আসিলে একদা যখন সুভদ্রা রৈবতককে অর্চ্চনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া দ্বারকায় ফিরিয়া চলিয়াছেন, তখন অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া রথে তুলিলেন এবং "স্বীয় নগরাভিমুখে" গমন করিতে লাগিলেন—অর্থাৎ খাণ্ডবপ্রস্থে রওনা হইলেন। সুভদ্রার রক্ষী সৈন্যেরা অমনি দ্বারকায় দৌড়িয়া গিয়া সুভদ্রাহরণ বৃত্তান্ত যাদবগণের গোচর করিল। তৎক্ষণাৎ রণভেরী (Alarm signal) নিনাদিত হইল। যাদবগণ সমবেত হইয়া অর্জ্জুনকে শাস্তি দিবার পরামর্শ আঁটিতে লাগিলেন। অবশেষে কৃষ্ণের যুক্তি-যুক্ত বাক্য শুনিয়া নিরুত্ত হইলেন এবং অর্জ্জুনকে সাদরে ফিরাইয়া আনিয়া তাঁহারা সুভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ দিলেন। দ্বারকা রৈবতকের নিকটবর্ত্তী না হইয়া ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত হইলে রক্ষীগণ এত শীঘ্র সুভদ্রাহরণ বৃত্তান্ত যাদবগণের নিকট পৌছাইতে পারিত না। বর্ণনা পড়িয়া এমনও বোধ হয় না যে, উৎসব শেষ করিয়া যাদবগণ সমুদ্র-তীরবর্ত্তী মূল দ্বারকায় ফিরিয়া গিয়াছিল; কেবল সুভদ্রাই পিছনে পড়িয়াছিল, এবং মূল দ্বারকায় পৌছিবার অল্প

বাকী থাকিতে রাস্তা হইতে সুভদ্রাকে হরণ করিয়া অর্জ্জুন লইয়া পড়িতেছিলেন।

কৃষ্ণের আদি দ্বারকার অবস্থান নির্ণয়ের জন্য রৈবতক পর্ব্বত ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানগুলির ভৌগোলিক সংস্থান পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। রৈবতক পর্ব্বত বর্ত্তমানে সুরাষ্ট্রের করদরাজ্য জুনাগড়ের অন্তর্গত। রাজধানীর নাম জুনাগড়; তাহা হইতেই রাজ্যেরও নাম হইয়াছে। জুনাগড়ের চারি দিকে পাথরের দেওয়াল আছে, সঙ্গীয় মানচিত্রের মধ্যে তাহার নক্সা দৃষ্ট হইবে। এই দেওয়ালের অভ্যন্তরে সহরটি উত্তর-দক্ষিণে দেড় মাইল এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে এক মাইল বিস্তৃত। সহরের পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগ বর্ত্তমানে একরকম খালিই পড়িয়া আছে—লোক-বসতি নাই। সহরের পূর্ব্বভাগ সহরের অন্যান্য ভাগ হইতে অনেক উচ্চ,—এইখানেই একটি পাহাড়ের মাথা সমতল করিয়া জুনাগড়ের দুর্গ প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত পক্ষে এই দুর্গেরই নাম জুনাগড়, উহার চারিদিকের সহর পরবর্ত্তী কালে গড়িয়া উঠিয়াছে। সহরের প্রকৃত নাম মুস্তাফাবাদ, কিন্তু ঐ নাম পরিচিত নহে, সমস্তটা জড়াইয়া জুনাগড়ই বলা হয়—এবং দুর্গকে উপরকোট নামে অভিহিত করা হয়।

উপর কোটের দ্বার মাত্র একটি, গড়ের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এই উপর কোট দুর্গের দুর্ভেদ্যতা সম্বন্ধে অনেকেই সবিস্ময় মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে লেফটেন্যাণ্ট পোষ্টান্স জুনাগড় দেখিয়া নিম্ন লিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—

"The old citadel is built upon an elevation of the limestone, which appears to cap over the granite at the base of the hills; and on which the city of Junagarh is situated···The Uparkot is a noble specimen of eastern fortification, its walls being unusually high, with immense bastions. The materials for these have been taken from a wide and deep ditch, which has been scarped all round it. There is only one gate-way and narrow entrance from the westward····· J. A. S. B. 1838. P. 874.

কাপ্তেনউইল্‌বারফোরস-বেল্ প্রণীত History of Kathiawad হইতে উদ্ধৃত করিতেছি,—

".....The fort at Janagadh, now known as the "Uparkot." This fort lies on a most commanding position in the town of Junagadh, and about one and a half miles west of the holy Girnar Hill. Its massive walls and strong defences must have made it a very formidable stronghold to attack before the days of artillery·····From its walls, the whole country round could be seen and in course of time, the town of Junagadh came to be built round it, which in its turn was surrounded by a strongly fortified wall, thus making the citadel doubly secure:" P. 55:

জুনাগড়ের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কাপ্তেন সাহেব নিম্নলিখিত তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"Ra Mulraj···died in A. D. 915. and was followed by his son Vishwarah···The next Raj of Wamansthali Graharipu built the fort at Junagadh, now known as the Uparkot.····· The word Junagadh means "the Old Fort" and the story of how it got the name is somewhat quaint. It relates that between the Girnar Hill and Wamansthali, * there was formerly thick jungle, through which no one could penetrate. After several Raj of Wamansthali had ruled, a wood-cutter one day managed to cut his way through the forest and came to a place, where stone-walls and a gate existed. Near by sat a holy man in contemplation, and on being asked by the wood-cutter the name of the place and its history replied that its name was "Juna"—old. The wood-cutter returned by the way he had come, to Wamansthali and reported his discovery to the Raj who ordered the forest to be cleared away. This being done, the fort came into sight. But there was none who knew its history or who could tell more than the holy man had told the wood-cutter. So the fort became known as Junagadh···

History of Kathiawad—by Captain Wilberforce-bell, P. 55—56.

* Modern Wanthale eight miles S. W. W. of Junagadh.

এই বিবরণ হইতে পরিষ্কারই বুঝা যায় যে, রায় গ্রহরিপু গহন বন মধ্যে একটি প্রাচীন দুর্গের অবস্থান অবগত হইয়া জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া তাহা ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইয়াছিলেন। ভীমকান্তি রৈবতক পর্ব্বতের সানুদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া অনতি-উচ্চ দুইটি পাহাড় প্রায় সমান্তরাল ভাবে পশ্চিম দিকে প্রসৃত হইয়া আছে—এই দুই পাহাড়ের ব্যবধান স্থানে স্থানে ৪০ গজ মাত্র। এই ব্যবধানের নিম্নতম স্থান দিয়া একটি পার্ব্বত্য স্রোতস্বতী প্রবাহিত—রৈবতক হইতে নামিয়া রৈবতক হইতে প্রসৃত সমস্ত ঝরণার জলে পুষ্ট হইয়া তাহা জুনাগড়ের দেওয়ালের নিম্ন দিয়া পশ্চিম দিকে বহিয়া গিয়াছে। রৈবতকে যাইবার একমাত্র চল্‌তি পথ ঐ দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়া এই পার্ব্বত্য স্রোতস্বতীর পার দিয়া নির্ম্মিত। জুনাগড় দুর্গ এই পথেরই মুখে দুই পাহাড়ের ব্যবধান রুদ্ধ করিয়া নির্ম্মিত। দুর্গের পূর্ব্ব দেওয়াল হইতে অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বে রৈবতকে যাইবার রাস্তার পারে সেই বিখ্যাত টীলা, যাহার উপরে সম্রাট অশোকের (খ্রীঃ পূঃ ২৫০) চতুর্দ্দশটি অনুশাসন খোদিত রহিয়াছে। এই টীলারই অপর পার্শ্বে রৈবতক পর্ব্বত হইতে প্রসৃত নদীগুলিকে বাঁধ দিয়া আট্‌কাইয়া রৈবতকের পাদদেশে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য কর্ত্তৃক সুদর্শন হ্রদ নির্ম্মাণের কাহিনী (৩০০ খ্রীঃ পূঃ) এবং শকক্ষত্রপ রুদ্রদাসের সুদর্শন হ্রদ পুনর্ন্নির্ম্মাণ-কাহিনী খোদিত (১৫০ খ্রীঃ) এবং আর একটি পার্শ্বে সম্রাট স্কন্দগুপ্ত কর্ত্তৃক (৪৫৬ খ্রীঃ) ঝটিকা বিধ্বস্ত সুদর্শনের পুনর্ন্নির্ম্মাণ-কাহিনী খোদিত রহিয়াছে। এই প্রাচীন লিপি সমূহের সান্নিধ্য হইতেই জুনাগড় দুর্গের বয়স অনুমান করা যায়। জুনাগড় সহর ও দুর্গ যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই বর্ত্তমান আছে, তাহার কতকগুলি ভাল প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি।

১। চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্ সঙ্ ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে অথবা তন্নিকটবর্ত্তী কোন বৎসরে এই অঞ্চলে আগমন করেন। সুরাষ্ট্র বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—

"রাজধানীর অনতিদূরে উজ্জয়ন্ত নামে এক পর্ব্বত আছে। উহার শিখরে একটি সঙ্ঘারাম অবস্থিত। গোঁফা এবং মঞ্চগুলি বহুশঃ পাহাড়ের গা খুঁদিয়া বাহির করা হইয়াছে। গভীর জঙ্গল ও বড় বড় গাছে পাহাড়টি ঢাকা; পাহাড়ের চারিদিকে অনেকগুলি ছোট ছোট নদী বহিয়া যাইতেছে। সাধু সন্ন্যাসীগণ এই পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়ায় ও বিশ্রাম করে এবং তপোবল সম্পন্ন ঋষিগণও এই স্থানে একত্রিত হয় ও বাস করে।"

B·al. Vol II. P 269.

উজ্জয়ন্ত বা উর্জয়ৎ রৈবতক পর্ব্বতেরই আর একটি নাম। কাজেই ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে জুনাগড়ে যে সুরাষ্ট্রের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল, এই বিষয়ে কোন সন্দেহই উঠিতে পারে না।

২। জুনাগড়ের অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বস্থিত পূর্ব্বোক্ত স্কন্দগুপ্তের শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, স্কন্দগুপ্ত পর্ণদত্তকে সুরাষ্ট্র শাসনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং পর্ণদত্ত নিজের পুত্র চক্রপালিতকে এই নগর রক্ষণ ও শাসনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সময় ভয়ঙ্কর ঝড়ে সুদর্শন হ্রদের বাঁধ ভাঙ্গিয়া হ্রদটি জলশূন্য হইয়া পড়িলে চক্রপালিত বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে আবার বাঁধটি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কাজেই ৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দেও এই সহর ছিল।

৩। ঐ স্থানেরই শকক্ষত্রপ রুদ্রদাসের শিলালিপিতে এই নগরস্থ গিরিনগর বলিয়া উল্লিখিত আছে বলিয়া বোধ হয়, যদিও লিপিটির কতক স্থান নষ্ট হইয়া যাওয়াতে পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত কাজেই সার্থকনামা গিরিনগরের কথাই হইতেছে না উজ্জয়ন্ত (রৈবতক) পাহাড়ের সন্নিকটে প্রতিষ্ঠিত কোন নগরের কথা হইতেছে, তাহা ভাল বুঝা যায় না। পাহাড়ের বর্ত্তমান নাম গির্ণার (গিরিনগর) দেখিয়া মনে হয়, পাহাড়ের এক মাথায়, যেখানে বর্ত্তমানে জৈন মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠিত, ঐ স্থানে যে নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহারই নাম সম্ভবতঃ ছিল গিরিনগর। জুনাগড়ের প্রাচীন নাম কি ছিল তাহা হইলে তাহা আমরা আজিও জানিতে পারি নাই।* যে স্থানে জৈন মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে তাহার বর্ণনা পরে প্রদত্ত হইবে। উহাও চারিদিকে পাথরের দেওয়াল দ্বারা দুর্গের মত সুরক্ষিত; তবে আয়তনে উহা সঙ্কীর্ণ, নগর নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহে। উহার পরিমাণ দৈর্ঘ্যে অর্দ্ধমাইল এবং প্রস্থে সিকি মাইল মাত্র। এই আয়তনের উপর ছোট একটি সহর যে প্রতিষ্ঠিত

* কোন পণ্ডিত বলেন যবনগড়, কেহ বা বলেন জীর্ণগড়, কিন্তু কেহই প্রমাণ দেন নাই।

না হইতে পারে তাহা নহে এবং সঙ্কটকালে তাহাতে আশ্রয় লওয়াও অসম্ভব নয়।

উপরকোটে রুদ্রদাসের পিতা জয়দাসের একটি শিলালিপিও পাওয়া গিয়াছে।

৪। রুদ্রদাসের এই লিপিতেই উল্লেখ আছে যে, যে সুদর্শন হ্রদের বাঁধ রুদ্রদাসের আমলে ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে মেরামত হইয়াছিল (এবং ৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দে স্কন্দগুপ্তের আমলে ফিরিয়া যাহার মেরামত হইয়াছিল,) তাহা প্রায় ৩০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের আমলে, বাঁধ দিয়া নদী আট্‌কাইয়া, প্রথম নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং অশোক মৌর্য্যের আমলে (২৫০ খ্রীঃ পূঃ, প্রায়) প্রণালী ইত্যাদি খুলিয়া বাঁধটির দৃঢ়তা সাধিত হইয়াছিল। অশোক এবং চন্দ্রগুপ্তের রাজস্থানীয়গণ নিকটবর্ত্তী অধিষ্ঠান অর্থাৎ সহরে বাস করিতেন, লিপির ভাবে তাহাই বুঝা যায়। কাজেই জুনাগড়ের বয়স খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩০০ পর্য্যন্ত পাইতেছি।

এখন যদি আমরা মহাভারত ও হরিবংশে দ্বারবতীর বর্ণনা স্মরণ করি এবং ঐ বর্ণনায় দ্বারবতী ও রৈবতক পর্ব্বতের পরস্পরের নৈকট্য স্মরণ করি, তবে সন্দেহ মাত্র থাকে না যে, বর্ত্তমান জুনাগড়ই কৃষ্ণের আদি দ্বারবতী। হরিবংশের একটি বর্ণনায় এমনও বোধ হয় যে পাহাড়ের উপর ½×⅛ মাইল স্থান ব্যাপিয়া যে পাথরের-দেওয়াল-ঘেরা সহর প্রতিষ্ঠার স্থান আছে—তাহাই আদিতম দ্বারবতী। এক-দ্বার-বিশিষ্ট উপরকোট দুর্গে তৎপর দ্বারবতী স্থাপিত হয় এবং এই দুর্গও যাদবগণ তৈয়ার করে নাই,—তৈয়ারী অবস্থায়ই পাইয়াছিল, মেরামত করিয়া লইয়াছিল মাত্র। রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষ্যে ভীম, অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ কর্ত্তৃক জরাসন্ধ নিহত হইলে জরাসন্ধের ভয় যখন আর রহিল না, তখনই সমুদ্রতীরবর্ত্তী দ্বারবর্ত্তী নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই জন্যই হরিবংশে দুই দুইবার করিয়া দ্বারবতী নির্ম্মাণ প্রসঙ্গ আছে—যদিও দুই বারই সমুদ্র-তীরবর্ত্তী দ্বারবতী নির্ম্মাণের প্রসঙ্গই দেখা যায়। পণ্ডিত-গণের নিকট যদি আমাদের যুক্তি গ্রাহ্য হয়, তবে খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দ ৩০০ হইতে জুনাগড়ের বয়স প্রায় খ্রীঃ পূঃ ২০০তে এমন কি তাহারও আগে চলিয়া গেল। চারি শতাব্দী কাল মুসলমান শাসনে আসিয়া উহার প্রাচীনত্বের প্রমাণ অধিকাংশই প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে,—উপরিউক্ত জয়দাসের লিপি এবং নিকটবর্ত্তী অশোক, রুদ্রদাস ও স্কন্দগুপ্তের লিপি ভিন্ন আর কোন প্রাচীনত্ব প্রমাণই আজকাল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

উপরকোট ও রৈবতকের সংস্থান পর্য্যালোচনা করিলে কৃষ্ণের সদম্ভোক্তির অর্থ বুঝা যায়, যে, কেমন করিয়া দ্বারবতী দুর্গ দেবতাদেরও অগম্য এবং তথায় কিরূপে স্ত্রীগণও অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে। উপরকোটের দুর্ভেদ্যতার বিষয়ে আধুনিক বোদ্ধাগণের মন্তব্য পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। ইতিহাসে দেখা যায় পরবর্ত্তী কালের রাজাদের মধ্যে কেহ কেহ উপরকোটও রক্ষা অসম্ভব দেখিলে গির্ণার পাহাড়ের উপর, যে দুর্গমধ্যে অধুনা জৈন মন্দির প্রতিষ্ঠিত, সেই দুর্গে পলাইয়া যাইতেন। এই দ্বিতীয় দুর্গ যে 'দেবতাগণেরও অগম্য' সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই। * খাড়া পাহাড়ের মাথায় এই দুর্গ প্রতিষ্ঠিত এবং সমুদ্রতল হইতে এই দুর্গ স্থান ২৮৩৮ ফিট উচ্চ। মাত্র পাঁচফুট প্রশস্ত অতি দুর্গম রাস্তা দিয়া এই স্থানে পৌঁছিতে হয়। ঐ রাস্তায় দুখানা পাথর গড়াইয়া দিলে শত-শত লোককে ঠেকাইয়া রাখা যায়। কিছু উপরে অতি চমৎকার জলের অফুরন্ত উৎস আছে, এবং আরও উপরেও আরও আশ্রয়-স্থান আছে। সর্ব্বোচ্চ শিখরেও একটি মন্দির আছে। এই স্থানের উচ্চতা ৩৬৬৬ ফুট।

পুণ্যতীর্থ রৈবতক

ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন তীর্থগুলি প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অজস্রতায় নিরীশ্বরবাদীর নিকটও অথবা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণের নিকটও এই সকল স্থান তীর্থ বলিয়া স্বীকৃত হইবে সন্দেহ নাই। ভারতের অতি অল্প তীর্থ-স্থানই এ পর্য্যন্ত দেখিতে সমর্থ হইয়াছি; কিন্তু ব্রহ্মপুত্রদ্বার বিধৌতপাদ, চারি দিকে অনন্ত গিরিমালার মধ্যে অবস্থিত, কামাখ্যা শৈলে যে দেবতা বিরাজ করেন, স্বচক্ষে দেখিয়া আমি তাহার সাক্ষ্য দিতেছি। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের শিখরে উঠিয়া পাদমূলে

* "The Uparkot has been many times besieged and often taken, on which occasions, the Raja was wont to flee to the fort on Girnar, which from its inaccessibility was almost impregnable.

Imperial Gazetteer. Ed. 1886 "Junagarh."

বিস্তীর্ণ স্তব্ধ বঙ্গোপসাগরের অপার বারিধি বক্ষে অস্ত-গমনোন্মুখ সূর্য্যের অপূর্ব্ব লীলা দেখিয়া সত্যই মনে হয়, কলিযুগে দেবতা চন্দ্রশেখরেই বাস করেন। আর সকল কক্সবাজারের অনতিদূরে সমুদ্রগর্ভে আদিনাথ পাহাড়ে অনাদিকাল হইতে জগতের নাথ বাস করিতেছেন, একবার দেখিলেই সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। রৈবতক যে কেমন সুন্দর স্থান, ইহার অব-স্থিতি-স্থান যে কেমন মনোহর, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মনে হয় কৃষ্ণ যেন উহারই শিখরে বসিয়া, অবিশ্রাম বাঁশী বাজাইয়া বিশ্ববাসীকে অহরহ আকর্ষণ করিতেছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রৈবতকের সানুদেশ হইতে দুইটি পাহাড় নামিয়া আসিয়া প্রায় জুনাগড়ের দেওয়ালে ঠেকিয়াছে, ঐ দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়াই রৈবতক যাত্রার পথ। উপরকোট হইতে এই দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়া রৈবতকের যে ভীমকান্ত মূর্ত্তি নয়নগোচর হয় তাহার সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না।

জুনাগড়ের পূর্ব্ব তোরণ হইতে বহির্গত হইয়া অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইলেই হাতের দক্ষিণে রাস্তা হইতে কয়েক গজ মাত্র দূরে বিখ্যাত শিলালিপির ক্ষুদ্র টীলাটি নয়নগোচর হয়। টীলাটি আকৃতিতে একটি বৃহদাকার পাশার গুটির মত। উঁচু মাত্র ৮ হাত, গোড়ার বেড় ৫০ হাত। অশোকের শিলালিপি ইহার সমস্ত পূর্ব্ব ধারটা অধিকার করিয়া আছে। পশ্চিম ধারে রুদ্রদাসের লিপি এবং উত্তর ধারে স্কন্দগুপ্তের লিপি। এই শিলালিপি টীলার নিকট হইতেই রৈবতকে যাইবার একটি বাঁধা রাস্তা আরম্ভ হইয়াছে। এই বাঁধা রাস্তা দুই পাহাড়ের মধ্যের নালার পার দিয়া অগ্রসর হইয়া একটি চমৎকার পাথরের পুলের উপর দিয়া নালা পার হইয়াছে। নালার পাশ সাধারণতঃ ৫০ গজ; কিন্তু যেখানে পুল সেখানে নালা ৪০ গজের বেশী প্রশস্ত হইবে না। শিলালিপি হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল অগ্রসর হইয়া কয়েকটি মন্দির এবং দামোদরকুন্ড নামে খ্যাত এক সরোবর পাওয়া যায়। এই স্থানে বাঁধা রাস্তা শেষ হইয়াছে। অতঃপর ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়া রাস্তা গিয়াছে। আরও অর্দ্ধ মাইল গেলে রৈবতক পর্ব্বতের পাদদেশে উপনীত হওয়া যায়। এই স্থান হইতে পদব্রজে অথবা ডুলিতে চড়িয়া রৈবতকে আরোহণ করিতে হয়। শিখর পর্য্যন্ত দূরত্ব ৪৬৯১ ফিট। মাইলখানিক আরোহণ করিলে একটি বিশ্রাম-স্থান পাওয়া যায়। এই স্থানে ধর্ম্মশালা আছে। এই পর্য্যন্ত পাহাড় জঙ্গলময় এবং চারি দিকের পাহাড়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। ইহার পরেই খাড়া শিখর উঠিয়াছে—এবং উহার গায়ে বৃক্ষলতা কিছু নাই বলিলেই হয়। উত্তরে প্রকাণ্ড একটি প্রস্তরখণ্ড স্তম্ভের মত আল্গা হইয়া খাড়া দাঁড়াইয়াছে—মনে হয় যেন একটু ধাক্কা দিলেই ভীমনাদে ধরাশায়ী হইবে। এই স্তম্ভকে ভৈরবঝম্ফ বলে, অনেকে ইহার মাথা হইতে লম্ফ দিয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করে। ধর্ম্মশালা হইতে মাত্র পাঁচফুট প্রশস্ত রাস্তা খাড়া পাহাড়ের গা বাহিয়া নানা কৌশলে ঘুরিয়া ফিরিয়া জৈন মন্দিরগুলিতে যাইয়া পৌঁছিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমুদ্র হইতে ২৮৩৯ ফিট উচ্চে পাহাড়ের ক্রোড়ে প্রায় ½ × ¼ মাইল পরিমাণ সমতল ভূমির উপর এই মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠিত। স্থানটি দুর্গের মত চারি দিকে পাথরের দেওয়ালে ঘেরা। এই ঘেরের মধ্যে জৈনদের আটটি চত্বর-সমন্বিত মন্দির আছে। জৈনগণ বলেন তাঁহাদের দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর অরিষ্টনেমি কৃষ্ণের জ্ঞাতি-ভ্রাতা ছিলেন। অরিষ্টনেমি স্থানীয় রাজবংশের যুবক ছিলেন। তাঁহার বিবাহ-উৎসব উপলক্ষে খাদ্যার্থে হননের জন্য সংগৃহীত পশু পাখীর কাতর চীৎকারে তিনি এত বিচলিত হইলেন যে, বিবাহ না করিয়াই তিনি পলাইয়া রৈবতক পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন এবং তথায়ই তপস্যা করিয়া তীর্থঙ্করত্ব লাভ করিয়া দেহরক্ষা করিলেন। তদবধি ইহা জৈনতীর্থ। জৈন মন্দিরগুলি কিন্তু কোনটিই ৭।৮০০ বৎসরের বেশী পুরাতন নহে। ইহাদের মধ্যে নেমিনাথের মন্দিরই বৃহত্তম। মন্দিরচত্বর আয়তনে ১৯৫ × ১৬০ ফিট। হিউএন্ সঙ্ এর বর্ণনা মত দেখা যায় খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে এই পর্ব্বতশিখরে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল।

জৈন মন্দিরগুলি হইতে রৈবতক-শিখর পর্য্যন্ত আরোহণ বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে—আগাগোড়াই সিঁড়ি আছে। রাস্তার দুই ধারে ছোট বড় অনেকগুলি মন্দির আছে। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় বস্তু গোমুখী নামক চমৎকার ঝরণাটি,—উহা হইতে অবিশ্রাম অতি নির্ম্মল জল উচ্ছ্বিত হইতেছে। গোমুখার নিকটেও ছোট ছোট কয়েকটি মন্দির আছে।

আরও কিছু উঠিলেই রৈবতকের শিখরদেশে উপনীত হওয়া যায়। এই স্থানে অম্বা মা নাম্নী দেবীর মন্দির আছে। রৈবতক পর্ব্বতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ইহাই একমাত্র মন্দির। এই স্থানে সমতলভূমির পরিমাণ ১৫ গজ × ১৫ গজের বেশী নহে। অম্বা মার মন্দিরপ্রাঙ্গণে বসিয়া চারি দিকের যে দৃশ্য দেখা যায়, তাহা আজীবন মনে থাকে; এবং পরবর্ত্তী কালে যখনি মানস নয়নে ভাসিয়া উঠে, তখনই অনাবিল আনন্দের কারণ হয়। ডাঃ উইলসন ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গির্ণার পাহাড়ে (রৈবতকের বর্ত্তমান নাম) উঠিয়াছিলেন এবং জৈন ও বৌদ্ধ মন্দিরগুলি দেখিতে গিয়া তথায় সমবেত জনসঙ্ঘের নিকট পুতুল পূজার নিরর্থকতা ও খ্রীষ্টধর্ম্মের সেবায় অনন্ত জীবন লাভের বিষয় বক্তৃতা না দিয়া পারেন নাই। গির্ণার পাহাড়ের শিখরে উঠিয়া সেই পাদ্রি উইল্সন্ই লিখিয়াছেন—

"গির্ণার শিখর হইতে চারি দিকের যে দৃশ্য দেখা যায়, উঠিবার দারুণ পরিশ্রম তাহার যথেষ্ট মূল্য নহে। চারি দিকে সারি সারি পাহাড়, নিকটবর্ত্তী ধাতর নামক শিখর যাহা প্রায় গির্ণারেরই সমান উচ্চ, চারি দিকে বিপুলা ধরিত্রীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের বিকাশ, পশ্চিমে মহাসমুদ্রের অনন্ত বিস্তার!" J. A. S. B, 1838, P. 335.

অম্বা মার মন্দির হইতে দক্ষিণে চাহিলে দুইটি অদ্ভুত পর্ব্বতশিখর দৃষ্টিগোচর হয়। সম্পূর্ণ পৃথক তলদেশ হইতে দীর্ঘাকৃতি পিরামিডের মত উহারা উপর দিকে উঠিয়া গিয়াছে। উহাদের সূক্ষ্মাগ্র শিখরগুলি গ্রেনাইট পাথরের এবং তাহাদের গায়ে বৃক্ষলতাদি মাত্রই নাই। গির্ণার ও উহাদের মধ্যে একটি গভীর খাত; গির্ণার হইতে যেটি অপেক্ষাকৃত দূরে, সেটিই উচ্চতর এবং তাহার মাথায় গুরু দত্তাত্রেয়ের একটি মন্দির আছে। অম্বা মার মন্দির হইতে দক্ষিণে চাহিলে কিছুতেই মনে হয় না যে গুরু দত্তাত্রেয়ের মন্দির মানুষের অধিগম্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অম্বা মার মন্দির হইতে গুরু দত্তাত্রেয়ের মন্দিরে যাইবার জন্যই সিঁড়ি আছে এবং প্রত্যেক বৎসর সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী এই দুর্গম পথ দিয়াই দত্তাত্রেয়ের মন্দিরে যাতায়াত করে, পা পিছলিয়া পড়িয়া অনেকে প্রাণও হারায়।

এই গির্ণার পর্ব্বত-শ্রেণীর মধ্যে মুসলমানদেরও তীর্থস্থান আছে। দক্ষিণে দাতারপীর নামক শিখরে জামাল শাহ (দাতার পীর) নামক ফকিরের দরগা আছে। সুরাষ্ট্রের মুসলমানগণ এই দরগাকে অতি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকে। দাতারপীর পাহাড়ের তলদেশে শত শত কুষ্ঠী ও খঞ্জ এবং নানা প্রকার ঘৃণ্য রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ রাতদিন বসিয়া পীরের নিকট আরোগ্য প্রার্থনা করে। সুরাষ্ট্রের পশ্চিম তীর দিয়া যাইবার সময় নাবিকগণ দাতার-পীর লক্ষ্য করিয়া সিন্নি মানত করে।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের আমলে গির্ণার পাদমূলে যে সুদর্শন হ্রদের সৃষ্টি, যাহার অস্তিত্ব রক্ষা করিতে ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে মহাক্ষত্রপ রুদ্রদাসের আমলে এবং ৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজাধি-রাজ স্কন্দগুপ্তের আমলে এতটা ব্যয়বাহুল্য হইয়াছিল, আজ আর তাহার কোন চিহ্নও নাই। মানচিত্র দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, গির্ণার-পর্ব্বতের পশ্চিম দিকে যে উপত্যকা আছে, তাহাই হ্রদে পরিণত করা হইয়াছিল। এই উপত্যকার দক্ষিণ হইতে একটি এবং উত্তর হইতে একটি নদী নামিয়াছে। রুদ্র-দাসের লিপিতেও দুইটি নদীরই উল্লেখ পাওয়া যায়। একটির নাম ছিল সুবর্ণসিকতা, আর একটির নাম ছিল পলাশিনী। পলাশিনীর নাম লোকে ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু উভয়ের মিলিত জলপ্রবাহ আজিও সোনারেখা বলিয়া পরিচিত। এই মিলিত জলপ্রবাহকে বাঁধ দিয়া রুদ্ধ করিয়াই হ্রদের সৃষ্টি করা হইয়াছিল। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে লেফ্‌টেন্যাণ্ট্ পোষ্টান্স্ অনেক খুঁজিয়াও এই বাঁধের কোন চিহ্ন পান নাই। রুদ্রদাসের লিপিতে বাঁধের যে অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল তাহার মাপ দেওয়া আছে। ঐ ভগ্ন অংশ লম্বায় ছিল ২১০ গজ, পাশেও তাহাই এবং উচ্চতায় ছিল ৭৫ হাত। কাজেই বাঁধাটি ইহারও অপেক্ষা বড় ছিল বলিয়া ধরিতে হইবে। অথচ বর্ত্তমানে যেখানে সেতু নির্ম্মিত সেই স্থানে দুই পাহাড়ের মধ্যে ব্যবধান ৪০ গজের বেশী নহে। কাজেই যেই বাঁধের ২১০গজ পরিমিত স্থান ভাঙ্গিয়াই গিয়াছিল সেই প্রকাণ্ড বাঁধ ঐ স্থানে কি করিয়া ধরিতে পারে, পোষ্টান্স্ সাহেব তাহা বুঝিয়া উঠিতেই পারেন নাই।

পোষ্টান্স্ সাহেবের লেখা হইতেই কিন্তু এই রহস্যের মীমাংসার একটা সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—The remains of an old causeway

are to be seen near the present one, crossing the bed of the ravine in a diagonal direction. It is only traceable for a few yards, but appears to have been connected with some former extensive work of the kind, as it is again to be seen for a short extent beyond the modern causeway towards Junagarh.

J. A. S. B 1839. P. 879

একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, বর্ত্তমান পুলটি যে ভাবে নির্ম্মিত, সেই রকম আড়াআড়িভাবে যদি সুদর্শন হ্রদের বাঁধ নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে বর্ষাকালে জল বাঁধে ঠেকিয়া কূল প্লাবিত করিয়া রৈবতকে যাইবার পথ ডুবাইয়া ফেলিত। কাজেই বাঁধ কোণাকোণী করিয়া এমন ভাবে রৈবতকে যাইবার রাস্তা তাহার উপর দিয়া লেওয়া হইয়াছিল যে বাঁধের উপর দিয়াই রাস্তা উচ্চ স্থানে যাইয়া পৌছিয়াছিল, বর্ষায়ও প্লাবিত হইবার আশঙ্কা আর ছিল না। প্রয়োজন না হইলে একটা পার্ব্বত্য নালার উপরে অনর্থক ব্যয়বাহুল্য করিয়া কোণাকোণী ভাবে কেহ রাস্তা নির্ম্মাণ করে না। কাজেই পোষ্টাম্‌স্ সাহেব বর্ত্তমান রাস্তার নিকটবর্ত্তী কোণাকোণী নির্ম্মিত যে প্রাচীন প্রশস্ত রাস্তার চিহ্ন পাইয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহাই সুদর্শন হ্রদের প্রাচীন বাঁধের ভগ্নাবশেষ বলিয়া আমার মনে হয়।

মূল দ্বারকা ও বর্ত্তমান দ্বারকা

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের উপক্রমে কৃষ্ণের পরামর্শমত জরাসন্ধ নিহত হইলে যাদবগণ তাহাদের পরম শত্রুর ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইল। এইবার রৈবতক শিখরে অথবা দ্বারকার সুদৃঢ় কিন্তু স্বল্পায়তন দুর্গের অভ্যন্তরে আবদ্ধ হইয়া শত্রু প্রতীক্ষায় সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া থাকার প্রয়োজন আর রহিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হরিবংশে দ্বারবতী নির্ম্মাণ প্রসঙ্গ দুইবার আছে। রাজসূয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কৃষ্ণ সমুদ্রতীরে দ্বারবতী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। হরিবংশে আছে, কৃষ্ণের অনুরোধ স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা দ্বারবতী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণের আদেশে সমুদ্র অনেক দূর সরিয়া গিয়া দ্বারবতীর জন্য স্থান ছাড়িয়া দিয়াছিল। সাধারণ বুদ্ধিতে এই বুঝা যায় যে সমুদ্রতীরবর্ত্তী অনেকখানি ঢালু যায়গা ঘিরিয়া লইয়া দ্বারবতী নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ উহার কতক স্থান, বর্ত্তমান কালের নেথারল্যাণ্ড দেশের মত, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে নিম্ন এবং সুদৃঢ় বাঁধ দ্বারা সমুদ্র জল হইতে রক্ষিত ছিল। বর্ত্তমান মূল দ্বারকার নিকটবর্ত্তী স্থানগুলির অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে এই অনুমান অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।* সার্ভে অব ইণ্ডিয়া প্রচারিত ১ ইঞ্চি=১ মাইল মানচিত্রে দেখা যায়, মূল দ্বারকার পূর্ব্বে সিঙ্গাওরা নদী, প্রায় ১৩২ গজ প্রশস্ত, পশ্চিমে এক বিস্তীর্ণ নিম্ন ভূমি, তাহার মধ্য দিয়া দেড় শত হাত প্রশস্ত সুরমৎ নামক নদী আসিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। এই দুই নদীর অত্যন্তরে দেড় মাইল বিস্তৃত নিম্ন ভূমির উপরে মূল দ্বারকা অবস্থিত ছিল। এই ভূভাগের উত্তরাংশ অনেক দূর পর্য্যন্ত সমুদ্রপৃষ্ঠের সমান, পশ্চিমেও প্রায় দেড় মাইল বিস্তৃত জলাভূমি। সঙ্গীয় মানচিত্রে দেখা যাইবে যে এরূপে মূল দ্বারকা দেড় মাইল বিস্তৃত এবং তিন পোয়া মাইল দীর্ঘ এক দ্বীপাকার ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

যাদবগণ নিতান্ত কোপন-স্বভাব ও কলহপ্রিয় ছিল, মহাভারতে এবং হরিবংশে অনেক স্থানেই তাহার পরিচয় আছে। সুরায় ও রমণীতে আসক্তি ছিল তাহাদের অসাধারণ। শত্রু কর্ত্তৃক দ্বারকা অবরোধ প্রসঙ্গে অথবা অন্যবিধ বিপৎকালে একাধিক বার এ কথা মহাভারতে আছে যে সুরাপান নিবারণ করিয়া এবং সুরাপায়ীর শূলদণ্ড বিধান করিয়া দ্বারকায় রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইল এবং নট ও নর্ত্তকদিগকে রাজধানী হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। যথা—মহাভারত বনপর্ব্বে শল্য কর্ত্তৃক দ্বারকা অবরোধ প্রসঙ্গ এবং মৌষল পর্ব্ব। স্যমন্তক হরণ প্রসঙ্গেও দেখা যায় যাদবপ্রধানগণের মধ্যে পরস্পরের প্রতি হিংসা, দ্বেষারেষি ও অবিশ্বাস বেশ প্রবল ভাবেই ছিল এবং যাদবগণের সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গলকামী কৃষ্ণও এই সকল হীন আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতেন না। প্রভাসে যাদবকুলের পরস্পর কলহে ধ্বংস এই উচ্ছৃঙ্খলতার শেষ ফল। মৌষল যুদ্ধের বিবরণে দেখা যায়, কৃষ্ণ নিজ হস্তে অনেক যাদবের প্রাণ বধ করিয়া ভূভার লাঘব করিয়াছিলেন। মৌষল যুদ্ধের পর অর্জ্জুন আসিয়া হতাবশিষ্ট যাদবগণকে ও যাদব-রমণীগণকে নিজের দেশে লইয়া গেলেন—সমুদ্র দ্বারকাপুরী গ্রাস করিল। সম্ভবতঃ যে বাঁধ ও প্রাকার সাহায্যে সমুদ্রজল আটকাইয়া দ্বারকাপুরীর বিস্তৃতি-সাধন হইয়াছিল, যাদবগণ দ্বারকা ছাড়িয়া যাইবার কালে তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল এবং এইরূপেই সমুদ্র দ্বারকাপুরী গ্রাস করিয়া থাকিবে। সুরাষ্ট্রের একেবারে পশ্চিম প্রান্তে বর্ত্তমান দ্বারকা যে নিতান্ত আধুনিক প্রতিষ্ঠান, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

* হরিবংশের ১৪৫ অধ্যায়ে দেখা যায়, যাদবগণের পিণ্ডারকায় সমুদ্রস্নান-যাত্রাকালে সহস্র সহস্র গণিকা তাহাদের সঙ্গে যাইতেছে। এই প্রসঙ্গে হরিবংশকার মন্তব্য করিয়াছেন—"দৃঢ়বিক্রম যাদবগণ যুদ্ধে স্বস্থান হইতে অপসারিত করতঃ এই অসংখ্য বেশ্যাগণকে দ্বারবতীতে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন।

পুনরাগমন

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

...ঃ, বাঁচা গেলো। এই তিন ঘণ্টা সময় তার দুঃস্বপ্নের মত কেটেছে। দুঃস্বপ্নের মত, চার ডিগ্রী জ্বরের তীব্র সম্মোহনের মত—চারপাশে যা-কিছু হচ্ছে, তা তা'র মস্তিষ্কে পৌঁছতে পারছে না,—চেতনায় প্রবেশ করতে পারছে না; অথচ, যা-কিছু হচ্ছে, সব তা'কে নিয়েই, তা'রি উপলক্ষ্যে। তা'কেই উপলক্ষ্য করে' এই ব্যাপার—তা'রি জন্যে বাড়িতে আল্পনা, ফুলের মালা, ধূপের ধোঁয়া, চন্দনের প্রলেপ—মিষ্টি গন্ধ, মিষ্টি গান, শাড়ির এত রঙ-বেরঙ, তথার এত ঘটা। সবি শুধু তা'রি জন্যে—এটা সে তা'র অবচেতন মনে আগাগোড়া উপলব্ধি করছিলো—আর ভেতরে ভেতরে ঘেমে উঠ্‌ছিলো। সত্যি—শারীরিক অর্থে ঘামছিলো; বার-বার তা'র দু' হাতের চেটো ঘেমে উঠ্‌ছিলো, বার-বার রুমাল বা'র করে' তা'কে হাত মুছতে হচ্ছিলো। একবার হঠাৎ তা'র মনে হয়েছিলো, সবাই তা'র এই হাত-মোছা ব্যাপারটা লক্ষ্য করছে না তো? এবং, ও-কথা মনে হওয়ামাত্র সে তাড়াতাড়ি রুমাল পকেটে ঢুকিয়ে তা'র গলার প্রকাণ্ড ফুলের মালাটা নিয়ে প্রাণপণে টানাটানি করতে আরম্ভ করলো। মালাটা ছিঁড়েই যেতো, যদি না এক ফাঁকে আভা তা'র কানের কাছে মুখ এনে তা'কে সাবধান করে' দিতো—

যাক্, সব চুকেছে। এইবার সে বাঁচ্‌লো। সভা ভেঙে যাওয়ার পরও ভক্ত-মণ্ডলী তা'কে ছাড়্‌তে চায় না; তা'র মুখের কথা শোন্‌বার জন্য সবাই উৎসুক; অধ্যাপকরা আসেন কাব্যের তত্ত্ব নিয়ে, সুন্দর চেহারার মেয়েরা অটোগ্রাফ নিয়ে; হালে যে-সব যুবক লিখে' নাম করেছেন, তারা আসেন তা'র সাহিত্যিক জীবনের প্রথম অধ্যায় শুনতে। কথা শুন্‌তে হয়, কথা বল্‌তে হয়, নাম-সই করতে হয়। আভাকে গিয়ে কয়েকজন খবরের কাগজের প্রতিনিধি—'কবি'র ব্যক্তিগত জীবনের তথ্য-সম্বন্ধে তাঁদের অশান্ত কৌতূহল। রাস্তায় বেরোতেই আধ ঘণ্টা কেটে গেলো। অনেক চেষ্টায় গাড়িতে যদি বা উঠে বসা গেলো, দরজার কাছে বিদায়ের ঘটা—গণ্য-মান্য ব্যক্তিরা এক-এক করে' বিদায় নিচ্ছেন—ভদ্রতার কথা বল্‌তে হয়, হাসি হাস্‌তে হয়; কল্‌কাতার শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি, শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য তা'কে শ্রদ্ধার নমস্কার জানাতে আসে; বিনয়ের অবতার হ'য়ে তা'কেও আনন্দে গলে' যেতে হয়। গাড়ি যখন স্টার্ট দিয়েছে, তখনো এক ভদ্রলোক ছুটে' এসে কী যেন একটা কথা বলে' গেলেন। সে শুন্‌তে পেলো না—তবু অমায়িক ভাবে ঘাড় নেড়ে হাস্‌লো। অসহ্য, অসহ্য!

এতক্ষণে গাড়ি নির্জ্জন পার্ক স্ট্রীট দিয়ে ছুটে' চলেছে—বেশ জোরেই ছুটেছে। নেই; কেউ নেই; কিছু নেই। আর চার মিনিটের ভেতর বাড়ি পৌঁছে যাবে। এমন একটা শুভ-ঘটনা তা'র বিশ্বাস করতে সাহস হচ্ছিলো না। রাস্তা খালি, গাড়িতে তা'র পাশে শুধু আভা। অনেক দূরে টাউন হল্, অনেক দূরে তা'র ভক্তরা; অনেক পুরোনো কথা তা'র সম্বর্দ্ধনা—আলো আর মালা, গানের সুর আর শাড়ির রঙ, বক্তৃতা আর তর্ক। অতীত, সেটা অতীত। সেটা হ'য়ে গেছে। আঃ—কী মুক্তি। গদিতে হেলান দিয়ে আরামে সে চোখ বুঁজ্‌লো।

এ-ও তার কপালে ছিলো! চিরকাল একটা জিনিষকে সে ভয় করে' এসেছে—বক্তৃতা-শোনা। তা'র চেয়েও ভয় করেছে বক্তৃতা-দেয়াকে। যা জন-সভা—দু'চারজন বাছা-বাছা লোকের আড্ডা নয়—সেখানে গেলেই তা'র হাঁফ ধরেছে; সভা-সমিতি ইত্যাদিকে যদ্দিন পেরেছে, এড়িয়ে চলেছে। কিন্তু বেশি দিন পারে নি। ছেলেবেলা থেকেই সে লিখ্‌তো। লিখ্‌তে তা'র ভালোই লাগ্‌তো। প্রথম যৌবনের অনভিজ্ঞতায় সে ভেবেছিলো, সাহিত্যিক জীবনের চাইতে সুখের কিছুই নয়। প্রথম যৌবনের কয়েকটা বছর কেটেওছিলো সুখে। তার পর খ্যাতি এলো। খ্যাতি যতই বাড়্‌তে থাক্‌লো, ততই দেখ্‌লো, তা'র নিজকে দশজনে লুটে' খাচ্ছে; সে আর তা'র নিজের নয়। বাড়ীতে খবরের কাগজের লোক

আসে ইণ্টারভিয়ু কর্‌তে, বহু দূর থেকে ছেলেরা আসে তা'কে 'দেখ্‌তে'; সভার সভাপতিত্ব কর্‌তে হয়, দিতে হয় বক্তৃতা, মিশ্‌তে হয় বহু লোকের সঙ্গে। প্রথম-প্রথম এড়াতে চেষ্টা করেছে, ঠেকাতে চেয়েছে—শেষটায় বাধ্য হয়েছে ভেঙে পড়্‌তে, ধরা দিতে, বেসুরো, বিশ্রী বাইরেকে আমল দিতে। এলো অর্থ, এলেন সুযোগ্যা স্ত্রী, উঠ্‌লো বালিগঞ্জে বাড়ী, হঠাৎ একদিন নিজের একখানা গাড়িও হ'ল। সপ্তাহে তিন দিন তা'র নিমন্ত্রণে যেতে হয়, সপ্তাহে চার দিন নিমন্ত্রণ কর্‌তে হয়। শহরের সব অনুষ্ঠানে জোর করে' তা'কে ধরে' নিয়ে যায়; বছরে অন্তত দু'খানা বই প্রকাশকরা তা'কে দিয়ে জোর করে' লিখিয়ে নেয়। সময় নেই; এক মুহূর্ত্ত সময় নেই। নিজ হাতে একখানা চিঠিও সে লিখ্‌তে পারে না; তা'র প্রিয়, পুরোনো বইগুলোর বছরে একবারো পাতা ওল্টানো হয় না। জনতার কাছে নিজকে সে বেচে দিয়েছে; জনতার হুকুম প্রতি মুহূর্ত্তে তা'কে তামিল কর্‌তে হয়; সে আর তা'র নিজের নয়। প্রতি মুহূর্ত্ত তা'র অসহ্য লাগে, প্রতি মুহূর্ত্তে সে পালাবার জন্য ছট্‌ফট্ করে; প্রতি মুহূর্ত্তে সে আরো বেশি করে' জড়িয়ে পড়ে। আরো যশ, আরো অর্থ। সে যদি না-ও চায়, কৃতিত্ব তা'র পায়ে এসে লুটিয়ে পড়ে। সে যদি নিজকে লুকিয়ে রাখ্‌তে চায়, গৌরব এসে ঘর জুড়ে' বসে। একটু ফাঁকা নেই, একটু সময় নেই।

শেষটায়, আজ্‌কে তার এই সম্বর্দ্ধনা। বাঙলাদেশকে এ-দোষ কখনো দে'য়া যাবে না যে সে তা'র সাহিত্যিককে যোগ্য সম্মান দেয় নি। দিয়েছে; তা'কে, শিবপ্রসাদ দত্তকে খুব বেশি করে'ই দিয়েছে। এখনো তা'র বয়েস চল্লিশ হয় নি। আজ্‌কে সমস্ত দেশ প্রকাশ্যে তা'কে বরণ করেছে, তা'র কপালে দিয়েছে চন্দন, গলায় পরিয়েছে মালা; সোনার পাত্রে করে' সমস্ত জাতি তা'কে আজ অভিনন্দন দিয়েছে। এত দিন পর্য্যন্ত যদি বা তা'র কোনো ছিটেফোঁটা তা'র নিজের ছিলো, আজ থেকে তা-ও গেলো, তা-ও গেলো।

উঃ—শেষ আর হয় না। তা'র চেয়ে অন্তত তিরিশ বছরের বড়, বৃদ্ধ, গত শতাব্দীর ধ্বংসাবশেষ এক সভাপতি—তাঁর অভিভাষণ, উঃ, কী স্তুতি, কী চাটুকারিতা, মিথ্যা কথা, নির্ব্বোধ কথা, অর্থহীন কথা! মেয়েদের গান, একটা গান এই উপলক্ষ্যে বিশেষ করে' রচিত, তা'র কবিতার আবৃত্তি, তা'র সাহিত্য নিয়ে প্রবন্ধ পাঠ—শেষ আর হয় না। অভিনন্দন পাঠ ও উপহার—তার পর তা'র উত্তর। কী উত্তর দেবে—একটা কথা তার মনে আস্‌ছে না। তবু, কলের মত কতগুলো কথা বলে' গেলো—করতালি শুনে' বুঝ্‌তে পার্‌ছলো, খারাপ কিছু বল্‌ছে না। একবার, শুধু একবার আট্‌কে গিয়েছিলো—আভা তৎক্ষণাৎ পাশ থেকে তা'কে ঠিক শব্দটি জুগিয়ে দিয়েছিলো। আভা—আভাকে না হ'লে তা'র কী করে' চল্‌তো? গেলো দশ বছর ধরে'—বিয়ের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত—আভা তা'র দক্ষিণহস্ত, তা'রো বেশি। এত কাজের বোঝা আভা না হ'লে সে কিছুতেই বইতে পার্‌তে না। আভা তা'র বোঝা অর্দ্ধেক করে' দিয়েছে; এ-সব কাজে-কর্ম্মে তা'র যেমন উৎসাহ, তেম্‌নি নিপুণতা। বাইরের বহুমুখী উদ্ব্যস্ত জীবন আভা বেশ কাটাতে পারে; লোকের চোখের সুমুখেই তা'র ভালো লাগে; এই যে এই গৌরব, তা'রি কাছে আসা উচিত ছিলো, তা'রেই ও-সব মানাতো; সে, শিবপ্রসাদ দত্ত, এর যোগ্য না। আভার রূপ কল্‌কাতা শহরে নাম-করা; তা'র ওপর অসাধারণ তা'র কথা-বলার ক্ষমতা, তা'র উপস্থিত বুদ্ধি, তা'র চরিত্রের দৃঢ়তা। মনকে সে চব্বিশ ঘণ্টা চাবুকের ওপর রাখ্‌তে পারে; তা'র মধ্যে কোনো হেলাফেলা, আলস্য, ঔদাস্য নেই—কাজ, কাজ তা'র কাছে সব। কাজ কর্‌তে তা'র ভালো লাগে। আশ্চর্য্য! আজ্‌কের এই সম্বর্দ্ধনা—এই আলো আর মালা আর রঙ-বেরঙের শাড়ি, এই তর্ক-বিতর্ক, কথার উত্তরে কথা—এ-সব তারি জন্যে হওয়া উচিত ছিলো, আভার জন্য, আভাই এ-সব সহ্য কর্‌তে পার্‌তো; শুধু তা-ই নয়, উপভোগও কর্‌তো।

একবার চোখ মেলে সে আভার দিকে তাকালো; আভা স্থির দৃষ্টিতে সাম্‌নের দিকে তাকিয়ে আছে—তা'র উজ্জ্বল চোখ আরো উজ্জ্বল, তা'র গোলাপী গাল লাল হ'য়ে ফেটে পড়্‌ছে। নেশা—নেশা—গৌরবের নেশায় তা'কে ধরেছে, তা'র স্বামীর গৌরবে। সমস্ত বাঙ্‌লা দেশ যে-লেখককে আজ অভিনন্দন দিলে, সে তা'রি স্বামী। তা'রি। আভা কথা কইতে পার্‌ছে না উত্তেজনায়, আর সে নিজে—শিবপ্রসাদ দত্ত—সে চুপ করে' আছে ক্লান্তিতে।

ক্লান্তি, ক্লান্তি। তিন ঘণ্টা ধরে' প্রকাশ্য সভায় যে সম্বর্দ্ধিত হয় নি, সে কী করে' বুঝ্‌বে, ক্লান্তি কা'কে বলে।···যাক্, বাড়ী এসে গেছে।

তা'র ইচ্ছে হ'ল, একেবারে শোবার ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেয়; কিন্তু একবার ওপরে উঠ্‌লে আর নীচে নাবা অসম্ভব হ'বে। তাই, খাবার হাঙামটা চুকিয়ে যাওয়াই ভালো। না-খেতে পার্‌লেই সে খুসি হ'ত; কিন্তু আজ্‌কের রাতে না খেলে আভা দুঃখিত হ'বে; এবং আজ্‌কের রাতে আভাকে দুঃখ দেয়া যায় না, তা'র ভেতর থেকে একটা স্বর এ-কথা বল্‌ছিলো। অন্যের হুকুমে চল্‌তে সে অভ্যস্ত; তাই নিজের ওপর এটুকু জবরদস্তি তা'র গায়েই লাগ্‌লো না। বস্‌বার ঘরে একটা সোফায় গা এলিয়ে দিলে—অভ্যেস-মত সন্ধ্যের কাগজগুলো থেকে একটা তুলে' নিয়ে চোখের সাম্‌নে খুলে' ধর্‌লো। মহেশ এসে পাখাটা খুলে' দিয়ে চলে' গেলো। আভা এরি মধ্যে কাপড় বদ্‌লে এসেছে। তা'র পাশে দাঁড়িয়ে বল্‌ছে—'ভারি ক্লান্ত বোধ কর্‌ছো—না? একটু বোসো, খাবার ব্যবস্থা দেখি গে।' সে মাথা নেড়ে সায় দিলে।

তা'র দিকে একবার ক্ষিপ্র দৃষ্টিপাত করে' আভা বেরিয়ে গেলো। সে-দৃষ্টি সে লক্ষ্য কর্‌লে। নেশা, নেশা! আভা আজ সার্থক মনে কর্‌ছে নিজকে। সে—শিবপ্রসাদ—সে-ও সার্থক মান্‌ছে সব। আভা যদি সুখী হ'য়ে থাকে, সে কেন অভিযোগ কর্‌তে যাবে? যে-মেয়ে তা'র সমস্ত জীবন তা'কে দিয়েছে, তা'র জন্য ব্যয় করেছে, সে না-হয় প্রতিদানে নিলো খানিকটা গৌরব; তা'র জন্য, তা'র তৃপ্তির জন্য, বে-আব্রু বাইরের কাছ থেকে দু' হাতে গৌরব কুড়োতে শিবপ্রসাদ কেন কুণ্ঠিত হ'বে?

'টেলিফোনে আপনাকে ডাক্‌ছে।'

'বলে' দাও, মহেশ, এখন হ'বে না।'

'বলেছিলাম।'

'আবার গিয়ে বলো।'

মহেশ ভয়ে-ভয়ে বল্‌লে, 'ও-কথা মানে না। ভয়ানক নাকি দরকার।'

ভুরু কুঁচ্‌কে শিবপ্রসাদ জিজ্ঞেস কর্‌লে, 'কী নাম?'

'বলে নি।—মেয়েলি গলা।'

অসম্ভব! এখন যদি আবার কোনো আধ-চেনা 'সাহিত্যিক' মেয়ের সঙ্গে মধুরভাবে আলাপ করতে হয়—না, অসম্ভব।

'যাও, মহেশ; দাঁড়িয়ে আছো কেন?'

মহেশ ইতস্ততঃ কর্‌তে লাগ্‌লো।

'বলে' দাও, 'কাল সকাল ন'টায় রিং-আপ্ কর্‌তে।'

'তা-ও বলেছিলাম। আজ্‌কে রাত্তিরেই নাকি অনেকদিনের জন্য কল্‌কাতা ছেড়ে যাবে—পনেরো মিনিটের মধ্যেই গাড়ি ছাড়্‌বে। সময় নেই।'

মহেশ এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে' ফেল্‌লো।

জীবনে বহুবার শিবপ্রসাদকে বহু ভক্ত খামকা টেলিফোনে বিরক্ত করেছে। আর-একবার না-হয় হ'ল। এ-ই তো তার জীবন; সে অন্য-সকলের, সে তার নিজের নয়।

লাইব্রেরী-ঘরে গিয়ে সে টেলিফোন তুলে' নিলে।—'হ্যালো।'

'চিন্‌তে পার্‌ছো?'

সে (একটু ভেবে)। না।

স্বর। অথচ তুমিই তো বলেছিলে, মানুষের সবি বদ্‌লায়, শুধু বদ্‌লায় না তার গলার স্বর।

সে (চুপ)।

স্বর। এখনো চিন্‌তে পার্‌ছো না?

সে। বলো। একটু—এ-ঘর থেকে যাও, মহেশ।

স্বর। বেশিক্ষণ রাখ্‌বো না। জানি, তুমি খুব ক্লান্ত। —তবু ভাগ্যিস তুমি টেলিফোন ধর্‌লে। অনেক ধন্যবাদ।

সে। ও-সব বোলো না।

স্বর। আজ্‌কে তোমার সম্বর্দ্ধনা কেমন লাগ্‌লো?

সে। ও-কথা থাক্।

স্বর। ভেবেছিলাম, যাবো। হ'য়ে উঠ্‌লো না। গেলে তোমাকে দেখ্‌তে পেতাম। তুমি কি বদ্‌লেছো—চেহারায়?

সে। কী করে' বলি। পনেরো বছর আগে যা'রা আমাকে দেখেছে, তা'দের কারো সঙ্গে আর দেখা হয় না।

স্বর। অনেক বই লিখেছো—না?

সে। অনেক।

স্বর। সবগুলো আমার পড়াও হয় নি। সময়ই পাই নে।

সে। কী করে' কাটাও সময়?

বিবিধ-প্রসঙ্গ

স্বপ্ন-রহস্য

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

সৃষ্টির আদি হইতে মানুষ ও অন্য অন্য জীবজন্তু স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছে। সেই অনাদি অনন্ত কাল ধরিয়া স্বপ্ন মানবের কাছে চির রহস্যময় হইয়া রহিয়াছে। স্বপ্ন কি রকম করিয়া হয়, এবং কেনই বা হয়? এই 'কেন'র উত্তর পাইবার জন্য মানুষের চেষ্টার অন্ত নাই, এবং এখনও সে চেষ্টার বিরাম নাই। কিন্তু আজিও এ রহস্যের সমাধান হইল না—রহস্য চিরদিনই রহস্যই রহিয়া গেল।

স্বপ্ন-রহস্য ভেদ করিবার জন্য সভ্য অসভ্য সকল দেশের সকল জাতির লোকদের কৌতূহল অসামান্য। যাঁহার যেরূপ মনে হইয়াছে, তিনিই সেইরূপে স্বপ্ন-রহস্যের এক একটা সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ স্থির করিয়াছেন, স্বপ্ন অমূলক চিন্তামাত্র। মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণও বলেন, স্বপ্ন চিন্তার ফল মাত্র। কিন্তু তাঁহারা স্বপ্নঘটিত চিন্তাকে অমূলক বলেন না। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, স্বপ্ন-চিন্তার একটা না একটা মূল আছেই। শারীরতত্ত্ববিদরা স্বপ্নকে কতকগুলি (প্রধানতঃ বিকৃত) শারীর-ক্রিয়ার ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রকাররা স্বপ্ন সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা আমাদের স্বপ্নফলগুলির আলোচনা করিলেই বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। স্বপ্নফল-সংক্রান্ত সংস্কৃত গ্রন্থে কয়েকজন পৌরাণিক ব্যক্তির স্বপ্ন-দর্শন-বৃত্তান্ত উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে কেহ সুস্বপ্ন কেহ-বা দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন; কিন্তু সকলেই শাস্ত্রানুযায়ী স্বপ্ন দর্শন করিয়াছেন—কেহই অশাস্ত্রীয়ভাবে স্বপ্ন দেখেন নাই।

সম্প্রতি অধ্যাপক ফ্রয়ড নামক একজন মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত নূতন ধরণে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার স্বপ্ন-বিশ্লেষণ পদ্ধতি চিন্তামূলক, এবং অতি অভিনব ও সুন্দর। এইরূপ বিশ্লেষণের ফলে অনেক স্বপ্নের সুন্দর ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র-শেখর বসু ডি-এসসি, এম-বি মহাশয় অধ্যাপক ফ্রয়ডের স্বপ্ন-বিশ্লেষণ প্রণালীর অনুসরণ করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে স্বপ্ন-বিশ্লেষণ প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তাহা অতি চমৎকার। যাঁহারা এই প্রণালী অবগত হইতে এবং নিজে নিজে তাঁহাদের নিজেদের এবং তাঁহাদের বন্ধু-বান্ধবদের স্বপ্ন বিশ্লেষণ পূর্ব্বক তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে চাহেন, তাঁহারা গিরীন্দ্রবাবুর "স্বপ্ন" পুস্তকখানি পাঠ করিলে সমূহ উপকৃত হইবেন।

আমার মনে হয়, স্বপ্নকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। তন্মধ্যে তিনটি প্রধান যথা,—(১) চিন্তাতান্ত্রিক, (২) বস্তুতান্ত্রিক এবং (৩) (চিন্তা ও বস্তুর) মিশ্রতান্ত্রিক। এতদ্ব্যতীত, প্রয়োজন হইলে আরও দুই একটি শ্রেণী-বিভাগ করা যায়। কারণ, আমার ধারণা, স্বপ্নমাত্রেই কেবল অমূলক বা সমূলক চিন্তার ফল নহে। অনেক স্বপ্নের মূলে বাস্তব ঘটনা, বস্তু বা ব্যক্তির অস্তিত্ব রহিয়াছে। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১৩২৮ সালের চৈত্র মাসের শেষে ও ১৩২৯ সালের বৈশাখ মাসের প্রারম্ভে গুড্ ফ্রাইডের ছুটি উপলক্ষে মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশন হয়। "নায়কে"র প্রতিনিধি রূপে আমি এই সম্মিলনে গিয়াছিলাম।

মেদিনীপুরে আমার একজন আত্মীয়—দূর সম্পর্কের ভায়রা-ভাই বাস করেন। মেদিনীপুরে যখন যাওয়া গেল, তখন আত্মীয়ের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিবার বিশেষ ইচ্ছা হইল। আমি সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করায় তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া দুইজন স্বেচ্ছাসেবকের সহিত আমাকে আমার আত্মীয়ের নিকট পৌঁছাইয়া দিলেন।

এইখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, আমার এই আত্মীয়ের সহিত আমার বিবাহের রাত্রে কয়েক ঘণ্টার জন্য মাত্র আলাপ হইয়াছিল। তাহার পর তাঁহার সহিত কালে-ভদ্রে এক আধ দিন সাক্ষাৎ হইয়া থাকিলেও তাহা কলিকাতাতেই হইয়াছিল। কারণ, ভায়রা-ভাই মহাশয় স্বয়ং কলিকাতায় খুব কমই আসিতেন, এবং সাহিত্য-সম্মিলনের পূর্ব্বে আমিও কখনও মেদিনীপুরে যাই নাই। তবে তাঁহার স্ত্রী এবং পুত্র কন্যারা প্রায় কলিকাতায় আসিতেন এবং আসিয়া থাকেন—দেখা সাক্ষাৎও প্রায়ই হয়।

আত্মীয়-গৃহে গমন করিয়া দুই চারিটি কথাবার্ত্তার পর তিনি তাঁহার স্ত্রীর (আমার শ্যালিকার) সহিত সাক্ষাৎ করাইবার জন্য আমাকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবমাত্র আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আমার মনে হইল, আমি এ বাড়ীতে পূর্ব্বে যেন একবার আসিয়াছিলাম! বাড়ীর প্রত্যেক অংশই আমার পরিচিত বলিয়া মনে হইল। আমি পূর্ব্বে কখনও মেদিনীপুরে যাই নাই, অথচ, এ বাড়ী আমার এত চেনা কেমন করিয়া হইল তাহা আমি আদৌ বুঝিতে পারিলাম না। বাড়ীর বাহিরের অংশ দেখিয়া কিন্তু তাহা পরিচিত বলিয়া বোধ হয় নাই। চিন্তা করিতে করিতে মনে পড়িল, বাল্যকালে—বিবাহের বহু দিন পূর্ব্বে স্বপ্নে আমি সেই বাড়ীতে গিয়াছিলাম। এমনও মনে হইল যে, ঐ বাড়ীতে আমি একটি গৃহ-বিগ্রহও দেখিয়াছিলাম। তখন আমি শ্যালিকা মহোদয়াকে আমার স্বপ্নে সেই বাড়ীতে বহুকাল পূর্ব্বে যাওয়ার কথা এবং ঠাকুর দেখার কথা বলিলাম। শুনিয়া তাঁহারও বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

এখানে আমার বক্তব্য এই যে আমার স্বপ্নদৃষ্ট বাড়ীটি চিন্তামাত্র নয়

—তাহার একটা বাস্তব অস্তিত্ব রহিয়াছে। বাল্য-স্বপ্নের সকল কথা আমি স্মরণ করিতে না পারিলেও, বাড়ীখানি যে স্বপ্ন-দৃষ্ট এবং পূর্ব্ব পরিচিত তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই, অথচ, আমি যে তৎপূর্ব্বে আর কখনও—সে বাড়ীতে যাওয়া দূরের কথা—মেদিনীপুরেই যাই নাই, তাহাও ধ্রুব সত্য। এই জন্য আমার মনে হয়, স্বপ্ন যদি চিন্তামাত্র হয়, তাহা হইলে এরূপ ঘটনা কিরূপে সম্ভব হয়? এবং এই জন্যই আমি স্বপ্নের শ্রেণীবিভাগ করিয়া একটি বিভাগকে বস্তুতান্ত্রিক বলিতে চাহি।

আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ইহা আমার কথা নহে—স্বর্গীয় সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের কথা। শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদিত "বঙ্গভাষার লেখক" গ্রন্থান্তর্গত "পিতা-পুত্র" নামক প্রবন্ধ হইতে অক্ষয়বাবুর নিজের কথাগুলিই আমি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"১৮৭০ সালের ২৯শে মার্চ্চ, পিতা পাকা সবজজ হন। পাকা পদ পাইয়া প্রথমে চট্টগ্রামে গমন করেন। সেই সময়ে একটি অপূর্ব্ব ঘটনা হয়। বঙ্গ-সাহিত্যের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও সেটির উল্লেখ করা আমি কর্ত্তব্য মনে করি। সাহিত্য কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক ভাব লইয়া, অর্থাৎ রস লইয়া, নাড়া চাড়া করে। সাহিত্যের এলেকা ছাড়া আরও অনেক গুরুতর আধ্যাত্মিক বিষয় আছে। সেইরূপ একটি আধ্যাত্মিক ঘটনার কথা বলিতেছি। ১২৯৩ সালের শ্রাবণের "নবজীবনে" যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি:—

"ভবিষ্যতের ছোটখাট ঘটনা আমি কতবার স্বপ্নে দেখিয়াছি, তাহা বলিতেই পারি না। সাঙ্গোপাঙ্গ একটি গুরুতর ঘটনা আমি একবার স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম। আমি একরাত্রি বহরমপুরে থাকিতে হঠাৎ (এইখানে আচার্য্য মহাশয় পাদটীকায় লিখিয়াছেন—হঠাৎ বলিবার ভাব এই যে, যে বিষয় স্বপ্ন দেখি, সে বিষয়ে জাগ্রত অবস্থায়, কোনই তোলা-পাড়া করি নাই।) স্বপ্নে দেখি যে, পূজ্যপাদ পিতৃদেব যেন চট্টগ্রামে স্বর্গ করিতে যাইতেছেন, আর আমি তাঁহাকে কলিকাতায় রাত্রিকালে ষ্টীমারে উঠাইয়া দিতে গিয়াছি। আলোয় জাহাজ ঝক্ ঝক্ করিতেছে, খালাসীরা কল্ কল্ করিতেছে, নীচে গঙ্গা কুল কুল করিতেছে, আর উপরে বায়ু ঝরঝর করিয়া বহিতেছে। স্বপ্নের কথা দুই এক জনকে বলিয়াছিলাম। ইহার কয়মাস পরে, ঠিক সেইরূপ ঘটনা হইল। তেমনই আলো, তেমনই গঙ্গা; আমার বোধ হইল, সেই রেঙ্গুন নামা জাহাজই আমি স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম। স্বপ্ন মিথ্যা আমি কখনই বলিতে পারি না।"

ইহা কেমন করিয়া সম্ভবপর হয়? আচার্য্য মহাশয় স্বয়ং বলিতেছেন, তিনি এ বিষয়ে (পিতার বদলী হওয়ার বিষয়ে) জাগ্রত অবস্থায় কোন তোলাপাড়া অর্থাৎ চিন্তা বা আলোচনা করেন নাই। সুতরাং ইহা চিন্তা-তান্ত্রিক স্বপ্ন নহে, বলিতে হইবে। আমার বোধ হয় এই ধরণের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা ফ্রয়ডের বিশ্লেষণ-পদ্ধতির দ্বারা সম্ভবপর নহে। সুতরাং আমি এই শ্রেণীর স্বপ্নকে বস্তু-তান্ত্রিক বলিতে চাহিতেছি। কারণ, এই স্বপ্ন একটি ভাবী বাস্তব ঘটনার পূর্ব্বাভাষ—ইহার মূলে বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা—তিনটি ব্যাপারই রহিয়াছে, কিন্তু চিন্তামাত্র নাই।

আর এই স্বপ্ন বৃত্তান্তের অন্তর্গত 'আধ্যাত্মিক' কথাটির প্রতি আমি পাঠক-সাধারণের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিতেছি। কারণ, পরে এই কথাটির আলোচনার প্রয়োজন হইতে পারে।

আরও একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাউক। পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের অন্যতম শিষ্যোত্তম বাবুরাম্ (স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ) যখন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস দেবকে দর্শন করিতে গমন করেন, তখন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বালক বাবুরামকে তাঁহার সাধন-ক্ষেত্র পঞ্চবটী দর্শন করিয়া আসিতে আদেশ করেন। পঞ্চবটীর চারিদিক ঘুরিয়া বাবুরামের বাল্যকালের অনেক স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। পঞ্চবটীতে পদার্পণ করিয়াই স্থানটি ঠিক ঠিক তাঁহার বাল্যকালীন স্বপ্নের চিত্রানুযায়ী দেখিয়া মনে মনে চমৎকৃত ও পরিতুষ্ট হইলেন।—(উদ্বোধন)

আমার মনে হয়, যাঁহারা বাস্তব-জগতে পূর্ব্ব-স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তু, ব্যক্তি, বিষয় বা ঘটনার পুনরায় সাক্ষাৎ পান, তাঁহারা যদি সেই সকল স্বপ্ন ও ঘটনার বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে স্বপ্ন-লোকের বস্তু-তান্ত্রিক দিকটাতে আলোক-সম্পাত হইতে পারে। এবং এ বিষয়ে প্রচুর গবেষণার প্রয়োজনও রহিয়াছে।

প্রাচীনপন্থী মত

প্রাচীনপন্থী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ যে ভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিতে চাহেন, তদনুসারে সমগ্র মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের (Metaphysics) আলোচনা আসিয়া পড়ে। Metaphysics বলিতে তত্ত্ববিদ্যা, মনোবিজ্ঞান এবং দর্শনশাস্ত্র—এই ত্রিবিধ বস্তুই বুঝাইতে পারে। সুতরাং স্বপ্ন-রহস্যও এই তিন দিক দিয়াই আলোচিত হইতে পারে, এবং প্রাচীন-পন্থীদিগের দ্বারা আলোচিত হইয়াছেও। আমি এখানে মোটামুটি তাহার সামান্য আভাষ মাত্র দিবার চেষ্টা করিব।

প্রথমে এই শাস্ত্রটির ভিত্তি ছিল অনুমান মাত্র। পরবর্ত্তী দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই শাস্ত্রটিকে প্রত্যক্ষানুভূতি এবং বস্তুতান্ত্রিক ঘটনাবলীর পর্য্যবেক্ষণ-রূপ ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া তাহার সংস্কার সাধন করেন। তাঁহারা প্রথমে ধরিয়া লয়েন যে, সমগ্র বিশ্ব-জগতের কার্য্যাবলী একটা সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপ্রণালীবদ্ধ নিয়মাবলীর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে—কোথাও এই নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। মানুষের মন যে ভাবে কার্য্য করে তাহাও এই নিয়মের অধীন। পদার্থ-বিজ্ঞান শাস্ত্রে যে-ভাবে ঘটনাবলীর পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক পদার্থ-বিজ্ঞান-ঘটিত প্রাকৃতিক নিয়মাবলী আবিষ্কৃত হইয়াছে, মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রেও ঠিক সেই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া মানসিক ক্রিয়া সমূহের একটা সাধারণ নিয়ম নির্ণয় করা হইয়াছে। তবে অবশ্য এ বিষয়ে মনো-বৈজ্ঞানিকগণকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছে। কারণ, পদার্থ সংক্রান্ত ঘটনাবলীর পর্য্যবেক্ষণ করা যতটা সহজ, মানসিক ক্রিয়ার গতি-প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করা তত সহজ নহে। কারণ, মন বলিয়া জিনিসটি বস্তুতান্ত্রিক নহে,

স্বর। সে কথা থাক্।—এখনো কবিতা লেখো?

সে। (একটু পরে) না। এখন শুধু গল্প।

স্বর। কবিতা একেবারেই লেখো না?

সে। যা লিখেছিলাম, লিখেছিলাম। তার পর—

স্বর। থামলে কেন? বলো।

সে। তোমার কথা বলো।

স্বর। আমার কথা? এ-পর্য্যন্ত ছ'টি হয়েছে।

সে (চুপ)।

স্বর। হাস্‌লে না?

সে। তার পর?

স্বর। বেঁচে তো আছি।

সে। কল্‌কাতায় কবে থেকে আছো?

স্বর। বছর খানেক।

সে। বছর খানেক!

স্বর। অনেক দিন—না? দৈবাৎ যে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, তার কোনোই সম্ভাবনা ছিলো না। এক বছরে আমি বাড়ী থেকে বেরিয়েছি তিন বার। তা-ও বেশি দূর নয়।

সে (চুপ)।

স্বর। তা ছাড়া, আমাকে দেখ্‌লেও তুমি চিন্‌তে পার্‌তে না।

সে। তোমার চেহারা ঠিক মনে কর্‌তে পার্‌ছি না।

[একটু চুপচাপ]

সে। কল্‌কাতায় কোথায় ছিলে?

স্বর। কালীঘাটে।

সে। স—সপরিবারে?

স্বর। তা-ই।—ও-সব তুমি শুন্‌তে চাও কেন?

সে। না—না, শুন্‌তে চাই নে।

স্বর। খানিকটা শোনো। এক বছর কল্‌কাতায় কাটিয়ে গেলাম—আগাগোড়া জান্‌তাম, তুমিও এখানেই আছো।

সে। এখন কোথায় যাচ্ছো?

স্বর। তা আর না-ই শুন্‌লে।

সে। কোত্থেকে কথা বল্‌ছো?

স্বর। হাওড়া স্‌টেশ্‌ন্। আমাদের গাড়ি ছাড়্‌বার আর দেরি নেই।

সে। কোথায় যাচ্ছো বল্‌বে না?

স্বর (চুপ)।

সে। এখন গাড়ি নিয়ে বেরুলে তোমাদের ট্রেন্ ছাড়বার আগে—ও কী?

স্বর (চুপ)।

সে। একটা কথা জিজ্ঞেস কর্‌তে পারি?

স্বর। বলো।

সে। আজ এই সময়ে হঠাৎ—

স্বর। কেন, বল্‌ছি। তোমার সম্বর্দ্ধনার খবর আমার কানেও পৌঁচেছিলো। মনে কর্‌লাম, আজ সময় থাক্‌লে আমিও তোমাকে আমার অভি—কী হ'ল?

সে। বলে' যাও, বলে' যাও।

স্বর।—আমার অভিনন্দন জানিয়ে যাই। দেশের লোকের সঙ্গে আমিও তোমাকে—

সে (অত্যন্ত মৃদুস্বরে) না—না—না।

স্বর। কেনই বা নয়? আর হয়-তো সুযোগ হ'ত না।—তা হ'লে রেখে দিই?

সে। একটু—আর একটু।

স্বর। আচ্ছা, একটা কথা বলো। তোমার কি তখন ভয় করেছিলো?

সে। তখন?

স্বর। তখন।

সে। না—তা'কে ভয় বলে না।

স্বর। তা-ই। ভয় তুমি পাও নি; সেইজন্য আমার তুমি জয়ী হ'লে। আর-একটা কথা।

সে। বলো।

স্বর। এখন তো আর তোমার মনে কোনো ক্ষোভ নেই?

সে। কী করে' বলি!

স্বর। বলো, সবি সার্থক হয়েছে?

এক্‌সচেঞ্জ। Hurry up, please.

সে। One minute.

সে। বল্‌লে না?

স্বর। বল্‌লে না?

সে। তোমার গাড়ির ঘণ্টা শুন্‌তে পাচ্ছি। তুমি আর ফিরবে না?

স্বর। কোথায়?

সে। ফির্‌বে না?

স্বর। আজকে যে-রকম ফির্‌লাম?

সে। কেন নয়?

স্বর। তা হ'লে এখন—

সে। এই—আর-একটা কথা। শোনো—শোনো।··· হ্যালো!···হ্যালো! 'খাবার দিয়েছে।'

'চলো, যাই।' শিবপ্রসাদ টেলিফোন রেখে দিলে।

আভা বল্‌লে, 'খেয়ে-দেয়ে আজ আর কাগজ-পত্র নিয়ে বস্‌তে পার্‌বে না। অম্‌নি ঘুম। চোখ দুটো একেবারে লাল হ'য়ে উঠেছে, দেখছি।'

বেদুইন

শ্রীপীযূষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

হাতে পায়ে গায়ে ধূলা মেখে আজ ক্রন্দন ভুলে যাই,
হাসি দিয়ে আমি সসাগরা ধরা জিনিয়া লইতে চাই।

ধরায় ধূলার ছেলে—
স্বর্গের শচী চাহিবে না কভু ছোট দুটি বাহু মেলে।

বেশী কিছু লোভ নহে—
বজ্রের সুর বীণার মতন বুকে যেন মোর সহে।

রাত্রি-শেষের শরতের চাঁদ উপভোগ যেন ক'রি,
জ্যৈষ্ঠের রোদে রোদন ভুলিয়া আমি যেন পথে ম'রি।

মত্ত সাগর পাড়ি দিয়ে এনু বেদুইন বেপরোয়া,
ধরাখানা মোর সরাইখানা যে,—বিশ্বপতির দেওয়া।

ফলে ফুলে ভরা ধরা—
ইহারে যদি না উপভোগ ক'রি, বৃথা এসে ঘুরে মরা।

মন মোর এই চায়—
পথের কুকুরো মোর সাথে মিশে আনন্দ যেন পায়।

কাহারো চাইতে বড় নহি আমি, কারু চেয়ে নই নীচু,
ভাগ্য সে মোর হাতের খেলনা—ছোটে মোর পিছু পিছু।

দিনের আলোতে চন্দ্রেরে ভুলি, ভুলি রাত্রের তারা,
চাঁদের আলোতে ভুলি আবেশেতে সুখ দুঃখ দিল কারা।

ঝঞ্ঝায় ঝোঁকে চ'লি—
সসীমের মাঝে অসীমে নেহারি ধরণী দুপায়ে দ'লি।

কত কি যে মনে আসে—
মধুকর আমি মাধুকরী ক'রে বেড়াই সবার পাশে।

জীবন দোলায় দোল খেয়ে খেয়ে দুলে দুলে উঠে প্রাণ,
বেদের বেপথু প্রাণে লাগে ভাই—বপু নহে বেপমান।

আমার লাগিয়া কাঁদিতেছে হেরি সীমাহীন ওই পথ—
কোটি জনমেও পারি যদি ও'র মিটাইব মনোরথ।

হেসে নেচে গান গেয়ে—
একদিন আমি নিশ্চয় যাব ও'রি বুক বেয়ে ধেয়ে।

ভাবনা কিছুই নাই—
যাহা চাই তাহা অনায়াসে আমি মুঠির ভিতরে পাই।

জ্ঞানী অজ্ঞানী বুঝি না কিছুই,—শত মণি জ্বলে বুকে,
বন্ধুর পথে বন্ধুর মত মেনে নিই ভুল চু'কে।

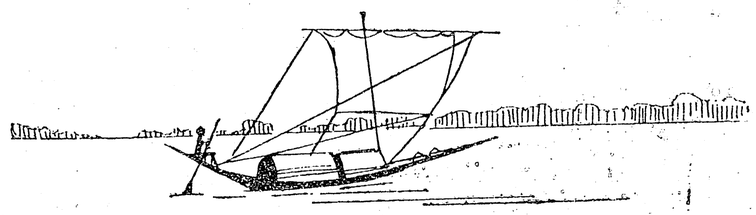

এবং তৎসংক্রান্ত ঘটনাবলীর সংখ্যাও সুপ্রচুর নহে। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিককে প্রধানতঃ তাঁহার নিজের মনের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে—নিজের মনের গতিবিধির অনুসরণ করিয়া চলিতে হইয়াছে। অপরের মনের খবর তিনি খুব কমই পাইয়াছেন। বাহ্য ফলাফলের বিচার করিয়া লোকের মনের গতি অনেকটা অনুমানে বুঝিয়া লইতে হইয়াছে। এই জন্য পদার্থ-বিজ্ঞান অপেক্ষা মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে নানা মুনির নানা মতের প্রাধান্য অপেক্ষাকৃত অধিক। তথাপি, ইহারই মধ্যে, যতটা সম্ভব, একটা সাধারণ নিয়ম খাড়া করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহার ফলে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। এ বিষয়ে চিকিৎসক সম্প্রদায়ের কার্য্যই সমধিক উল্লেখযোগ্য। মানুষের মনের গতিবিধির সন্ধান রাখিবার সুযোগ তাঁহারা যতটা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এতটা অপর কেহ নহে। মনের সুস্থ ও অসুস্থ উভয় অবস্থাই পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ তাঁহারাই অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এই রূপে মানসিক ক্রিয়ার ফলাফল পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়া প্রথমেই যে নিয়মটি আবিষ্কৃত হইল, সেটি—কার্য্য কারণের সম্বন্ধ। মানসিক ক্রিয়ার সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষানুভূতি জন্মিল, তাহাতে দেখা গেল যে, প্রথমে একটি কারণ উপস্থিত হইয়াছিল ; তাহার পর কার্য্যটি ঘটিল। ঠিক অনুরূপ অবস্থায় অন্যত্র কোন কারণ উপস্থিত হইতে দেখিলে বুঝিতে হইবে, কার্য্যটিও ঠিক ঘটিবে ; এবং যদি কার্য্যটিকে প্রত্যক্ষ করা যায়, তবে বুঝিতে হইবে—কারণটি পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়াছিল, তবে কার্য্যটি ঘটিয়াছে। এটি একটি সাধারণ নিয়ম। অবস্থার সমতা থাকিলে সর্ব্বত্রই কারণের পর কার্য্য, কিম্বা কার্য্যের পূর্ব্বে কারণ ঘটিবেই ঘটিবে। একটি শিশুর দৈবাৎ যদি কোন অঙ্গ পুড়িয়া যায় তবে সে আগুনকে ভয় করিতে শিখিবে। যখনই সে আগুনের সংস্পর্শে আসিবে, তখনই তাহার মনে অগ্নিভীতির উদয় হইবে—কখনই ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবে না। অবশ্য স্থলবিশেষে এইরূপ অভিজ্ঞতা মাত্রা অতিক্রম করিতে পারে ; কিন্তু সে সকল জটিল তত্ত্বের আলোচনা এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

মনের কার্য্য চারিটি—চিন্তা করা, ইচ্ছা করা, স্মরণ করা ও বিচার করা। মনের এই চারিটি ক্রিয়ার আমরা পরিচয় পাই—উহাদের ফলাফলের দ্বারা। অতএব বস্তুতান্ত্রিক কার্য্যের দ্বারা মনের পরিচয় লইতে হয়। অন্য কোন উপায়ে লইতে গেলে তাহা প্রথমতঃ হইবে—অবৈজ্ঞানিক ; দ্বিতীয়তঃ, তাহাতে ভ্রান্তি ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। প্রাচীনপন্থীদের মতে ইহাই মোটামুটি মনোবিজ্ঞানের মূল সূত্র।

কিন্তু সেকালের দার্শনিকরা ছিলেন অদ্ভুত শ্রেণীর জীব, এবং তাঁহাদের মতও ছিল অতি বিচিত্র। নানা মুনির নানা মত কথাটি চিরন্তন সত্য। সেইরূপ, নানা শ্রেণীর দার্শনিক মন এবং মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে নানা রকম মতের প্রচার করিতেন। Egoists (এগোয়িষ্টস) নামক এক শ্রেণীর দার্শনিক নিজের নিজের মন ব্যতীত অপরের মনের অস্তিত্বই স্বীকার করিতেন না। কারণ, নিজের দেহের ভিতর নিজের মনকে তাঁহারা বুঝিতেন, সে জন্য কোন প্রমাণের দরকার হইত না। কিন্তু অপরের দেহেও যে একটি করিয়া মন থাকিতে পারে এবং থাকে, তাহার প্রমাণ কৈ (! ! !) ?

সুখের বিষয়, এইরূপ এগোয়িষ্টদের সংখ্যা সেই সেকালেও অধিক ছিল না। সেকালেও এমন অনেক দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন, যাঁহারা কেবল নিজেদের নহে, অপরের মনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন ; এমন কি, পশুদের দেহেও মনের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিতেন না।

এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, ঈশ্বর-তত্ত্বানুসন্ধানই এই শ্রেণীর দার্শনিক-পণ্ডিতদিগের চরম উদ্দেশ্য। এবং এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তাঁহারা সকল দিক দিয়া মানব-মনকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রথমে তাঁহারা জড়-বস্তুর সহিত মানুষের মনের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন। তাহার পর তাঁহারা মনের কার্য্যপদ্ধতির এইরূপ বিশ্লেষণমূলক শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন ; যথা,—

১। অনুভূতি ও ধারণা (Sensation and Perception)।

২। সম্বিৎ ও অনুধ্যান (Consciousness and Reflection)।

৩। প্রমাণ (Testimony)।

অনুভূতি বলিতে এই বুঝায় যে, আমাদের দেহে অনুভূতির যে সকল ইন্দ্রিয় আছে, তাহাদের দ্বারা যে সকল ধারণা জন্মায়, সেই ধারণা মনের ভিতর সঞ্চালিত হইয়া বাহ্য বস্তুর গুণ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। অনুভূতি ও ধারণা পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট—অনুভূতির উৎপত্তি হইলেই সঙ্গে সঙ্গে একটা ধারণাও জন্মিয়া যাইবে। তবে একটা কথা—বস্তু সম্বন্ধে ধারণা যে সব সময়ে প্রকৃত হয়, তাহা নহে—কখনও কখনও ভ্রান্ত ধারণাও জন্মিয়া থাকে। কোন্ কোন্ অবস্থায় প্রকৃত ধারণা জন্মে, এবং অপ্রকৃত ধারণাই বা কোন্ কোন্ অবস্থায় জন্মিতে পারে, দার্শনিকরা তাহার বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া সে সকল আলোচনা পরিত্যাগ করা গেল।

মনের ভিতর যখন কোন চিন্তা বর্ত্তমান থাকে, তখন সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার নাম সম্বিৎ বা Consciousness। আর এই অবধানের ব্যাপারটা বিস্তৃতি লাভ করিলে অর্থাৎ অবধানতার সহিত চিন্তা করিতে থাকিলে, তাহাকে অনুধ্যান বা reflection বলা যায়। সম্বিতের অপর এক নাম চৈতন্য। চৈতন্য দুই প্রকার—জাগ্রত চৈতন্য বা Consciousness ; আর সুপ্ত চৈতন্য বা Subconsciousness। চৈতন্যের কাজ আমাদের জ্ঞাতসারে সম্পন্ন হয়—তাহাকে আমরা বুঝি। আর সুপ্ত-চৈতন্যের কাজ আমাদের অজ্ঞাতসারে সম্পন্ন হয় ; তাহা আমরা ভাল রূপ বুঝি না। তাহা অতি বিশৃঙ্খল ভাবেই হয়। (অথবা তাহার মধ্যে শৃঙ্খলা থাকিলেও, তাহা আমরা বুঝি না বলিয়া বিশৃঙ্খল বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।) অনুধ্যানের সহিত অতীত চিন্তাধারার সংযোগ থাকে ; আমরা বর্ত্তমান চিন্তাধারার সহিত অতীত চিন্তাধারা ও অভিজ্ঞতার তুলনা করি, বিচার-বিতর্ক করি। এই ভাবে আমরা উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করি ; এবং কোন্ পদ্ধতিতে মানসিক কার্য্য সম্পাদিত হয় তাহার একটা সাধারণ শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালী আবিষ্কারের চেষ্টা করি।

বহির্জগতের সম্বন্ধে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি, তাহার সমস্তটাই

আমাদের নিজ অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান নহে। আমাদের অর্জ্জিত জ্ঞানের অতি সামান্য অংশই আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা-লব্ধ ; অধিকাংশ জ্ঞানই অপরের নিকট হইতে প্রাপ্ত। পরের নিকট হইতে আমরা যে জ্ঞান সঞ্চয় করি, তাহা প্রমাণ-সাপেক্ষ। অপরের অভিজ্ঞতার দ্বারা আমাদের জ্ঞান বর্দ্ধন করিতে হইলে, প্রথমে, সেই অপরের সত্যপ্রিয়তা সম্বন্ধে আমাদের মনে বিশ্বাস থাকা আবশ্যক। তৎপরে, যেরূপ অবস্থায় ও যে সকল সুযোগের ফলে তিনি জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, ঐ অবস্থা ও সুযোগের যে জ্ঞানবিধায়িনী শক্তি আছে, তাহা আমাদের জ্ঞাত থাকা আবশ্যক। তাহার পর, তিনি পূর্ব্বে তাঁহার যে সকল অভিজ্ঞতার কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন, সেইগুলি যে সত্য তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়া থাকা আবশ্যক। এই এত কাণ্ডের পর তবে আমরা তাঁহার কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি। অতএব এইগুলি তাঁহার কথার সত্যতার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বা testimony। কোন অপূর্ব্ব-পরিচিত ব্যক্তির কথায় আমরা সহসা বিশ্বাস করিতে পারি না। সতর্ক ভাবে তাঁহার কথা বিচার করিয়া দেখিতে হয়—অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বা testimonyর দাবী করিতে হয়। যদি কাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কথা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তবে তাঁহার কথায় আমরা সহসা বিশ্বাস করি না ; কারণ তাঁহার কথার সত্যতার বিশ্বাস ও নির্ভর-যোগ্য প্রমাণ বা testimony নাই। প্রত্যক্ষ প্রমাণ বর্ত্তমান না থাকিলেও, আমাদের পূর্ব্বলব্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অনুযায়ী, বক্তার কথাগুলি সত্য হওয়া সম্ভব এরূপ একটা অনুভূতি বা ধারণা থাকিলেও আমরা অনেক সময়ে লোকের কথায় বিশ্বাস করিতে পারি। তথাপি, এ ক্ষেত্রে আমাদিগকে সতর্ক হইতে হয়, এবং তাহার উক্তির সমর্থনসূচক প্রমাণের প্রতীক্ষায় থাকিতে হয়।

মনের কার্য্য-পদ্ধতি এবং বাহ্যবস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ বিষয়ে আমরা কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিলাম। এইবার মনের কার্য্য কি কি তাহার আলোচনা করিয়া দেখিব। মনের কার্য্য প্রথমতঃ স্মরণ রাখা, স্মরণ করা। প্রথমটি হইতেছে স্মৃতিশক্তি (memory) এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে মনে মনে অতীত বিষয়ের আলোচনা (recollection)। এই দ্বিতীয় কার্য্যটি কিছু ব্যাপক ; কারণ, আমরা কেবল মানস-গোচর অতীত ঘটনাবলীরই আলোচনা করি না, ঐ সকল ঘটনার যে চিত্র আমাদের মানস-পটে অঙ্কিত হইয়া আছে, মনে মনে তাহা স্মরণ করিতে পারি, পূর্ব্বদৃষ্ট ব্যক্তিগণের চেহারা ও আচার ব্যবহার, কাজ-কর্ম্ম স্মরণ করি ; কোন স্থানে গিয়া থাকিলে তাহার দৃশ্যও আমাদের মনে থাকে, এবং তাহাও আমরা স্মরণ করিতে পারি। ইহাকে অনেক সময় মনের স্বতন্ত্র শক্তি ও স্বতন্ত্র কার্য্য বলা হয় ; কিন্তু স্মৃতিশক্তির সাহায্য না পাইলে এই কার্য্যটির স্ফুরণ হইতে পারে না ; সেইজন্য স্মৃতিশক্তি ও স্মরণ করাকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করাই উচিত।

মনের দ্বিতীয় কার্য্য এই—যেরূপ অবস্থায় কোন বস্তু সম্বন্ধে আমরা জ্ঞানলাভ করি, সেই অবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে আমরা বস্তুটির সম্বন্ধে বিচার-বিতর্ক করিতে পারি। এমন কি, বস্তুটির বিভিন্ন গুণের বিশ্লেষণ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারি ; বিভিন্ন বস্তুর তুলনা করিয়া কোন্ কোন্ গুণ তাহাদের মধ্যে সাধারণ তাহাও নির্ণয় করিতে পারি। এইরূপে আমরা বস্তু ও ঘটনা-সমূহের শ্রেণীর পর শ্রেণী বিভাগ করিতে পারি। মনের এই কার্য্যটির নাম তন্ময়তা বা একাগ্রতা (Abstraction)।

তৃতীয়তঃ, মনের কার্য্য ঘটনাসমূহের দৃশ্য বা শ্রেণীর মূল সূত্র আবিষ্কার করা ও বিশ্লেষণ করা। এবং সেই মূল সূত্রের অনুসরণ করিয়া মনে মনে নব নব—কিন্তু ভিত্তিহীন—ঘটনাবলীর সৃষ্টি করা। ইহার নাম কল্পনা (Imagination)।

চতুর্থতঃ, আমরা ঘটনাবলীর তুলনা করিয়া তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ ও সংস্রব নির্ণয় করিতে পারি। অপিচ, এইরূপে আমরা বস্তু সমূহের সাধারণ প্রকৃতি অবধারণ করিতে পারি। মনের এই কার্য্যটির নাম যুক্তি বা বিচার (Reason or Judgment)।

স্মৃতিশক্তি নির্ভর করে প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ের উপর—(১) অবধান (Attention), ও সাহচর্য্য (Association)। অবধানতার সহিত কোন কথা শুনিলে বা কোন কিছু দর্শন করিলে তাহা যে স্মরণ করিয়া রাখা যায় ইহা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন। আর সাহচর্য্যের ফল এই দাঁড়ায় যে, দুই বা ততোধিক ঘটনা একসঙ্গে বা ঠিক পরে পরে ঘটিলে তাহা মনে এমনভাবে মুদ্রিত হইয়া যায় যে, একটি ঘটনার কথা স্মরণ করিতে গেলে অপরটি বা অপরগুলি মনে না আসিয়া পারে না। কিম্বা সাহচর্য্যের ফলে চিন্তাধারা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে মনে ঠিক সেইভাবে উদিত হয় যেমন ভাবে যে শৃঙ্খলাক্রমে ঘটনাগুলি ঘটিয়াছিল। এমন কি, একটি ঘটনার কথা মনে হইতে তাহার সদৃশ অন্য ঘটনার কথাও মনে হয়। ইহাও সাহচর্য্যের ফল। আমরা ইচ্ছা না করিলেও বা মনোযোগ না দিলেও এরূপ চিন্তাধারার আবির্ভাবে বাধা ঘটে না। যখন লোকে চিন্তামগ্ন হয়, তখন প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক কত কথাই যে মনে আসে তাহার মাথামুণ্ড কিছুই স্থিরতা থাকে না।

সাহচর্য্য তিন প্রকার—

১। স্বাভাবিক বা দার্শনিক সাহচর্য্য (Natural or Philosophical Association)।

২। স্থানীয় বা প্রাসঙ্গিক সাহচর্য্য (Local or Incidental Association)।

৩। যথেচ্ছ বা কাল্পনিক সাহচর্য্য (Arbitrary or fictitious Association)।

এই তিনটি বিষয়ের আলোচনা করিতে গেলে মনের অনেক অভিনব অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই সকল অবস্থা দুই বা ততোধিক ঘটনা, চিন্তা বা বস্তুর উপর নির্ভর করে, যাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ থাকা অনিবার্য্যও নয়, থাকেও না ; তাহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয় হইলেও ক্ষতি নাই, এবং প্রায় তাহাই হইয়া থাকে। কেবল মনের

ভিতর তাহারা একসঙ্গে উপস্থিত হইয়া পরস্পরের সঙ্গে সংশ্রব স্থাপন করিয়া গোলমাল বাধায়।

সকলের স্মৃতিশক্তি সমান নহে। বিশেষতঃ প্রাচীন ও শিশুদিগের স্মৃতিশক্তি কিছু দুর্ব্বল। কিরূপে স্মরণশক্তি বর্দ্ধন করা যায়, মনোবৈজ্ঞানিকরা তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যে উপায়ে প্রাচীন ব্যক্তিগণের স্মরণশক্তি বর্দ্ধিত হইতে পারে,—শিশুগণের স্মরণশক্তি বর্দ্ধনের উপায় তাহা হইতে বিভিন্ন। মনোবৈজ্ঞানিকরা বিস্তৃতভাবে এই দুই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া তদালোচনায় বিরত রহিলাম।

শিশু ও প্রাচীনগণের স্মরণশক্তি স্বাভাবিক কারণে দুর্ব্বল হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত, আর এক প্রকারে, শিশু, বৃদ্ধ এবং পূর্ণ-বয়স্ক সকল শ্রেণীর লোকের স্মরণশক্তির দৌর্ব্বল্য ঘটিতে পারে। সেটি শারীরিক অসুস্থতা। মস্তকে আঘাত লাগিলে, মস্তিষ্ক পীড়িত হইলে, জ্বরে, কিম্বা শারীরিক অতিরিক্ত দুর্ব্বলতার দরুণ স্মৃতিক্ষীণতা ঘটে। অতিমাত্রায় মাদক বা ইন্দ্রিয়-সেবা স্মরণশক্তিক্ষীণতার অপর এক কারণ। ইহাদেরও বিস্তৃত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

অবধানের ঠিক বিপরীত অবস্থা অন্যমনস্কতা বা অনাবিষ্টতা (abstraction)। আবার Abstraction অর্থে, বস্তু সকলের গুণাবলীর বিশ্লিষ্টভাবে আলোচনাও বুঝাইতে পারে। পূর্ব্বে ইহাকে তন্ময়তা বা একাগ্রতা বলা হইয়াছে। ইহাতে অবশ্য পূর্ব্বের সংজ্ঞার সহিত বর্ত্তমান সংজ্ঞার কোন বিরোধ ঘটিতেছে না। কারণ কেহ যখন নিবিষ্টচিত্তে কোন বিষয় চিন্তা করে বা কোন কার্য্য করে, তখন স্বভাবতই সে অপর সকল চিন্তা বা কার্য্যে অনাবিষ্ট হইয়া পড়ে। Abstraction মনের একটা স্বতন্ত্র কার্য্য কি না, সে বিষয়ে মনোবৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে।

মনের আর একটি কার্য্য—কল্পনা-কুশলতা বা কল্পনা-প্রবণতা (Imagination)। ইহার সাহচর্য্যে মন অনেক অবাস্তব, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শ বস্তু বা বিষয়ের সৃষ্টি করিতে পারে। কল্পনাপ্রবণতা চিত্রশিল্পী, কথা-সাহিত্যিক ও কথাশিল্পী বা কবির প্রাণ।

মনের শেষ ক্রিয়া—যুক্তি বা বিচার (Reason or Judgment)। মনের যে ক্রিয়ার দ্বারা আমরা বস্তু বা বিষয় সকলের পরস্পরের সহিত তুলনা করিতে পারি এবং বাহ্যবস্তুসমূহের সম্বন্ধে মনের মধ্যে একটা সুসঙ্গত ধারণা জন্মাইতে পারি—তাহাই যুক্তি বা বিচার। যুক্তির প্রয়োগ এইভাবে করিতে হয়—

আমরা যুক্তি প্রয়োগ করিয়া বিষয়সমূহের পরস্পরের সহিত তুলনা করি ও তদ্দ্বারা তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ, সংযোগ এবং প্রবণতার অনুসন্ধান করি। তৎপরে যে সকল সম্বন্ধ স্থায়ী ও সমান ভাবের, সেইগুলি হইতে আপেক্ষিক (incidental) সম্বন্ধ গুলি পৃথক করিয়া ফেলি।

বস্তু সকলের পরস্পরের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে? প্রথমতঃ তাহাদের লক্ষণ বা প্রকৃতিগত সম্বন্ধ। যে সকল লক্ষণ দ্বারা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করা যায়, তাহাই তাহার প্রকৃতি। একাধিক বস্তুর মধ্যে এই প্রকৃতিগত সাম্য বা বৈষম্য ঘটিতে পারে। এবং ইহারাই মনের বিচার্য্য বিষয়। প্রকৃতি, লক্ষণ ব্যতীত, চিহ্ন, গুণ প্রভৃতিও বিচারের বিষয়ীভূত হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কোন বৃক্ষের উদ্ভিদ-বিজ্ঞান-ঘটিত গুণনিচয়, কোন খনিজ পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম্ম, রোগ বিশেষের লক্ষণ, কোন বস্তুর অনুভূতিযোগ্য বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ প্রভৃতি; ব্যক্তিবিশেষের মানসিক সম্পদ, নৈতিক চরিত্র ইত্যাদি।

তাহার পর আকৃতিগত সম্বন্ধ, বস্তু সকলের মধ্যে সাধারণ গুণ বা ধর্ম্ম, উহাদের গঠনমূলক সম্বন্ধ; কারণগত সম্বন্ধ, পরিমাণ ও অনুপাতমূলক সম্বন্ধ প্রভৃতি যুক্তি-সঙ্গত তুলনার দ্বারা নির্ণয় করা মনের কার্য্য। এইরূপ আরও নানা ক্ষেত্রে যুক্তির প্রয়োগ করা যায়। ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতারা মনের এই বিচার-শক্তিকে আরও দুই ভাবে প্রয়োগ করেন; যথা, (১) সত্যানুসন্ধান, এবং (২) নিজ আচরণকে নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত করা। এখানে সত্যানুসন্ধান বলিতে ঈশ্বরতত্ত্ব এবং সংযম বলিতে ঈশ্বরতত্ত্বানুসন্ধানের সুবিধা হইবে এমন ভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করা বুঝিতে হইবে। ঈশ্বর-তত্ত্বানুসন্ধান কালে যে সকল বিষয় লইয়া যুক্তি-তর্কের সহায়তা গ্রহণ করিতে হয় তাহাতে ভ্রমপ্রমাদ ঘটিতে পারে (Fallacies in facts); এবং সিদ্ধান্তগুলিও নির্ভুল না হইতে পারে (Fallacies in Induction)। এমন কি যুক্তি-তর্কের প্রণালীও ভ্রমপূর্ণ হইতে পারে (False Reasoning)। কিরূপে এই সকল ভ্রান্তির নিরসন করিয়া সত্য-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়, সেইজন্য লজিক বা তর্কশাস্ত্র বা ন্যায়শাস্ত্র নামে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রই রচিত হইয়াছে।

বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে মনে অনেক সময় ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। যুক্তি দ্বারা বিচার করিয়া দেখিলে অনেক সময়ে এই ভ্রান্তি ধরা পড়ে, এবং ভ্রান্ত ধারণা সংশোধিত হয়। মনের এমন শক্তি আছে যে, সুদূর অতীত কালে সংঘটিত কোন ঘটনার বিবরণ কিম্বা দৃশ্যের চিত্র মন স্মরণ করিতে পারে; এবং চিন্তাশক্তির পরিচালনা করিয়া মনে মনে ঐ বিবরণের পুনরাবৃত্তি করিতে পারে, মানস-পটে ঐ দৃশ্যের চিত্র প্রতিফলিত করিতে পারে। মনের এই শক্তিটির নাম দেওয়া হইয়াছে—ধারণাশক্তি (conception)। আবার মনের এমন ক্ষমতাও আছে যে, এই সকল ঘটনার মিশ্রণ ও অদল-বদলের দ্বারা মনে মনে নূতন ঘটনা বা দৃশ্যের সৃষ্টি করাও যায়; অথচ, এই ঘটনা বা দৃশ্য বাস্তব নহে—সম্পূর্ণরূপে কল্পিত। পূর্ব্বে আরও দেখা গিয়াছে যে, সাহচর্য্যের দ্বারা বহুকাল পূর্ব্বে বিস্মৃত ব্যক্তি, ঘটনা বা দৃশ্য স্মরণ-পথে আসিয়া পুনরুদিত হয়। সে সময়ে নানা চিন্তাধারা মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এই সকল চিন্তা কেমন করিয়া যে মনে আসিয়া উদিত হয় তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। এইরূপে চিন্তা করিতে করিতে এমন অনেক কথা মনে পড়ে, যে সকল বিষয়ে বহু কাল ধরিয়া কোনরূপ মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। মনে যখন এইরূপ চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে, তখনকার মনের অবস্থাকে ঠিক সক্রিয় অবস্থা বলা চলে না; বরং তাহাকে নিষ্ক্রিয় অবস্থাই বলিতে হইবে। মনের অলস অবস্থাতেই এইরূপ উদ্দেশ্যহীন

চিন্তার উদয় হয়। মন যখন কোন বিশেষ বিষয়ে নিবিষ্ট থাকে তখন এইরূপ চিন্তার উদয় খুব কমই হয়।

কোনরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী ধারণা অথবা সাহচর্য্য কিম্বা কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট হইয়া এইরূপ চিন্তাধারা যখন মনের ভিতর সঞ্চালন করে তখন মনে হয়, চিন্তার বিষয়ীভূত বস্তু বা ঘটনাগুলি যেন সত্য সত্যই মনশ্চক্ষের সমক্ষে ঘটিয়া যাইতেছে অথবা বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু জীবনের বাস্তব নিত্য-স্রোতে মন আকৃষ্ট হইলেই ঐ কাল্পনিক দৃশ্যাবলী তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়। এই কার্য্যটি হয় মনের যুক্তি-শক্তির দ্বারা—বহির্জগতের বাস্তব অবস্থার সহিত কাল্পনিক দৃশ্যাবলীর তুলনার দ্বারা। কবি যখন কাব্য রচনা করেন, ঔপন্যাসিক যখন তাঁহার উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার চরিত্র-সৃষ্টি করিতে নিযুক্ত থাকেন, অভিনেতা যখন একাগ্রচিত্তে কোন নাটকীয় চরিত্রের ভূমিকার অভিনয় করিতে থাকেন, তখন যিনি যে বিষয়ের চিন্তায় নিযুক্ত থাকেন, সম্ভবতঃ সে সময়ে তিনি তাঁহার সৃষ্ট বস্তু, ব্যক্তি বা বিষয়ের সহিত এমন ভাবে মিশিয়া যান, যেন সেই সকল বিষয়, ব্যক্তি বা বস্তু মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। আর সেই অবস্থায় তিনি তাঁহার রচিত চিত্রের অনুযায়ী বিচার করেন, কথা কহেন বা কার্য্য করেন। ইহাকেই আমরা বলি—কল্পনা। কিন্তু বাস্তব জীবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পরও যদি ঐ কাল্পনিক দৃশ্য অন্তর্হিত না হয়, তিনি যদি তাঁহার কাল্পনিক মূর্ত্তির অনুযায়ী কাজ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে উন্মাদ রোগগ্রস্ত বলিতে হয়।

এখানে মনের যেরূপ অবস্থার বর্ণনা করা যাইতেছে, সেরূপ অবস্থা বাস্তবিকই ঘটে—কাল্পনিক দৃশ্য বা ধারণা বাস্তব বলিয়াই প্রতীয়মান হয়; বাহ্য বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়াও মন তাহার কাল্পনিক দৃশ্য দূর করিতে সমর্থ হয় না—যুক্তি তখন মনের এই অবস্থার সংশোধন করিতে অপারগ হয়। মনের দুইটি অবস্থায় এই ব্যাপারটি স্পষ্টভাবে ঘটে—(১) উন্মত্ত অবস্থায় ও (২) স্বপ্নে। মানসিক ক্রিয়া হিসাবে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা অত্যন্ত অধিক। পার্থক্যের মধ্যে কেবল এইটুকু যে, উন্মত্ত অবস্থায় মনে যে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়া থাকে তাহা স্থায়ী এবং তাহা রোগীর আচরণের উপর বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করে। আর স্বপ্ন-দৃষ্ট ব্যাপার কিয়ৎক্ষণের জন্য সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও চরিত্রের উপর কোন প্রভাব পড়ে না; কারণ, জাগ্রত হইবার পর স্বপ্ন মিলাইয়া যায়—তাহার কোন বাস্তব চিহ্ন থাকে না। পক্ষান্তরে, মন যখন কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তখনকার মানসিক অবস্থা এবং উন্মাদ রোগগ্রস্ত অবস্থা বা স্বপ্নাবস্থার মধ্যেও রীতিমত পার্থক্য ঘটে। কল্পনাপ্রবণ অবস্থায় মনে যে সকল চিত্র উপস্থিত হয়, তাহা আমাদের ইচ্ছাকৃত, চেষ্টাকৃত; ইচ্ছা করিলেই তাহার পরিবর্ত্তন করা যায় কিম্বা একেবারে মন হইতে দূরীভূত করা যায়। কিন্তু শেষোক্ত দুই অবস্থায় (উন্মাদ ও স্বপ্ন) মানসিক চিত্র পরিবর্ত্তিত করিবার বা দূরীভূত করিবার শক্তি নিষ্ক্রিয় থাকে। সে সময়ে যে চিন্তাস্রোত মনের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়, মন তাহার অধীন হইয়া পড়ে। ইচ্ছা করিলেই তাহাদের পরিবর্ত্তন বা দূরীকরণ সম্ভবপর নহে। এমন কি, এরূপ ইচ্ছা করাও সম্ভব হয় না। এই চিন্তাধারা পূর্ব্ববর্ত্তী সাহচর্য্য হইতে উদ্ভূত। সাহচর্য্যজাত বিবিধ বিষয় নানা ভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত থাকিয়া বহু নূতন ও অদৃষ্টপূর্ব্ব, অপ্রত্যাশিত চিত্রের সৃষ্টি করে। চিত্রগুলি এমন ভাবে আসিয়া উপস্থিত হয় যে আমরা তাহার মূল অনুসন্ধান করিয়া পাই না, কিম্বা তাহার কোন সঙ্গত ও সম্ভবপর কারণও নির্দ্দেশ করিতে পারি না।

স্বপ্ন যখন দেখা যায় তখন অনুভূতিমূলক ইন্দ্রিয়গুলি এমন নিষ্ক্রিয় ভাবে থাকে যে, বহির্জগতের কোন ভাবের ছাপ তাহাতে পড়ে না। মনের প্রভাবে আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। স্বপ্নাবস্থায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর মনের প্রভাব স্থগিত থাকে,—কোন কার্য্য করে না। তবে অবশ্য স্থলবিশেষে ইহার একটু আধটু ব্যতিক্রমও যে ঘটে না তাহাও নহে। কারণ, স্বপ্নাবস্থায় লোককে ক্রন্দন করিতে, ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিতে, কিম্বা হাত-পা ছুঁড়িতেও দেখা যায়। কিন্তু এই সকল কার্য্য মনের ইচ্ছানুসারে কিম্বা জ্ঞাতসারে সম্পন্ন হয় না।

উন্মাদ অবস্থায় কিন্তু দৈহিক অনুভূতিগুলি সজাগ থাকে, বহির্জগতের ভাবের ছাপ তাহাদের উপর পড়িতে কোন বাধা ঘটে না। তখন তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনও মনের প্রভাবেই সম্পন্ন হয়। তবে সে সকলই ভ্রান্তিপূর্ণ। ভ্রান্ত ধারণা বশতঃ উন্মাদ রোগী তখন এমন কাজ করে কিম্বা এমন ব্যবহার করে, যাহা সে স্বাভাবিক অবস্থায় কখনই করিতে পারিত না—কোন মানুষই স্বাভাবিক অবস্থায় যাহা করিতে পারে না—এবং যাহাতে সে ব্যক্তি জনসাধারণের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠে।

উন্মাদ ও স্বপ্নাবস্থার মাঝামাঝি অবস্থা স্বপ্ন-সঞ্চরণ (Somnambulism)। এই বিষয়টি এখানে অপ্রাসঙ্গিক এবং আমাদের আলোচ্য নহে। কেবল এইটুকু বলা যায় যে, এই অবস্থায় দেহের অনুভূতিগুলি আংশিক ভাবে জাগ্রত থাকে, এবং বহির্জগতের সঙ্গে অল্প কিছু সম্পর্ক থাকে।

(ক্রমশঃ)

বৈষ্ণব কাব্যের রসধারা

শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

এই প্রবন্ধের ভিতর আমি বৈষ্ণব কাব্যের বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করি নাই। বৈষ্ণব কাব্যের মধ্যে যে রসানুভূতি আমি উপলব্ধি করিয়াছি তাহাই সুধিজন সমক্ষে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

বৈষ্ণব কাব্য বাংলা ভাষার এক অমূল্য সম্পদ। যখন বাংলা সাহিত্যের তরুণ অবস্থা, তখনই বৈষ্ণব কাব্য বাংলা সাহিত্যে এমন এক স্থানে আসন গ্রহণ করিয়া বসিল, যাহার বিচার সেদিনও কেহ করিতে পারে নাই, আজও কেহ পারিল না এবং কোন দিনও পারিবে কি না সন্দেহ;—এতই উচ্চে ইহা স্থান গ্রহণ করিয়াছে। ইহার ভাব-মাধুর্য্য তাৎকালিক সুধিজনকে তো মোহিত করিয়াই ছিল; এখনও ইহার রস-সৃষ্টির বৈচিত্র্য দেখিলে মুগ্ধ হয় না এমন ব্যক্তি বোধ হয় নাই বলিলেও চলে।

বাংলা দেশে এক সময়ে ধর্ম্মে ও সাহিত্যে এমন এক যুগ আসিয়াছিল, যখন বৈষ্ণব ধর্ম্মের মত ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব কাব্যের মত সাহিত্যের প্রয়োজন

হইয়া পড়িয়াছিল। এই ধর্ম ও সাহিত্য লোকের মনকে এতদূর বশীভূত করিয়াছিল যে, ইহা এখনও অমর হইয়া রহিয়াছে।

সকল ধর্মই এবং সকল সাহিত্যই নীরস তত্ত্ব ও নীরস বস্তু বিচার লইয়া আলোচনা করিয়াছে বলিয়া এমন করিয়া লোকের মনের মধ্যে দাগ দিতে পারে নাই, যেমন করিয়া দাগ দিয়াছে বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্য।

ধর্মের জন্য বৈষ্ণব সাহিত্য কতখানি কি করিয়াছে তাহা দেখান আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার তো মনে হয় ধর্মের দিক ছাড়িয়া দিয়াও বৈষ্ণব কাব্যকে এত ভাল লাগে এইজন্য যে, ইহা একেবারে জীবনের চিরন্তন মূল ব্যাপার লইয়া রচিত। প্রেম, বিচ্ছেদ, মিলন,—যাহা মানুষের জীবনে নিত্য ঘটমান তাহার মধ্য দিয়াই বৈষ্ণব কবিরা সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছেন বলিয়াই বৈষ্ণব সাহিত্য এত মধুর ও প্রাণস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে।

অন্য সব ধর্মতত্ত্ব শুধু ঐশ্বর্য্যজনিত ভক্তি ও জ্ঞানমার্গের উপর প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত সম্বন্ধকে বড় করিয়া লইয়া ধর্মকে গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া ধর্মও প্রাণস্পর্শী হইয়াছে এবং ধর্মগ্রন্থও সাহিত্য হিসাবে গণ্য ও চিরস্থায়ী হইয়াছে। আর সেইজন্যই বৈষ্ণব গ্রন্থ ভিন্ন অন্য কোন ধর্মগ্রন্থই সাহিত্যে স্থান পায় নাই,—তাহারা দূরে থাকিয়া ভক্তির জিনিষ হইয়াছে কিন্তু প্রাণের জিনিষ হইতে পারে নাই।

বৈষ্ণব কাব্যের বিষয়-নির্ব্বাচনও অনির্ব্বচনীয়। সত্যকারের যে কাব্য তাহার ভিতর আমরা বস্তুর অন্বেষণ করি না,—অন্বেষণ করি বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্য্য, অরূপতা এবং কল্পনার প্রসারতা। সাহিত্য-দর্পণকার কাব্যের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং" অর্থাৎ রসই কাব্যের একমাত্র উপজীব্য। বৈষ্ণব কাব্যের ভিতর এই রস-সৃষ্টি অনবদ্য রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সুন্দরের অঙ্গনে জীবাত্মার লীলাভিসারই তাহার আনন্দরূপকে প্রকাশিত করে। বৈষ্ণবের লীলাবলিও এই উক্তির সমর্থন করে। বৈষ্ণবের ধর্ম রসের ধর্ম—নীরস তত্ত্বের ধর্ম নয়, বৈষ্ণব কাব্য-দর্শনে লীলার স্থান তাই এত উচ্চে।

যেখানে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ নাই সেখানে আবেগের তীব্রতা কোথায়? কাজেই আনন্দের অংশও তাহার মধ্যে অত্যন্ত কম। এই কারণেই বৈষ্ণব কবিরা ভগবানের সহিত নানা রূপ সম্বন্ধ পাতাইয়া মানবীয় প্রেমের ভিতর দিয়াই তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন ও তাঁহাকে পাইতে চাহিয়াছেন।

ইহার ভিতর আবার সকল সম্বন্ধ হইতে কান্তা-প্রেমের সম্বন্ধকেই তাঁহারা সব হইতে উচ্চে স্থান দিয়াছেন। তাহার কারণ এই অনুমান হয় যে, অন্য সম্বন্ধে পরস্পরের নৈকট্যকে তত বেশী ঘনিষ্ঠ ভাবে আকর্ষণ করে না, একটুখানি সংযমের ব্যবধান রাখিয়া দেয়; কিন্তু কান্তা-প্রেমের সম্বন্ধ বর্ষার দুকুল-প্লাবনী জলধারার মত কোথাও কোন বাধা রাখে না,—না মনে, না ব্যবহারে,—একেবারে প্রাণের ভিতরকার জিনিষ করিয়া তোলে। সেইজন্যই বৈষ্ণব কবিরা কান্তা-প্রেমকে বড় করিয়া দেখিয়া তাহার মধ্যেই ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইয়া লইয়াছেন। ইহাও গভীর রসানুভূতির প্রকৃষ্ট পরিচয়। এই ভাব হইতেই রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

আর পাবো কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

আবার এই কান্তা-প্রেমের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতেও বৈষ্ণব কবিরা কতখানি অনুভব-শক্তির প্রকাশ দেখাইয়াছেন, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। অনুরাগ মানবের কাছে বড়ই মধুর। সামাজিক প্রেমও মধুর, কিন্তু সামাজিক প্রেম সহজ-লভ্য বলিয়া তাহার ভিতর গাঢ় রসমাধুর্য্য নাই, বা রস-সৃষ্টির বৈচিত্র্য নাই। স্বকীয়া প্রেমের ভিতর প্রেমের মর্য্যাদাই আছে শুধু; কিন্তু প্রেমের সদাই-হারাই-হারাই-ভাবের মাধুর্য্য নাই বলিয়া বৈষ্ণব কবিরা পরকীয়া প্রেমানুরাগকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন—

চৌরি-পিরিতি হোয় লাখ গুণ রঙ্গ।

কারণ এর তুল্য ত্যাগ, আত্মদান বা আত্মনিবেদন অন্য কোন অনুরাগেই হয় না। কিন্তু বৈষ্ণবের যে পরকীয়া ভালবাসা তাহা পার্থিব-ভাব-বর্জ্জিত। ইহার ভিতর লালসার গন্ধ নাই। নিজের সুখের জন্য যাহা কিছু কামনা তাহাই কাম, কিন্তু বৈষ্ণবের যে আত্মদান বা আত্মনিবেদন তাহার ভিতর আত্মসুখেচ্ছা নাই; তাই ইহা কামশূন্য। এই যে আত্মদান বা আত্মনিবেদন ইহা পরম প্রেমাস্পদের জন্য, দয়িতের সুখের জন্য। নিজেকে সর্ব্বতোভাবে প্রেমাস্পদের সুখের জন্য দান করিবার এই যে আকাঙ্ক্ষা ইহা কামলেশশূন্য। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, বৈষ্ণব কবিতা পাঠের পর মনের ভিতর কোন কলুষতার চিহ্ন থাকে না। এই যে অনুরাগের প্রেরণা, ইহা বুদ্ধিগত নয় ভাবগত—কাজেই ইহকাল পরকাল কুলশীল ধর্মাধর্ম কোন দিকেই লক্ষ্য থাকে না। অনুরাগের মধ্যেই পরম প্রেমাস্পদের সহিত মিলন হয়।

শ্যাম ও রাধার অনুরাগের যে ছবি তাঁহারা আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবসম্পদে অমূল্য। এই শ্যাম ও রাধাকে দেবতার বা শ্রেষ্ঠ মানবের প্রতীক রূপে কল্পনা করিলে, আমার মনে হয়, বৈষ্ণব কাব্যের রস সৌন্দর্য্যকে খর্ব্ব করা হয়। এই যে শ্যাম ও রাধা ইহা তো প্রেমের প্রতীক মাত্র, কোন বস্তুর বা ধর্মের প্রতীক তো নয়। ইহার মধ্যে যদি সেই বৃন্দাবন নামক বিশেষ কোন স্থানের রাধাকৃষ্ণকে খুঁজিতে যাই, তাহা হইলে ইহার রসমাধুর্য্যের হানি হইবে। ইহা মনোবৃন্দাবনের শাশ্বত প্রেম-লীলা মাত্র।

এই শ্যামসুন্দরের চিরন্তন প্রেমের বাঁশী চিরদিন বাজিয়াছে। এক-একজন এক এক ভাবে তাহা শুনিয়াছে এবং তাহার অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের ভিতর শ্রীরাধাও আছেন, আবার জটিলা কুটিলাও আছে। শ্রীরাধা সেই বাঁশীর সুরের অনুরাগী, আর জটিলা কুটিলা বিরাগী। শ্যামসুন্দরের এই যে বাঁশীর সুর ইহাই তো শাশ্বত প্রেম। প্রেমের পরশ শ্রীরাধাই অনুভব করেন, জটিলা কুটিলা তাহার ছায়া মাড়ায় না। তাহাদের সে ক্ষমতা নাই। শ্রীরাধা সেই প্রেমের অন্তর

আর শ্যাম তাহার বাহির। দুয়ের মিলনেই প্রেমের পরিণতি। ইহাই বৈষ্ণব কবির কাব্যের মূল রসানুভূতি।

এই জন্যই বৈষ্ণব কবিরা পরকীয়া প্রেমকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিয়া, তাহার ভিতর দিয়াই মিলন, বিচ্ছেদ, বিরহের নানা রসের অবতারণা করিয়াছেন। বৈষ্ণব কাব্যের মূল সূত্রই হইতেছে ভালবাসা। যাহাকে আমি ভালবাসি, ইচ্ছা হয় যুগে যুগে জীবনে মরণে তাহার সঙ্গে প্রেম-ডোরে বাঁধা থাকি। থাকা সম্ভব কি না সে বিচার কাব্যের নয়;—মানব-হৃদয়ের চিরন্তন আবেগের অভিব্যক্তিই কাব্য। তাই বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

এই যে ভোগ করিবার, একান্ত করিয়া গ্রহণ করিবার আকাঙ্ক্ষা, ইহাই তো নিত্য সত্য। তাঁহারা যেমন অরূপের ভিতর রূপের খোঁজ করিয়া বেড়াইয়াছেন, তেমনি রূপের ভিতরও অরূপের সন্ধান পাইয়াছেন।

সকল রসের সার পিরিতি, এ কথা বৈষ্ণব কবিরা যেমন করিয়া বুঝিয়াছিলেন তেমন করিয়া বোধ করি আর কেহই বোঝেন নাই। সেইজন্যই বোধ হয় চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

সই পিরিতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে জনমে জনমে
কি সুখ জানয়ে তারা॥

কিন্তু প্রেম করিতে যাইলেই যে বিরহ বিচ্ছেদ বাধা রূপে আসিবে, এ কথাও তাঁহারা ভোলেন নাই। আর তা ছাড়া বিরহ বিচ্ছেদ আছে বলিয়াই তো প্রেম এত মধুর হইয়া উঠে।

যত্ন করি রুপিলাম অন্তরে প্রেমের বীজ
নিরবধি সিঁচি আঁখি-জলে।

প্রেমের বীজকে অঙ্কুরিত করিতে হইলে যে আঁখি-জলের প্রয়োজন, এ কথাও কোথাও তাঁহারা ভুলিয়া যান নাই। তাই আবার কবি বলিয়াছেন—

কেবা নিরমিল প্রেম-সরোবর
নিরমল তার জল।
দুখের মকর ফিরে নিরন্তর
প্রাণ করে টল মল॥

* * * *

কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনি
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পিরিতি
দুখ যায় তার ঠাঞি॥

প্রেমের ভিতর যে সুখানুভূতি তাহা দুঃখের ভিতর দিয়াই লাভ করিতে হয়। দুঃখের আগুনের ভিতর দিয়া যাইয়াই তো সুখের মাধুর্য্য অনুভব করিতে হয়। তেমনি প্রেমের পরিপূর্ণতা হয় তখনই, যখনই বিরহ-বিচ্ছেদের ভিতর দিয়া প্রেমাস্পদকে লাভ করা যায়, অথবা বাহ্যিক জীবনে লাভ করা যায় না, কেবলমাত্র ভাবসম্মিলনে তাঁহাকে অন্তরে অনুভব করা যায়।

পিরিতি করিতে হইলে জাতি-কুলশীল অভিমান সব ত্যাগ করিতে হয়। স্বার্থশূন্য নিষ্কাম যে প্রেম তাহাই তো শ্রেষ্ঠ।

নয়ন-পুতলী করি লইলুঁ মোহনরূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরিতি আগুনি জ্বালি সকলি পোড়াইয়াছি
জাতি কুল শীল অভিমান॥

সেই মোহন রূপের উপলব্ধি করিতে, পিরিতি-রূপ আগুনে সকল কামনা বাসনাকে পোড়াইয়া খাঁটি করিয়া তবে তাঁহাকে পাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এত বড় ত্যাগের কথা বিশ্বসাহিত্যে অল্পই আছে।

এইবার বৈষ্ণব পদাবলী হইতে কয়েকটি পদের নমুনা দেখাইয়া বৈষ্ণব কাব্যের অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশ দেখাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীরাধা বিরহে ঘরের ভিতর থাকিতে পারিতেছেন না। কখন প্রেমাস্পদের সহিত মিলিত হইবেন তাহারই জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছেন। এই দৃশ্যটি কত সহজভাবে সাধারণ কথায় কবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন,—

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শত বার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায়॥

এই ঘটনা ও বর্ণনা কত সহজ সরল; কিন্তু পড়িলেই সেই বিরহিণীর মিলন-চঞ্চল মূর্ত্তিখানি চোখের উপর ভাসিয়া উঠে। আবার এই বিরহ হইতে শ্যামসুন্দরও বাদ পড়েন নাই—

মাধবী-লতা-তলে বসি।
চিবুকে ঠেকনা দিয়া বাঁশী।
তোহারি করিত অনুমানে॥

এটি পড়িলেও বিরহ-বিধুর শ্যামসুন্দরের মিলনাকুল মূর্ত্তিটি সহজে চোখের উপর ভাসিয়া উঠে। কত সহজে অবস্থার বর্ণনা।

এখন তখন করি দিবস গোঙায়লুঁ
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিখ গোঙায়লুঁ
ছোড়লুঁ জীবনক আশা॥

দীর্ঘ বিরহে দিন গুণিয়া গুণিয়া শ্রীরাধা সকল আশা ভরসা ছাড়িয়া দিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। ক্ষীণাঙ্গীর বিরহ-কাতর তনুদেহখানি শ্যামবিরহে যে কত কাতর তাহা এই পদের কয়েকটি কথাতেই কবি ব্যক্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

শ্রীরাধা চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহার চলিষ্ণু রূপবর্ণনায় কবি কি সুন্দর উপমার সৃষ্টি করিয়াছেন,—

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ি তনু তনু-জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চলু চলই।
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই॥

* * * *

যাঁহা যাঁহা ভঙ্গুর ভাঙ্ বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দি হিলোল॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পড়ই।
তাঁহা তাঁহি নিল-উৎপল ভরই॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ-কুমুদ পরকাশ॥

চলিষ্ণু সৌন্দর্য্যের আর একখানি অপরূপ চিত্র পাঠক চিত্তে চিরমুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন কবি চণ্ডীদাস তাঁহার লোক-প্রসিদ্ধ কবিতার একটি অনবদ্য চরণে,—"চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর।" নীলবসনা রূপসীর প্রত্যেক পদ-পাতে বাসনার কমল ফুটিয়া ফুটিয়া চলিয়াছে।

শ্রীরাধা ও শ্যামের রূপবর্ণনাতেও কবি মুখর হইয়া উঠিয়াছেন। শ্রীরাধা পূজার জন্য ফুল চয়ন করিতেছেন, তাহা দেখিয়া কবি বলিতেছেন—

কাননে কুসুম তোড়সি কাহে গোরী
কুসুমহি নিরমিত সব তনু তোরী।

* * * *

গোবিন্দ দাস অতয়ে অনুমান
পূজহ পশুপতি নিজ তনু দান॥

শ্রীরাধার কুসুমপেলব সুন্দর দেহখানিই ফুলের মত। দেবপূজার জন্য পুষ্প-চয়নের আবশ্যকতা কি? সুন্দর জিনিষই দেবভোগ্য। অতএব গোবিন্দ-দাস বলিতেছেন, হে গৌরাঙ্গী, তোমার নিজের সুন্দর তনু দান করিয়াই দেবপূজা করো। পূজার উপচার তো বাহ্যিক ধর্মাচরণ, অন্তরের পূজাই তো আসল পূজা। অতএব নিজের দেহ মন দিয়া পূজা সার্থক কর, এই বোধ করি কবির বলিবার উদ্দেশ্য।

যব,—গোধুলি সময় বেলি
ধনি—মন্দির বাহির গেলি।
নব জলধর বিজুরি—রেহা
দন্দ পসারি গেলি॥

শ্রীরাধা প্রেমাস্পদের উদ্দেশে অভিসার-যাত্রায় বাহির হইয়াছেন। তখন সন্ধ্যা। গৌরাঙ্গী রাধা যখন মন্দির হইতে অভিসারোদ্দেশে বাহির হইলেন তখন মনে হইলে নবীন জলধরের উপর বিদ্যুতের রেখা বিবাদ বিস্তার করিয়া গেল। গোধুলির অন্ধকারাবৃত জলধর তুল্য শ্যামল অঙ্গে উজ্জ্বল গৌরাঙ্গী রাধার দেহকান্তি ক্ষীণ বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় দীপ্তি বিস্তার করিয়া যাওয়ার এবং তদ্দ্বারা গোধুলির অন্ধকার কিয়ৎ পরিমাণে বিদূরিত হওয়ায় জলধরেরও বিদ্যুতের বিবাদ বলা হইয়াছে।

নাহি উঠল দুহুঁ মোছলে অঙ্গ।
দুহুঁ রূপ নিরখিতে মুরুছে অনঙ্গ॥

রাধাশ্যামের স্নাত রূপ এত সুন্দর যে, যিনি সুন্দরতম অনঙ্গ তিনিও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের পরস্পরের রূপ দর্শনে মনে কেবল বিমল আনন্দ রসানুভব হয়, কিন্তু তাহা কামলেশ-বিবর্জ্জিত, ইহাই এই কবিতার ধ্বনি বলিয়া মনে হয়। তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের,—'নিরস্ত্র মদন পানে চাহিলা সুন্দরী।"

এমনি করিয়াই বৈষ্ণব কবিরা তাঁহাদের প্রতি পদাবলীতে নব নব বিস্ময়, নব নব অনুভূতির ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সূক্ষ্মানুভূতির আরো পরিচয় পাই নিম্নলিখিত পদগুলিতে।

শ্রীরাধা বলিতেছেন—

সজনী কি ফল বেশ বনান।
কানু পরশ—মনি পরশক বাধন
আভরণ সৌতিনি মান॥

হে সখি, বেশ রচনায় প্রয়োজন কি? কৃষ্ণরূপ পরশমণির স্পর্শের বাধাদাত্রী বেশভূষাকে সপত্নী বলিয়া মনে করি। শ্যামের ওতপ্রোত স্পর্শে অন্তরায় বাধা দান করিবে। ইহার চেয়ে বিনা অলঙ্কারে শ্যামালিঙ্গন ঢের ঢের শ্রেয়। কিন্তু শুধু অলঙ্কার ত্যাগ করিলেই তো বাধা দূর হইল না। অলঙ্কার তো ত্যাগ করিলেনই, উপরন্তু,—

হিয়ায় হিয়ায় লাগিব লাগিয়া
চন্দন না মাখে অঙ্গে।
গায়ের ছায়া বায়ের দোসর
সদাই ফিয়রে সঙ্গে॥

চন্দনে কতটুকুই বা বাধা দেয়, কিন্তু সেটুকু বাধাও সহ্য করিবার মত ধৈর্য্য নাই। এমন কি—

সো তনু পরশে পুলক জনু বাধত
ইথে লাগি চমকে পরাণ॥

পার্থিব বস্তুর বাধা সহ্য তো হয়ই না, সেগুলিকে দূর করাও চলে, কিন্তু শ্যামতনু স্পর্শ করিলে শরীরে যে পুলক রোমাঞ্চ হইবে তাহাও তো সম্যক মিলনে বাধা দান করিবে। একান্ত মিলনের এই যে আগ্রহ এর আগ্রহের অনুভব বোধ করি আর কোন কবিই করিতে পারেন নাই। আর একটি সূক্ষ্মানুভূতির উদাহরণ দিতেছি—

শ্রীরাধা আকুল আগ্রহে শ্যামসুন্দরকে আলিঙ্গন করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি হইল না, দেহ বাধা হইল। তখন দৃষ্টির ভিতর দিয়া শ্যামকে অন্তরে গ্রহণ করিয়া আলিঙ্গন করিলেন, তাহাতেও তৃপ্তি হইল না, এখানে বাধা হইল অন্তর। তখন শ্রীরাধা আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, শ্যামকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলেন না বলিয়া। এই যে রূপাতীত অরূপকে, শাশ্বত সৌন্দর্য্যকে একান্ত করিয়া উপভোগ করিবার অসীম আগ্রহ, ইহা এক বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যেই সম্ভব হইয়াছিল।

বৈষ্ণব কবিরা রূপাতীতের সন্ধান করিতে যাইয়া বিশ্ব-প্রকৃতির

নিয়া যান নাই একেবারে। বিশ্ব-প্রকৃতির ভিতরও শ্যামরূপের মোহন বি দেখিয়াছেন।—

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে।

* * * *

শিখরে শিখণ্ড-রোল মত্ত দাদুরী বোল
কোকিল কুহরে কুতুহলে।
ঝিঁঝা ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিনু হেন কালে॥

শ্রীরাধা শ্যামচাঁদের শ্যামলরূপ স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাহাও মেঘমেদুর শ্রাবণের ঘন বর্ষণের শ্যামল শ্রীর মধ্য দিয়াই। বাহ্য প্রকৃতির সহিত অন্তঃ প্রকৃতির সামঞ্জস্য এমন সুন্দর ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে যে, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

বৈষ্ণব কবিরা বর্ষার রূপের মধ্যেই শ্যাম-রূপ উপভোগ করিয়াছেন বিশেষ করিয়া। বর্ষাই তো প্রকৃতিকে নবীন শ্যামলশ্রীতে শোভিত করে। এই যে প্রকৃতির নবীন রূপ ধারণ ইহাও তাঁহাদের চক্ষু এড়াইয়া যায় নাই। বর্ষা আসিয়াছে—

ঘন ঘন মেঘ গরজে দিন যামিনি
আওল মাহ আষাঢ়।
নব জলধর পর দামিনি ঝলকায়
দাহ দ্বিগুণ তহিঁ বাঢ়॥

বর্ষার ভিতর দিয়াই কবি চিরন্তন বিরহের ক্রন্দনও অনুভব করিয়াছেন। বর্ষার যে শুধু শ্যামল সৌন্দর্য্যই আছে, তাহা নয়, ইহার ভিতর চিরন্তন বিরহ ক্রন্দসী হইয়াও আছে। এই তথ্যটিও তাঁহাদের সূক্ষ্মানুভূতিতে বাদ যায় নাই। তাই কবি বর্ষার সহিত তুলনা করিয়া শ্রীরাধার বিরহ বর্ণনা করিয়াছেন—

অন্তর গর গর পাঁজর জর জর
ঝর ঝর লোচন বারি॥
দুখ-কুল-জলধি-মগন অছু অন্তর
তাকর দুখ কি নিবারি॥

বর্ষার সহিত এমন সৌসাদৃশ্য রাখিয়া বিরহ বর্ণনা বোধ করি এক মাত্র বৈষ্ণব কবিতেই সম্ভব হইয়াছিল।

বৈষ্ণব কবিদের কাব্যের মূল সূত্রই হইতেছে রূপের অনুভূতি, প্রেমের অনুভূতি। আর সেইজন্য তাঁহাদের কবিতা অনবদ্য হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোন কবিতা ব্যক্তিগত ভাবের হইলে তাহা কাব্য পদবাচ্য হয় না। বৈষ্ণব কবিদের কবিতা কাব্য পদবাচ্য হইয়াছে এইজন্য যে, তাহা কোন ব্যক্তি বিশেষের বা ব্যক্তিগত ভাবের কবিতা নয় বলিয়া। চিরন্তন প্রেমের লীলাকে নানা রূপে, নানা আবেষ্টনীর ভিতর দিয়া নিজেরা নানা রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং নিজেদের উপলব্ধি ছন্দে গাঁথিয়া জগতের সামনে মেলিয়া ধরিয়াছেন। এই যে রাধাশ্যামের রূপক কল্পনা করিয়া এত বড় একটা কাব্য-জগৎ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, ইহা যদি শুদ্ধমাত্র প্রতীক হইত, তাহা হইলে এত বড় কাব্য কখনই সৃষ্টি হইতে পারিত না। আর হইলেও তাহা চিরস্থায়ী কখনই হইত না। রাধা-শ্যাম কোন ব্যক্তি মাত্র নয়, ইহাঁরা শাশ্বত প্রেমের প্রতীক মাত্র। ইহাঁদের ব্যক্তির প্রতীক ভাবিলে কবিকে ও কাব্যকে খর্ব্ব করা হয়। এই বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে অরূপ রূপের নিত্য লীলা চলিতেছে তাহাই সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাঁহারা উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন মাত্র। প্রকৃতির কাছে মানবের যে প্রেম-নিবেদন তাহারই বিচিত্র ধারা বৈষ্ণব কবির কাব্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের কাব্যের ভিতর আছে নূতনকে নবনব রূপে, নবনব ভাবে, নবনব লীলায় উপলব্ধি করিবার আকাঙ্ক্ষা—পুরাতনের স্থান সেখানে নাই। সেইজন্য নূতনের নবনব লীলার গানই তাঁহারা গাহিয়াছেন। ধর্মের দিক দিয়া যাহাই হোক, কাব্য হিসাবে যে পদাবলী সাহিত্য অতুলনীয়, এ সম্বন্ধে দুই মত বোধ করি হইতে পারে না এই আমার বিশ্বাস।

নর ও নারীর মেধা কি সমান?

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দে

"নর ও নারীর বুদ্ধি ও মানসিক ক্ষমতায় প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য নেই। তফাৎ যা কিছু দেখা যায় সেটার কারণ শুধু এই যে, পুরুষ অনেক যুগ ধরে নারীকে শিক্ষার ও মানসিক ক্ষমতা খাটাবার সুযোগ দেয় নি। এই সুযোগ পেলেই নারী সব বিষয়ে পুরুষের সমান হতে পারে। এই দেখ না খনা, লীলাবতী, গার্গী, এ্যনি বেসাণ্ট, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি।"

এই রকম কথা সম্প্রতি এত লোকে এতবার বলেছেন যে, শুনে শুনে অনেকের কাছে কথাটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে মনে হয়েছে ও তাঁরাও এই কথা প্রচার করতে আরম্ভ করেছেন। তবে যাঁরা সত্য নির্ণয় করতে চান তাঁদের দুদিককারই যুক্তি প্রমাণ শোনা উচিত। তাই, এই বিষয়ে নানা পাশ্চাত্য চিকিৎসক, মনোবিদ্, নৃতত্ত্ববিদ্, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের মত সঙ্কলন করে দিলাম। নিজের যুক্তি প্রমাণ ও মতামতও সেই সঙ্গে দিয়েছি। পাছে কেউ উক্ত পণ্ডিতদের মত 'সেকেলে' বলেন, এইজন্য বলা দরকার যে জার্ম্মাণ পণ্ডিত আডলফ্ হাইলবোরনের (Adolf Heilborn এর) লিখিত ও J. E. Pryde-Huges অনুবাদিত 'The Opposite Sexes' আমি প্রধানতঃ অনুসরণ করেছি। এখানি ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ছাপা। যেখানেই মনে হয়েছে যে ইংরাজির অনুবাদে মূলের ভাব ঠিক প্রকাশ করতে পারিনি সেখানেই বন্ধনীর মধ্যে মূল উদ্ধৃত করেছি।

নারীর মস্তিষ্কের দৈন্য

R. Martimএর মতে ইয়োরোপীয় পুরুষের মস্তিষ্কের পরিসর (cranial capacity) প্রায় ১৪৫০ ঘন সেণ্টিমিটার (centimeter), পক্ষান্তরে ইয়োরোপীয় নারীর প্রায় ১৩০০ মাত্র। নিম্নশ্রেণীর জাতিদের মধ্যে এই পার্থক্য আরও কম। অল্প বিস্তার থাকার জন্য নারীর মস্তিষ্ক

নরের চেয়ে ছোট। ইয়োরোপীয় নারীর মস্তিষ্কের ওজন নরের মস্তিষ্কের ওজনের চেয়ে গড়ে ১২০ গ্র্যাম (gram) কম। নবজাত শিশুর মধ্যেও এই পার্থক্য ৫০ গ্র্যাম। মস্তিষ্কের ওজনের বেশী-কমের সঙ্গে বুদ্ধির বেশী-কমের সম্বন্ধ জর্জ বুশেন (George Buschan) প্রভৃতি অনেক গবেষক স্বীকার করেন। Max Bartelsএর মতে সূক্ষ্ম গঠন (fine construction) ও ভাঁজের (convolutionsএর) দিক দিয়েও নরের মস্তিষ্ক নারীর মস্তিষ্ক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। হ্যাভেলক্ এলিস্ (Havellock Ellis) তাঁর Man and Woman গ্রন্থে ছোট মস্তিষ্কের পক্ষে ও বড় মস্তিষ্কের বিপক্ষে যা লিখেছেন, আধুনিক চিকিৎসক ও গবেষকদের সিদ্ধান্ত তার বিপরীত।) সভ্য জাতদের চেয়ে অসভ্য জাতদের, ও একই জাতদের মধ্যে মস্তিষ্ক পরিচালনকারী, বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চেয়ে সাধারণ মানুষের, মাথার বিস্তৃতি (cranial capacity) ও মস্তিষ্কের ওজন কম। বুশেনের 'Brain and Culture' দেখুন।

নারীর স্বভাব

নারীর মন সম্বন্ধে জার্ম্মাণ দার্শনিক ভাইনিঙ্গারের (Weiningerএর) মত এই যে নারীর নিজস্ব আত্মা বা সত্তা বলে কিছু নেই। নারী বাহ্য রূপ নিয়েই থাকে (Woman has no soul and no ego. It is the external appearances that make up the ego of the woman,)। নারীরা সব বিষয় উপর উপর ভাসা ভাসা রকম দেখে ও ভাবে, পক্ষান্তরে নর কোন বিষয়ের শুধু মোটা দিকটার প্রতি মনোযোগ দেয় না, কারণ সে সমস্ত ব্যাপারের ভিতর গভীর ভাবে যায়। নারী মুখ্য বিষয় ভাল করে না বুঝে, অস্থল চাখে ও হাতড়ে বেড়ায়। সব বিষয়ে চেখে বেড়ানই নারীর বিশেষত্ব ; এই বিষয়েই তারা পারদর্শিতা লাভ করতে পারে। ডাক্তার হাইলবোরন্ বলেন যে, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে শোপেনহাউয়ার্ (Schopenhauer), এডুয়ার্ট ফন হার্টমান্ (Eduard Von Hartmann) ও নিশিট্‌কারও (Nietzscheএরও) মোটামুটি এই মত। Ferrero, Lombroso, Von Krafft Ebing, Mobius প্রভৃতি বিখ্যাত চিকিৎসক ও মনস্তত্ত্ববিদদের সিদ্ধান্তও এই মত সমর্থন করে।

নারী অন্ধ-সংস্কারের অধীন

মনস্তত্ত্ববিদ মোয়েবিউস (Mobius) "On the physiological weak-mindedness of the female" প্রবন্ধে বলেন যে পুরুষের চেয়ে নারীর কার্য্যকলাপে অন্ধ সংস্কারের (instinctএর) প্রভাব বেশী দেখা যায়। মানসিক ক্রমপরিণতির ধারাই এই যে, অন্ধ সংস্কারের প্রভুত্ব ক্রমশঃ কমে আসে, আর চিন্তা ও বিচার-বুদ্ধি তার স্থান অধিকার করে। অন্ধ সংস্কার বলতে বোঝায় যে, কোন কাজ করা, কিন্তু কেন যে করা হল, তা নিজেই না জানা, বা বুঝতে না পারা। বিচার-বুদ্ধির সাহায্য না নিয়ে হঠাৎ কোন মীমাংসা করা বা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকেও অন্ধ সংস্কার বলে। আসলে অন্ধ সংস্কার বিনা কোন কাজ বা অনুভূতি (perception) হয় না। কারণ চিন্তার কতকটা বরাবর মগ্নচৈতন্যে (unconscious fieldএ) থাকে। কিন্তু কতটা মগ্নচৈতন্যে থাকে তার মাত্রার তফাৎ হয়। যে পরিমাণে কোন লোকের কাজ বা অনুভূতি জাগ্রত চৈতন্যে হয়, সেই পরিমাণে তাকে মানসিক উন্নতিশালী ও স্বাধীন বলা যায়। ভাবও (feeling ও) কতকটা অন্ধ সংস্কারের মত। তার অন্ধ সংস্কারের সুবিধা এই যে, চিন্তা করার কষ্ট পেতে হয় না, আর তার উপর নির্ভর করা চলে। অন্ধ সংস্কারের সমধিক অধীন হওয়াতেই নারী জন্তুর মত, পরাধীন, অথচ দ্বিধাহীন ও নিরুদ্বেগ (sure and serene)। এখানেই নারীর প্রকৃত শক্তি, এরই জন্য তারা বিস্ময়জনক ও মনোমুগ্ধকর। নারীর অনেকগুলি বিশেষত্বই তাদের জন্তুর সঙ্গে এই সাদৃশ্যমূলক। মোয়েবিউসের মতে কোন বিষয়ে প্রাজ্ঞতার অভাব ও সূক্ষ্মতর কল্পনার ন্যূনতা (want of judgment and lack of creative imagination) এই সব বিশেষত্বের ফল। তিনি বলেন যে স্ত্রীলোকের দুর্ব্বলচিত্ততা শুধু যে আছে তা নয়, এটা থাকা একান্ত দরকার। বুদ্ধিজীবিতা (intellectualism) থেকে তাদের রক্ষা করা উচিত।

নরনারীর বুদ্ধির ও মনের পার্থক্য প্রাকৃতিক ও পাকা

Madame de Stael বলেন যে নরনারীর মনের গতি ও শক্তির কোন তফাৎ নেই ; বুদ্ধিতে যা তফাৎ দেখা যায় সেটা শিক্ষার ফল। নৃতত্ত্ববিদ্ (anthropologist) Allan বলেন উক্ত সাদাসের এই কথা দৃশতঃ অসঙ্গত (is paradoxical)। পুরুষের মত মনীষাসম্পন্ন স্ত্রীলোক তেমনই অস্বাভাবিক (is as great an abnormality) যেমন পুরুষের মত দাড়িওয়ালা স্ত্রীলোক। নর ও নারীর শরীরে যেমন বিশেষ তফাৎ, তাদের মন ও বুদ্ধির মধ্যে তেমনই মূলগত, স্বাভাবিক ও কায়েমী বৈসাদৃশ্য (radical, natural and permanent differences) বিদ্যমান। বিখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ Max Runge বলেন যে, স্ত্রীলোক কোন বিষয়েই পুরুষের সমান নয়। তাদের গুণগুলি একেবারেই বিভিন্ন।

তফাৎ কোথায় ?

আমাদের চোখ, কান, নাক, জিভ, ত্বক প্রভৃতিকে জ্ঞানের দ্বার বলা হয় ; আর মস্তিষ্ককে জ্ঞানের হেড আফিস্ বলা চলে। সুতরাং নর ও নারীর বুদ্ধি ও মেধার পার্থক্য নির্ণয় করতে হলে তাদের ঐ সব ইন্দ্রিয়গুলির ক্ষমতা ও মস্তিষ্কের গড়ন, পরিমাণ ও কার্য্যের পার্থক্য সম্বন্ধে আলে চনা করতে হবে।

হেড আফিসে তফাৎ।

পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের মস্তিষ্ক যে ওজন ও সূক্ষ্ম গড়নে (fine modellingএ) হীনতর এ বিষয় আগে দেখিয়েছি। জার্ম্মাণীর অন্তর্গত ম্যুন্‌সেনের (Munichএর) শরীরতত্ত্ববিদ্ রুইডিঙ্গার্ (Rudinger) বলেন যে নবজাত বালকের মস্তিষ্কের দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও ঘনতা বালিকার চেয়ে বেশী। বয়স্ক বালক ও যুবকও এ বিষয়ে এবং মস্তিষ্কের গভীর ভাঁজে (convolutions and deeper fissuring of the

parietal lobeএ) বালিকা ও যুবতীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বার্লিনের শরীরতত্ত্ববিদ্ (anatomist) ভাল্‌ডিয়ার (Waldeyer) (যিনি যমজ সন্তানদের সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা করেছেন) দেখেছেন যে একই মা বাপের যমজ ছেলে মেয়ের মধ্যে ছেলের মস্তিষ্কের রন্ধ্রগুলি (fissures) মেয়ের চেয়ে অনেক বেশী পরিণত। ডাঃ হাইলবোরন্ বলেন যে সমস্ত উন্নত জীবের মধ্যে, বিশেষতঃ বনমানুষের (anthropoid apesএর) মধ্যে, পুরুষের মস্তিষ্কের আকার বড় দেখা যায়। সুতরাং নরের মস্তিষ্কের বেশী পরিমাণ, ভাল গড়ন ও উন্নত বিকাশ (fissure modelling) শুধু শিক্ষা ও কৃষ্টির (culture) দরুণ না হতেও পারে।

নারী প্রতিভার সর্ব্বোচ্চ বিকাশ নরের সর্ব্বোচ্চ প্রতিভার অনেক নীচে

দেখা যায় যে, নানা বিষয়ে পুরুষ যতদূর বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতিতে উন্নতি লাভ করতে পারে কোন স্ত্রীলোক ততদূর কখনই পারে না। অবশ্য প্রত্যেক যুগে কোথাও কোথাও এমন কতকগুলি স্ত্রীলোক দেখা যায় যারা সাধারণ পুরুষের চেয়ে .(the average of man) যোগ্যতায় শ্রেষ্ঠ। যেমন গণিত জ্যোতিষে হর্শেল গ্রহের আবিষ্কর্ত্রী হর্শেল সাহেবের ভগ্নী ক্যারোলিন হর্শেল (জন্ম ১৭৫০ খৃঃ—মৃত্যু ১৮৪৮ খৃঃ) ও এলিজাবেথ ব্রাউন গণিতে সোফি জার্ম্মেণ (১৭৭৬—১৮৩১) ও Sonia Kowalewska। পদার্থ বিজ্ঞানে মাদাম কুরী। কবিতায় সাফো (প্রায় খৃঃ পূঃ ৬১০ কালের) Annette von Droste (১৭৯৭-১৮৪৮) ও সেলমা লাগরলফ্। চিত্রকলায় রোজা বনহয়ার্ (১৮২২-১৮৯৯) ও কেটা কলভিট্‌জ্ (জন্ম ১৮৬৭ খৃঃ)। কিন্তু স্ত্রীলোকের বুদ্ধি ও প্রতিভার সব চেয়ে বড় নমুনাও সেই সেই বিষয়ে পুরুষের উচ্চতম প্রতিভার অনেক নীচের স্তরের জিনিস। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সঙ্গীতে স্ত্রীলোকের সৃজনী-প্রতিভা দেখা যায় না। উল্লেখ-যোগ্য নারী-সঙ্গীত-রচয়িত্রী ইয়োরোপে কেউ নেই। রুবিনষ্টাইন একবার বিস্ময়ভরে বলেছিলেন যে "সঙ্গীতে, কোন স্ত্রীলোক দ্বারা, নারীর দুই স্বাভাবিক সংস্কারের—অর্থাৎ পুরুষের প্রতি প্রণয় ও শিশুর প্রতি স্নেহের—প্রকাশ হয় নি। নারী-রচিত এমন কোন প্রণয়-সঙ্গীত বা ছেলে-ভুলান ছড়া আমার জানা নেই যেটা অমরত্ব লাভ করেছে (has attained to Classical importance)। মহা মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তরূপে নারিকোলের সঙ্গে স্ত্রীলোকের তুলনা করতে গিয়ে বলেছেন "তারপর মালা—এটি স্ত্রীলোকের বিদ্যা—কখনও আধখানা বৈ পুরা দেখিতে পাইলাম না। নারিকেলের মালা বড় কাজে লাগে না, স্ত্রীলোকের বিদ্যাও বড় নয়। মেরি সমরবিল বিজ্ঞান লিখিয়াছেন, জেন অষ্টেন বা জর্জ এলিয়ট উপন্যাস লিখিয়াছেন,—মন্দ হয় না, কিন্তু দুই-ই মালার মাপে।"

ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতার তফাৎ

চোখ সম্বন্ধে ইংরাজ বিশেষজ্ঞ কার্টার, বৈজ্ঞানিক গ্যালটন, জার্ম্মাণ চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক ট্‌সোয়াডেমাকার (Zwaademaker), বিলরোট্ (Billroth), আইজেলবার্গ (Eisels'berg), যৌন-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ও প্রামাণিক লেখক অষ্ট্রেলিয়ান হ্যাভেলক এলিস্ (Man and Woman গ্রন্থে) প্রভৃতির মতে প্রধান ইন্দ্রিয়গুলির (অর্থাৎ চোখ, কান নাকের) এবং মস্তিষ্কের ক্ষমতায় নারী নিঃসন্দেহ ভাবে পুরুষ অপেক্ষা হীন। নারী শুধু আস্বাদ (নোন্তা জিনিসের ছাড়া) স্পর্শ ও বেদনাসহন ক্ষমতায় পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

ভুয়ো সাম্যবাদের নিদান

(১) যাঁরা নরনারীর শরীর, মন ও বুদ্ধির তুলনা-মূলক আলোচনা ও গবেষণার খোঁজ রাখেন না, (২) ইয়োরোপের কতক লোকের অন্ধ অনুকরণে মিথ্যা সাম্যবাদের মোহে আচ্ছন্ন, অথবা (৩) কোন কারণে যে পুরুষেরা নারীর খোসামোদ করতে চান, তাঁরা প্রায়ই বলেন যে নারী বুদ্ধি প্রভৃতি মানসিক ক্ষমতায় পুরুষের সমান, তবে উপস্থিত যা তফাৎ দেখা যায়, তার কারণ নারী বহু যুগ ধরে পুরুষের মত শিক্ষার সুযোগে বঞ্চিত।

নারী, শিক্ষার সুযোগ, চিরকাল কম পায় নি।

এই আপাত-মনোরম যুক্তির উত্তরে ডাক্তার হাইলবোরন্ বলেন যে কোন কোন সমাজে ও কোন কোন যুগে (যথা শিভাল্‌রীর ও ইটালীর নবজাগরণের যুগে) পুরুষদের চেয়ে স্ত্রীলোকদের অনেক বেশী যত্নের সহিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, আর সব যুগেই তাদের কাব্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলা বিশেষভাবে শেখান হয়েছে। সুতরাং নর ও নারীর সাধারণ ক্ষমতা ও উচ্চতম সাফল্যের পার্থক্যের কারণ শুধু শিক্ষার ও সুযোগের তফাৎ, এ কথা বলা চলে না।

স্ত্রী পুরুষের শিক্ষায় সমান সুযোগ ইয়োরোপ ও আমেরিকায় অন্ততঃ তিন পুরুষ ধরে চলে আসছে। পুরুষেরা প্রায়ই চাকরি, ব্যবসা ও অন্যান্য জীবিকার জন্য অল্প বয়সেই সাধারণ শিক্ষার স্কুল কলেজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকেরা (বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত তো বটেই, অনেকে বিবাহের পরও) অনেক বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ করে। অথচ কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, প্রভৃতিতে নারীর দান এখনও সামান্য ও নগণ্য।

গবেষণার ফল—নারীর মেধার দৈন্য প্রাকৃতিক

আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী ও হল্যাণ্ডের অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও গবেষণার ফলে এ কথা অভ্রান্তভাবে প্রমাণ হয়েছে যে, পুরুষ অপেক্ষা নারীর মেধার দৈন্যের কারণ শুধু শিক্ষারই অভাব নয় (জার্ম্মাণ মনস্তত্ত্ববিদ্ G. Heymansএর The Psychology of Woman দেখুন)। এই সব পরীক্ষার ফলে জানা যায় যে, নারী সাধারণতঃ পুরুষের চেয়ে উৎসাহ, পরিশ্রম, ও ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু প্রজ্ঞা ও বিষয়-বুদ্ধিতে (sagacityতে) নিকৃষ্ট। স্থূল সত্যগুলিই (concrete realities) নারীর ভাল লাগে, বিবিক্ত ভাব (abstract), আদর্শ (id·al) ও কাল্পনিক ভাব তাদের ততটা আকর্ষণ করে না। গবেষকবৃন্দ এ বিষয়ে একমত যে, পুরুষ হতে তাদের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে, অধিক ভাবপ্রবণতা ও সহজে বেশী উত্তেজিত হওয়া (stronger emotionalism, greater excitability, and so to say, the

নরের চেয়ে ছোট। ইয়োরোপীয় নারীর মস্তিষ্কের ওজন নরের মস্তিষ্কের ওজনের চেয়ে গড়ে ১২০ গ্র্যাম (gram) কম। নবজাত শিশুর মধ্যেও এই পার্থক্য ৫০ গ্র্যাম। মস্তিষ্কের ওজনের বেশী-কমের সঙ্গে বুদ্ধির বেশী-কমের সম্বন্ধ জর্জ বুশেন (George Buschan) প্রভৃতি অনেক গবেষক স্বীকার করেন। Max Bartelsএর মতে সুক্ষ্ম গঠন (fine construction) ও ভাঁজের (convolutionsএর) দিক দিয়েও নরের মস্তিষ্ক নারীর মস্তিষ্ক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। হ্যাভেলক্ এলিস্ (Havellock Ellis) তাঁর Man and Woman গ্রন্থে ছোট মস্তিষ্কের পক্ষে ও বড় মস্তিষ্কের বিপক্ষে যা লিখেছেন, আধুনিক চিকিৎসক ও গবেষকদের সিদ্ধান্ত তার বিপরীত।) সভ্য জাতদের চেয়ে অসভ্য জাতদের, ও একই জাতদের মধ্যে মস্তিষ্ক পরিচালনকারী, বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চেয়ে সাধারণ মানুষের, মাথার বিস্তৃতি (cranial capacity) ও মস্তিষ্কের ওজন কম। বুশেনের 'Brain and Culture' দেখুন।

নারীর স্বভাব

নারীর মন সম্বন্ধে জার্ম্মাণ দার্শনিক ভাইনিঙ্গারের (Weiningerএর) মত এই যে নারীর নিজস্ব আত্মা বা সত্বা বলে কিছু নেই। নারী বাহ্য রূপ নিয়েই থাকে (Woman has no soul and no ego. It is the external appearances that make up the ego of the woman,)। নারীরা সব বিষয় উপর উপর ভাসা ভাসা রকম দেখে ও ভাবে, পক্ষান্তরে নর কোন বিষয়ের শুধু মোটা দিকটার প্রতি মনোযোগ দেয় না, কারণ সে সমস্ত ব্যাপারের ভিতর গভীর ভাবে যায়। নারী মুখ্য বিষয় ভাল করে না বুঝে, অম্বল চাখে ও হাতড়ে বেড়ায়। সব বিষয়ে চেখে বেড়ানই নারীর বিশেষত্ব ; এই বিষয়েই তারা পারদর্শিতা লাভ করতে পারে। ডাক্তার হাইলবোরন্ বলেন যে, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে শোপেনহাউয়ার্ (Schopenhauer), এডুয়ার্ট ফন হার্টমান্ (Eduard Von Hartmann) ও নিশ্‌ট্‌কারও (Nietzscheএরও) মোটামুটি এই মত। Ferrero, Lombroso, Von Krafft Ebing, Mobius প্রভৃতি বিখ্যাত চিকিৎসক ও মনস্তত্ত্ববিদদের সিদ্ধান্তও এই মত সমর্থন করে।

নারী অন্ধ-সংস্কারের অধীন

মনস্তত্ত্ববিদ মোয়েবিউস (Mobius) "On the physiological weak-mindedness of the female" প্রবন্ধে বলেন যে পুরুষের চেয়ে নারীর কার্য্যকলাপে অন্ধ সংস্কারের (instinctএর) প্রভাব বেশী দেখা যায়। মানসিক ক্রমপরিণতির ধারাই এই যে, অন্ধ সংস্কারের প্রভুত্ব ক্রমশঃ কমে আসে, আর চিন্তা ও বিচার-বুদ্ধি তার স্থান অধিকার করে। অন্ধ সংস্কার বলতে বোঝায় যে, কোন কাজ করা, কিন্তু কেন যে করা হল, তা নিজেই না জানা, বা বুঝতে না পারা। বিচার-বুদ্ধির সাহায্য না নিয়ে হঠাৎ কোন মীমাংসা করা বা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকেও অন্ধ সংস্কার বলে। আসলে অন্ধ সংস্কার বিনা কোন কাজ বা অনুভূতি (perception) হয় না। কারণ চিন্তার কতকটা বরাবর মগ্নচৈতন্যে (unconscious fieldএ) থাকে। কিন্তু কতটা মগ্নচৈতন্যে থাকে তার মাত্রার তফাৎ হয়। যে পরিমাণে কোন লোকের কাজ বা অনুভূতি জাগ্রত চৈতন্যে হয়, সেই পরিমাণে তাকে মানসিক উন্নতিশালী ও স্বাধীন বলা যায়। ভাবও (feeling ও) কতকটা অন্ধ সংস্কারের মত। অন্ধ সংস্কারের সুবিধা এই যে, চিন্তা করার কষ্ট পেতে হয় না, আর তার উপর নির্ভর করা চলে। অন্ধ সংস্কারের সমধিক অধীন হওয়াতে নারী জন্তর মত, পরাধীন, অথচ দ্বিধাহীন ও নিরুদ্বেগ (sure and serene)। এখানেই নারীর প্রকৃত শক্তি, এরই জন্য তারা বিস্ময়জনক ও মনোমুগ্ধকর। নারীর অনেকগুলি বিশেষত্বই তাদের জন্তুর সঙ্গে এই সাদৃশ্যমূলক। মোয়েবিউসের মতে কোন বিষয়ে প্রাজ্ঞতার অভাব ও সৃষ্টিক্ষম কল্পনার ন্যূনতা (want of judgment and lack of creative imagination) এই সব বিশেষত্বের ফল। তিনি বলেন যে স্ত্রীলোকের দুর্ব্বলচিত্ততা শুধু যে আছে তা নয়, এটা থাকা একান্ত দরকার। বুদ্ধিজীবিতা (intellectualism) থেকে তাদের রক্ষা করা উচিত।

নরনারীর বুদ্ধির ও মনের পার্থক্য প্রাকৃতিক ও পাকা

Madame de Stael বলেন যে নরনারীর মনের গতি ও শক্তিতে কোন তফাৎ নেই ; বুদ্ধিতে যা তফাৎ দেখা যায় সেটা শিক্ষার ফল। নৃতত্ত্ববিদ্ (anthropologist) Allan বলেন উক্ত ম্যাদামের এই কথা দৃশতঃ অসঙ্গত (is paradoxical)। পুরুষের মত মনীষাসম্পন্না স্ত্রীলোক তেমনই অস্বাভাবিক (is as great an abnormality) যেমন পুরুষের মত দাড়িওয়ালা স্ত্রীলোক। নর ও নারীর শরীরে যেমন বিশেষ তফাৎ, তাদের মন ও বুদ্ধির মধ্যে তেমনই মূলগত, স্বাভাবিক ও কায়েমী বৈসাদৃশ্য (radical, natural and permanent differences) বিদ্যমান। বিখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ Max Runge বলেন যে, স্ত্রীলোক কোন বিষয়েই পুরুষের সমান নয়। তাদের গুণাবলি একেবারেই বিভিন্ন।

তফাৎ কোথায় ?

আমাদের চোখ, কান, নাক, জিভ, ত্বক প্রভৃতিকে জ্ঞানের দ্বার বলা হয় ; আর মস্তিষ্ককে জ্ঞানের হেড আফিস্ বলা চলে। সুতরাং নর ও নারীর বুদ্ধি ও মেধার পার্থক্য নির্ণয় করতে হলে তাদের ঐ সব ইন্দ্রিয় গুলির ক্ষমতা ও মস্তিষ্কের গড়ন, পরিমাণ ও কার্য্যের পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে।

হেড আফিসে তফাৎ।

পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের মস্তিষ্ক যে ওজন ও সুক্ষ্ম গড়নে (fine modellingএ) হীনতর এ বিষয় আগে দেখিয়েছি। জার্ম্মাণীর অন্তর্গত ম্যুনসেনের (Munichএর) শরীরতত্ত্ববিদ্ রুইডিঙ্গার (Rudinger) বলেন যে নবজাত বালকের মস্তিষ্কের দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও ঘনতা নবজাত বালিকার চেয়ে বেশী। বয়স্ক বালক ও যুবকও এ বিষয়ে এবং মস্তিষ্কের গভীর ভাঁজে (convolutions and deeper fissuring of the parietal lobeএ) বালিকা ও যুবতীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বার্লিনের শরীরতত্ত্ববিদ্ (anatomist) ভাল্‌ডিয়ার (Waldeyer) (যিনি যমজ সন্তানদের সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা করেছেন) দেখেছেন যে একই মা বাপের যমজ ছেলে মেয়ের মধ্যে ছেলের মস্তিষ্কের রন্ধ্রগুলি (fissures) মেয়ের চেয়ে অনেক বেশী পরিণত। ডাঃ হাইলবোরন্ বলেন যে সমস্ত উন্নত জীবের মধ্যে, বিশেষতঃ বনমানুষের (anthropoid apesএর) মধ্যে, পুরুষের মস্তিষ্কের আকার বড় দেখা যায়। সুতরাং নরের মস্তিষ্কের বেশী পরিমাণ, ভাল গড়ন ও উন্নত বিকাশ (fissure modelling) শুধু শিক্ষা ও কৃষ্টির (culture) দরুণ না হতেও পারে।

নারী প্রতিভার সর্ব্বোচ্চ বিকাশ নরের সর্ব্বোচ্চ প্রতিভার অনেক নীচে

দেখা যায় যে, নানা বিষয়ে পুরুষ যতদূর বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতিতে উন্নতি লাভ করতে পারে কোন স্ত্রীলোক ততদূর কখনই পারে না। অবশ্য প্রত্যেক যুগে কোথাও কোথাও এমন কতকগুলি স্ত্রীলোক দেখা যায় যারা সাধারণ পুরুষের চেয়ে (the average of man) যোগ্যতায় শ্রেষ্ঠ। যেমন গণিত জ্যোতিষে হর্শেল গ্রহের আবিষ্কর্ত্তা হর্শেল সাহেবের ভগ্নী ক্যারোলিন হর্শেল (জন্ম ১৭৫০ খৃঃ—মৃত্যু ১৮৪৮ খৃঃ) ও এলিজাবেথ ; গণিতে সোফি জার্ম্মেণ (১৭৭৬—১৮৩১) ও Sonia Kowalewski। পদার্থ বিজ্ঞানে ম্যাদাম কুরী। কবিতায় সাফো (প্রায় খৃঃ পূঃ ৬১০ সালের) Annette von Droste (১৭৯৭-১৮৪৮) ও সেলমা লাগরলফ্। চিত্রকলায় রোজা বনহয়ার্ (১৮২২-১৮৯৯) ও কেটা কলভিট্‌জ্ (জন্ম ১৮৬৭ খৃঃ)। কিন্তু স্ত্রীলোকের বুদ্ধি ও প্রতিভার সব চেয়ে বড় নমুনাও সেই সেই বিষয়ে পুরুষের উচ্চতম প্রতিভার অনেক নীচের স্তরের জিনিস। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সঙ্গীতে স্ত্রীলোকের সৃজনী-প্রতিভা দেখা যায় না। উল্লেখ-যোগ্য নারী-সঙ্গীত-রচয়িত্রী ইয়োরোপে কেউ নেই। রুবিনষ্টাইন একবার বিস্ময়ভরে বলেছিলেন যে "সঙ্গীতে, কোন স্ত্রীলোক দ্বারা, নারীর দুই স্বাভাবিক সংস্কারের—অর্থাৎ পুরুষের প্রতি প্রণয় ও শিশুর প্রতি স্নেহের—প্রকাশ হয় নি। নারী-রচিত এমন কোন প্রণয়-সঙ্গীত বা ছেলে-ভুলান ছড়া আমার জানা নেই যেটা অমরত্ব লাভ করেছে (has attained to Classical importance)। মহা মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তরূপে নারিকেলের সঙ্গে স্ত্রীলোকের তুলনা করতে গিয়ে বলেছেন "তারপর মালা—এটি স্ত্রীলোকের বিদ্যা—কখনও আধখানা বৈ পুরা দেখিতে পাইলাম না। নারিকেলের মালা বড় কাজে লাগে না, স্ত্রীলোকের বিদ্যাও বড় নয়। মেরি সমরবিল বিজ্ঞান লিখিয়াছেন, জেন অষ্টেন বা জর্জ এলিয়ট উপন্যাস লিখিয়াছেন,—মন্দ হয় না, কিন্তু দুই-ই মালার মাপে।"

ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতার তফাৎ

চোখ সম্বন্ধে ইংরাজ বিশেষজ্ঞ কার্টার, বৈজ্ঞানিক গ্যালটন, জার্ম্মাণ চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক ট্রুসোয়াডেমাকার (Zwaademaker), বিলরোট্ (Billroth), আইজেলবার্গ (Eiselsberg), যৌন-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ও প্রামাণিক লেখক অষ্ট্রেলিয়ান হ্যাভেলক এলিস্ (Man and Woman গ্রন্থে) প্রভৃতির মতে প্রধান ইন্দ্রিয়গুলির (অর্থাৎ চোখ, কান নাকের) এবং মস্তিষ্কের ক্ষমতায় নারী নিঃসন্দেহ ভাবে পুরুষ অপেক্ষা হীন। নারী শুধু আস্বাদ (নোন্তা জিনিসের ছাড়া) স্পর্শ ও বেদনাসহন ক্ষমতায় পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

ভূয়ো সাম্যবাদের নিদান

(১) যাঁরা নরনারীর শরীর, মন ও বুদ্ধির তুলনা-মূলক আলোচনা ও গবেষণার খোঁজ রাখেন না, (২) ইয়োরোপের কতক লোকের অন্ধ অনুকরণে মিথ্যা সাম্যবাদের মোহে আচ্ছন্ন, অথবা (৩) কোন কারণে যে পুরুষেরা নারীর খোসামোদ করতে চান, তাঁরা প্রায়ই বলেন যে নারী বুদ্ধি প্রভৃতি মানসিক ক্ষমতায় পুরুষের সমান, তবে উপস্থিত যা তফাৎ দেখা যায়, তার কারণ নারী বহু যুগ ধরে পুরুষের মত শিক্ষার সুযোগে বঞ্চিত।

নারী, শিক্ষার সুযোগ, চিরকাল কম পায় নি।

এই আপাত-মনোরম যুক্তির উত্তরে ডাক্তার হাইলবোরন্ বলেন যে কোন কোন সমাজে ও কোন কোন যুগে (যথা শিভাল্‌রীর ও ইটালীর নবজাগরণের যুগে) পুরুষদের চেয়ে স্ত্রীলোকদের অনেক বেশী যত্নের সহিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, আর সব যুগেই তাদের কাব্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলা বিশেষভাবে শেখান হয়েছে। সুতরাং নর ও নারীর সাধারণ ক্ষমতা ও উচ্চতম সাফল্যের পার্থক্যের কারণ শুধু শিক্ষার ও সুযোগের তফাৎ, এ কথা বলা চলে না।

স্ত্রী পুরুষের শিক্ষার সমান সুযোগ ইয়োরোপ ও আমেরিকায় অন্ততঃ তিন পুরুষ ধরে চলে আসছে। পুরুষেরা প্রায়ই চাকরি, ব্যবসা ও অন্যান্য জীবিকার জন্য অল্প বয়সেই সাধারণ শিক্ষার স্কুল কলেজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকেরা (বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত তো বটেই, অনেকে বিবাহের পরও) অনেক বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ করে। অথচ কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, প্রভৃতিতে নারীর দান এখনও সামান্য ও নগণ্য।

গবেষণার ফল—নারীর মেধার দৈন্য প্রাকৃতিক

আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী ও হল্যাণ্ডের অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও গবেষণার ফলে এ কথা অভ্রান্তভাবে প্রমাণ হয়েছে যে, পুরুষ অপেক্ষা নারীর মেধার দৈন্যের কারণ শুধু শিক্ষারই অভাব নয় (জার্ম্মাণ মনস্তত্ত্ববিদ্ G. Heymansএর The Psychology of Woman দেখুন)। এই সব পরীক্ষার ফলে জানা যায় যে, নারী সাধারণতঃ পুরুষের চেয়ে উৎসাহ, পরিশ্রম, ও ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু প্রজ্ঞা ও বিষয়-বুদ্ধিতে (sagacityতে) নিকৃষ্ট। স্থূল সত্যগুলিই (concrete realities) নারীর ভাল লাগে, বিবিক্ত ভাব (abstract), আদর্শ (ideal) ও কাল্পনিক ভাব তাদের ততটা আকর্ষণ করে না। গবেষকবৃন্দ এ বিষয়ে একমত যে, পুরুষ হতে তাদের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে, অধিক ভাবপ্রবণতা ও সহজে বেশী উত্তেজিত হওয়া (stronger emotionalism, greater excitability, and so to say, the

inconsiderate response to every 'stimulus.')। ডাঃ হাইলবোরণ বলেন যে, ভাবপ্রবণতা আদিম ও অবচেতন মনের লক্ষণ (Emotionalism is a quality associdfed with primitive subconscious mental activity)। ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে নারীর শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আমার কিন্তু বিশেষ সন্দেহ আছে।

ভাবপ্রবণ লোকের প্রকৃতি

ইতঃপূর্ব্বে বলা হয়েছে যে ভাবপ্রবণতা (emotionalism) নারী জাতির অন্যতম বিশেষত্ব। মনস্তত্ত্ববিদদের মতে নিম্নলিখিত গুণগুলি ভাবপ্রবণতার সহিত সংযুক্ত থাকে! ক্ষণে ক্ষণে মেজাজ বদলান, ভীরু-স্বভাব (timidity) মনস্থির করতে না পারা, সাহসের অভাব (lack of courage) লোকের প্রভাব বেশী দিন থাকা, শীঘ্র রাগ পড়ে যাওয়া, চলচিত্ততা (variability), সহানুভূতির পাত্র প্রায়ই বদলান (frequent changes of sympathies), মুহুর্মুহু হাসা, অনুভূতির সীমাবদ্ধতা (limitation of consciousness) নিজেরই ভাবনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া (susceptibility to auto-suggestion), কল্পনা রাজ্যে বিচরণ, সহজ জ্ঞান অথচ বুঝবার ক্ষমতার অভাব (intuitive power but lack of comprehension), সূক্ষ্ম ও বিবিক্ত বিষয় পরিহার করার প্রবৃত্তি (inclination to avoid the abstract) আর সর্ব্বোপরি সহজ বোধ (intuitive thought), আবেগশীলতা বা ঝোঁকের মাথায় কাজ করা, গোঁড়ামীর বশবর্ত্তিতা, হাতের কাজে দক্ষতা, দেমাক, প্রভুত্বের ও ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা, অত্যধিক অনুকম্পা অথচ উৎকট নিষ্ঠুরতা, অতিরঞ্জনপরায়ণতা অথচ সাধুতা ও নির্ভরযোগ্যতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও প্রায়ই মানসিক বিক্ষোভ হওয়া (frequency of psychic disturbances)। Heymans আরও বলেছেন যে, যতদিন নারী বিশেষভাবে ভাবপ্রবণ থাকবে ততদিন এইগুলি তার বিশেষত্ব থাকবে। আমার মতে এই তালিকা থেকে 'ক্রন্দনশীলতা' বাদ যাওয়া আশ্চর্য্যের বিষয়, কারণ অল্পে কাঁদা ভাবপ্রবণ ব্যক্তিদের বিশেষত্ব, এ কথা সকলেই জানেন।

আদিম যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত পুরুষ, রূপ ও পূর্ব্বোক্ত তালিকার মধ্যে এমন সব গুণ যেগুলি তার কাছে দামী (যথা, হাতের কাজে নৈপুণ্য, সাধুতা ও নির্ভরযোগ্যতা) সেইগুলি দেখে নিজের সঙ্গিনী নির্ব্বাচন করে আসছে। সুতরাং ভাবপ্রবণতা প্রকৃতিদত্ত নারীর একটি বিশেষ গুণ। ভাবপ্রবণতার কতকগুলি দোষ অনেক দিনের শিক্ষা ও চেষ্টার ফলে দূর হতে পারে।

শিল্পে দক্ষতায় তফাৎ

যদিও মনস্তত্ত্ববিদদের মতে নারী নর অপেক্ষা বেশী ভাবপ্রবণ; এবং ভাবপ্রবণ ব্যক্তিদের একটি বিশেষত্ব হচ্ছে হাতের কাজে দক্ষতা; কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, যে সব কাজ বা শিল্পে নারীর বিশেষ অধিকার বলে ধরা হয়, তার মধ্যে যেগুলিতে পুরুষ হাত দিয়েছে তাতেই নারীর চেয়ে বেশী উৎকর্ষ দেখিয়েছে, যেমন রান্না ও দরজীর কাজ।

আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উৎকর্ষতায় তফাৎ

দুঃখী, পাপী, তাপী, ও ধর্ম্মপিপাসু নরনারী যাকে ভক্ত, যোগী বা জ্ঞানী দেখে তারই কাছে শান্তি, আনন্দ ও পরমার্থ লাভের জন্য ছুটে যায়। এ বিষয়ে স্ত্রী পুরুষ বাছে না। নারীর ভিতর পুরুষের চেয়ে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি, ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিষ্ঠা ও রক্ষণশীলতা বেশী দেখা যায়; কিন্তু জগতের ইতিহাসে বিখ্যাত ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, ধর্ম্ম-সংস্কারক, মহা ভক্ত, মহা জ্ঞানী, মহা যোগী—এক কথায় আধ্যাত্মিক রাজ্যের উচ্চস্তরে—ক'জন নারী দেখা যায়? ভারতের ইতিহাসে এক মীরাবাইএর নাম মনে আসে। চেষ্টা করলে হয়ত আরও ২।১টি নাম বার করা যায়; কিন্তু পুরুষ ভক্ত, জ্ঞানী ও যোগীদের তুলনায় তাঁদের সংখ্যা যেমন নগণ্য তাঁদের উৎকর্ষের মাত্রাও তেমনি সামান্য।

নারীর অধীনতা শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্য নয়

দেখা যায় যে, যে সকল জন্তু বহু যুগ ধরে গৃহপালিত হয়ে আসছে, তারা নিজের জাতের বনের জন্তুর চেয়ে মস্তিষ্কের ওজন ও মানসিক ক্ষমতায় নিকৃষ্ট। সুতরাং মনে হতে পারে যে, নারীর বিনীত, নম্র ও আজ্ঞাবহ ভাব, ভীত স্বভাব, কপটতা (insincerity) ছল (dissimulation) প্রভৃতি কতকটা পুরুষের অধীনে বাস করার ফল। কিন্তু অপেক্ষাকৃত বিনীত, নম্র আজ্ঞাবহ ও সহিষ্ণু ভাব (submissiveness) শুধু যে মানব সমাজের স্ত্রীজাতির মধ্যে বেশী দেখা যায় তা নয়, অপর উচ্চ শ্রেণীর জীবদের মধ্যে, বিশেষতঃ বন-মানুষের মধ্যে, সেই পরিমাণে দেখা যায়। এই ব্যাপার সম্বন্ধে ষ্টাইন্‌মেট্‌স্ (Steinmetz) ঠিকই বলেছেন যে, স্ত্রীজাতির গায়ের জোর কম বলে যে এ রকম হয়েছে তা নয়। বড় বড় বুনো জন্তুর চেয়ে মানুষের গায়ের জোর কম, কিন্তু মানুষ কখনও তাদের পদানত হয় নি। যদি নারীর বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি ও দর্প নরের সমান হত, তাহলে সে কখনও নরের অধীন হত না।

সাহিত্য বিচারে পুরুষ নারী ভেদের কারণ

আমরা কোন বালকের কোন কাজ বিশেষ ভাল হলে, সেটিকে স্নেহের চোখে দেখে, সাধারণতঃ বালকের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত বলে, বয়স্ক লোকের সেই রকমই কাজের চেয়ে তার বেশী প্রশংসা করি। সেইরকম যখন কোন সমালোচক নারীর রচিত সাহিত্য বিচারে ভিন্ন মাপকাটি ব্যবহার করেন, অর্থাৎ পুরুষের সেই রকম রচনার চেয়ে তার বেশী প্রশংসা করেন, তখন তাঁর মনে এই ভাবই থাকে যে পুরুষের শ্রেষ্ঠতম রচনা বা বুদ্ধির পরিচয় তিনি নারীর কাছে প্রত্যাশা করেন না, কারণ তাঁর ধারণা নারীর মেধা ও মনীষা পুরুষের চেয়ে কম। এ ধারণা যে ভুল নয়, এ কথা, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষা ও গবেষণার ফল উপরে সঙ্কলন করে দিয়ে, আমি দেখিয়েছি। সুতরাং এ বিষয়ে তাঁদের উপর রাগ করা চলে না।

নর ও নারী পরস্পরের সমান হতে পারেন না

এ কথা স্বীকার করায় নারীর পক্ষে দুঃখ, লজ্জা বা ক্ষোভের বিষয়ও

কিছু নেই। কারণ সব বিষয়ে পুরুষের সমান হতে হবে, না হলে ভারি অগৌরবের কথা, এ কথা যে পাগলের পাগলামি, সেটা বর্ত্তমান ইয়োরোপ আমেরিকার একদল চুল-ছাঁটা, সিগারেট-খাওয়া, জিম্‌নাষ্টিক্ করা ক্ষ্যাপা মেয়ের অন্ধ অনুকরণ না করলে বেশ বোঝা যায়। পুরুষেরা তো সব বিষয়ে নারীর সমান হতে চেষ্টা করেন না, হওয়া সম্ভব বলেও মনে করেন না। নরনারীর শরীর-গঠনে যেমন স্বাভাবিক তফাৎ আছে, তাদের বুদ্ধির ও মনের ধরণ-ধারণে তেমনই অনেক রকম স্বাভাবিক প্রভেদ আছে। সেগুলি কিছুতেই সম্পূর্ণভাবে দূর করা যায় না।

বুদ্ধিতে হীন হলেও নারী মনুষ্যত্বে শ্রেষ্ঠ

নর যেমন বুদ্ধি ও মানসিক ক্ষমতায় বড়, নারী তেমনি স্নেহ, প্রেম, দয়া, মায়া, সেবা, যত্ন, ধর্ম্মপিপাসা ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় এবং দুঃখ, কষ্ট, বেদনা, অনাহার, অনিদ্রা, প্রভৃতি সহ্য করার ক্ষমতায় বড়। কে না স্বীকার করবেন যে, বুদ্ধিও জ্ঞান রাজ্যে প্রতিভার চেয়ে মানুষের জীবনে ঐ সব গুণের দাম বেশী? তাই আমরা মেধা, প্রজ্ঞা ও প্রতিভার অধিকারীর চেয়ে ঐ সব সুকুমার ও মধুর গুণের অধিকারীকে স্বভাবতঃই বড় করে দেখি। তবে স্নেহ প্রেম প্রভৃতির অধিকারীর পক্ষে মেধা প্রভৃতির নূন্যতার জন্য লজ্জিত হওয়ার বা আক্ষেপ করার কি আছে? শারীরিক শক্তির চেয়ে আমরা শারীরিক কৌশলকে, আবার তার চেয়ে মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতাকে, বড় বলে মনে করি। তাই পালোয়ানের চেয়ে ভাল দরজী বা শিল্পী, তার চেয়ে গাইয়ে বাজিয়ে ও তার চেয়ে ক্রমান্বয়ে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, পরার্থপরায়ণ, প্রেমিক ও সাধু মহাত্মা শ্রেষ্ঠতর বলে গণ্য। অতএব মেধা, মনীষা ও প্রজ্ঞাতে হীন হলেও, নারী যখন এদের চেয়ে উঁচুদরের গুণাবলীর অধিকারিণী, তখন ত তাঁরাই বড়। তাই পুরুষ চিরকাল নারীর গুণে মুগ্ধ ও তার পদানত। অতএব নারীরই জিত।

প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়

শ্রীহরিহর শেঠ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ

পূর্ব্বানুবৃত্তি

(২)

রাজা দেবী সিংহ—রায় দেওয়ালি সিংহের পুত্র দেবী সিংহ পলাশি যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা ঠিক পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। তিনি তৎকালে ক্লাইবের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। এই সময় ইংরাজ কোম্পানী সামান্য ব্যবসায়ী হইতে দেশশাসকের আসন গ্রহণ করিতে-ছিলেন। তখন তাঁহাদের খাজনা আদায়ের উপযুক্ত লোকজন ছিল না। এই সময় দেবী সিংহ সুদীর্ঘকাল ধরিয়া অতি বিশ্বাসের সহিত কোম্পানীর এই কার্য্য করেন। কোম্পানীর কলিকাতার অধ্যক্ষগণের বিবেচনায় এ বিষয়ে তাঁহার অপেক্ষা যোগ্যতর লোক তখন আর কেহ ছিল না। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি দেওয়ান নিযুক্ত হন। এই সকল কার্য্যে তিনি অতুল যশের সহিত বহু অর্থও উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে কোম্পানী একটী অভিযোগ আনয়ন করায় বহু দিন তাঁহাকে বিব্রত থাকিতে হইয়াছিল। যাহা হউক পরে তিনি নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হন এবং রাজা হইতে মহারাজা উপাধিতে ভূষিত হন। দেওয়ালি সিংহ নশীপুরে প্রথম বাস স্থাপন করিলেও রাজা দেবী সিংহ হইতেই নশীপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠা বলিতে পারা যায়।

* * *

আনন্দকৃষ্ণ বসু—ইনি রাজা স্যর রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র; ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর ন্যায় ইংরাজী ভাষায় পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার সময়ে খুব কমই ছিলেন। ইহাঁর বহু ভাষায় ব্যুৎপত্তি ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি মনীষিগণ ইহাঁর নিকট ইংরাজি শিক্ষা করিয়াছিলেন। অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি ইহাঁর দ্বারা বক্তৃতাদি লিখাইয়া লইতেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সহিত ইনি নিরভিমান ও অহঙ্কারশূন্য ছিলেন।

* * *

রাধানাথ শিকদার—১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে যোড়াসাঁকোর শিকদারপাড়ায় ইহাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম তিতুরাম শিকদার। ইহাঁরা ব্রাহ্মণবংশ-সম্ভূত কলিকাতার অতি প্রাচীন অধিবাসী, বংশ-পরম্পরা ক্রমে মুসলমান নবাবদিগের সময় শিকদার বা পুলিস কমিশনরের কাজ করার জন্য এই উপাধি। রাধানাথ প্রথমে ফিরিঙ্গী কমল বসুর স্কুলে ও পরে হিন্দু কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনিও ডিরোজিওর শিষ্যদলের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সার্ভে অফিসে একটী সামান্য চাকুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া পরে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বহু বৎসর নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। সে সময় তিনি ৬০০৲ টাকা বেতন পাইতেন। তাঁহার

আনন্দকৃষ্ণ বসু

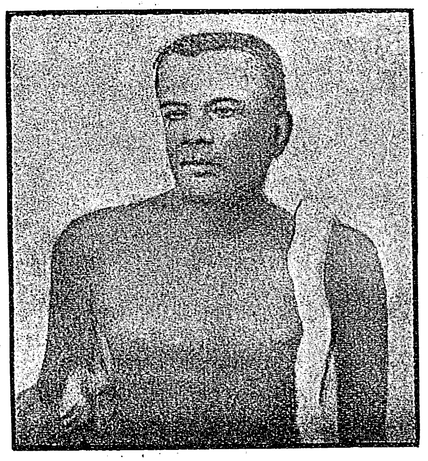

তেজস্বিতা, আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান ও কার্য্যদক্ষতা প্রভৃতি গুণের জন্য তিনি ইংরাজদিগের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তিনি বঙ্গভাষার একজন সুহৃদ ছিলেন। তিনি প্যারীচাঁদ মিত্রকে সরল সহজ বাঙ্গালা লিখিবার জন্য প্ররোচনা দান করেন। উভয়ের সম্পাদকতায় "মাসিক পত্রিকা" নামক একখানি পত্রিকা কিছুদিন প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই। জীবনের শেষ দশায় চন্দননগরের গোন্দলপাড়ায় গঙ্গার ধারে একটি বাগানবাটী ক্রয় করিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। ১৮৭০ সালে সেই স্থানেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।

* * *

তারকনাথ প্রামাণিক—ইহাঁর পিতার নাম গুরুচরণ প্রামাণিক। গুরুচরণ দেবদ্বিজে বিশেষ ভক্তিমান এবং দীন-দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন। তিনি নিত্য বহু লোককে অন্ন দিতেন। তারকনাথ পিতার সমস্ত গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার ধাতবদ্রব্যের বিস্তৃত ব্যবসায় ছিল। তিনি উপার্জ্জিত অর্থের বহুল অংশ দানধ্যানে ব্যয় করিতেন। প্রতি একাদশীর দিন তিনি বহু দরিদ্রজনকে ভিক্ষা, আহারীয় ও বস্ত্র দান করিতেন। ১৮৭৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সাম্রাজ্ঞী উপাধি প্রাপ্তিতে কলিকাতার দরবারে সরকার কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন।

* * *

ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিবরাম সান্ন্যাল—নূতনবাজারের সান্ন্যাল বংশ পূর্ব্বে বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ছিল। এই বংশের শিবরাম যশোর হইতে আসিয়া কলিকাতায় প্রথম বাস স্থাপন করেন। হাটখোলার দত্তদের সহিত মিলিত হইয়া ব্যবসায় কার্য্যে লিপ্ত হওয়ায় তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। তিনি বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে চতুর্ব্বিংশতিটি নীলের কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি প্রায় ষাইট লক্ষ টাকার সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি দাতা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। মধুসূদন ও কালিদাস নামে দুই পুত্র রাখিয়া তিনি মারা যান। এই দুই সহোদর মামলা মোকদ্দমায় সম্পত্তির অধিকাংশ নষ্ট করেন।

* * *

রসিকলাল ঘোষ—ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষ কালীচরণ ঘোষ [চন্দন]নগরের ফরাসী গভর্ণমেণ্টের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার [পুত্র] রামদুলাল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম যুগে চন্দননগর [হই]তে কলিকাতায় আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। [তি]নি পোর্ত্তুগীজ সওদাগরদের কলিকাতার এজেণ্ট হইয়া [সৌ]ভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের [বেল]গেছিয়া ভিলা" নামক বাগানটি তাঁহারই সম্পত্তি [ছিল]। রামধন ঘোষ নামক তাঁহার একমাত্র পুত্রকে [রা]খিয়া তিনি ১০৮ বৎসর বয়সে গতায়ু হন। দেশীয়

রাজা দিগম্বর মিত্র

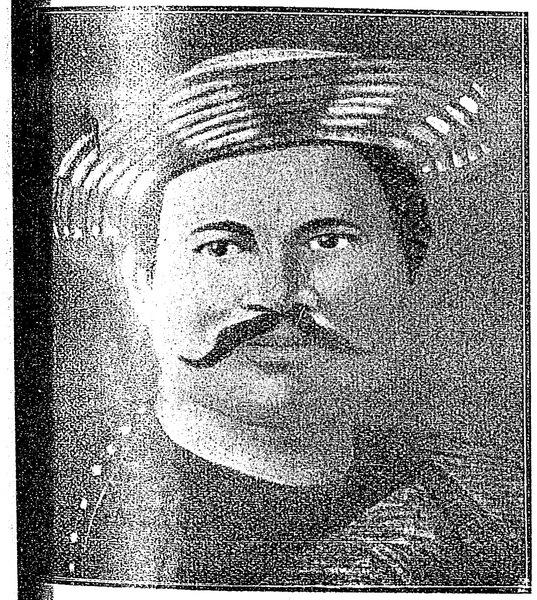

[...]দের মধ্যে তিনিই প্রথম বিহারপ্রদেশে নীল কুঠি স্থাপন [কর]েন। রসিকলাল ইহাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি ১৮১৪ [...] জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাজা রামমোহন রায়ের স্কুলে [...]শিক্ষা করেন। শিক্ষক রূপে কার্য্য আরম্ভ করিয়া [...]ডেণ্ট-এর প্রধান সহকারী পদে উন্নীত হন। তিনি [...] মাতৃভক্ত ও খাঁটি হিন্দু ছিলেন। বাটীতে ধুমধামের [...] সকল প্রকার পূজা করিতেন। তিনি দরিদ্রের [...]ছিলেন।

* *

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি ও ইহাঁর ভ্রাতা মহেশচন্দ্র তাঁহাদের সময়ে শিক্ষিত সমাজে খ্যাতনামা অধ্যাপক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ঈশানচন্দ্র ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি জেনারেল্ এসেম্বি্লস্ ইনষ্টিটিউশন্, হুগলী কলেজ, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে অধ্যাপকের কার্য্য করিয়াছিলেন।

* * *

নিধুরাম বসু—ইনি দেওয়ান নিধুরাম বলিয়া পরিচিত

অক্ষয়কুমার দত্ত

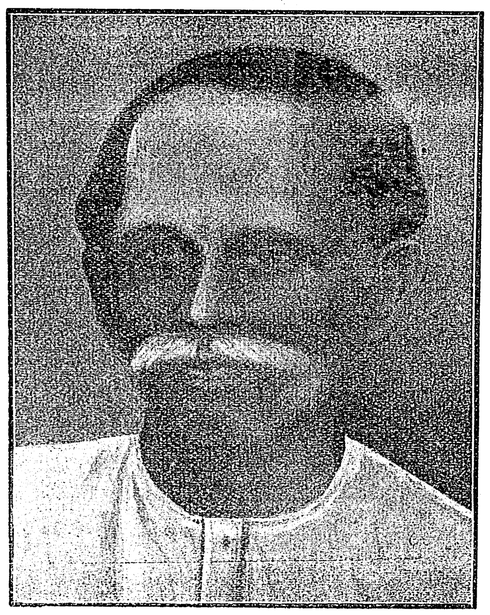

ছিলেন। বাগবাজারের দেওয়ান নিধুরামের বংশ অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত ছিল। ইংরাজ আগমনের বহু পূর্ব্বে ইনি মাইনগর হইতে বাগবাজারে আসিয়া বসতি করেন। ইহার ছয় পুত্র রাধাচরণ, রামচরণ, শ্যামচরণ, ভবানীচরণ কালীচরণ ও দেবীচরণ দাতব্য কার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে গোঁড়া হিন্দু ছিলেন।

* * *

রাধাকৃষ্ণ মিত্র—পিতার নাম কালীপ্রসাদ মিত্র। ইনি দর্জ্জিপাড়ায় বাস করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ রামদুলাল দের

TIGHT BINDING

জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। ইনি ধার্ম্মিক এবং একজন খাঁটি হিন্দু ছিলেন। কাশীতে ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি শিব-মন্দির আছে। ইহাঁর পুত্রদের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ আমেরিকান্ সওদাগরদের সহিত মিলিত হইয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

* * *

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ব্যারাকপুরের সন্নিকটবর্ত্তী মণিরামপুরে ১৮১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গোলকচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র ছিলেন। বাল্য-কালেই তিনি কলিকাতায় আনীত হন এবং হিন্দু কলেজে

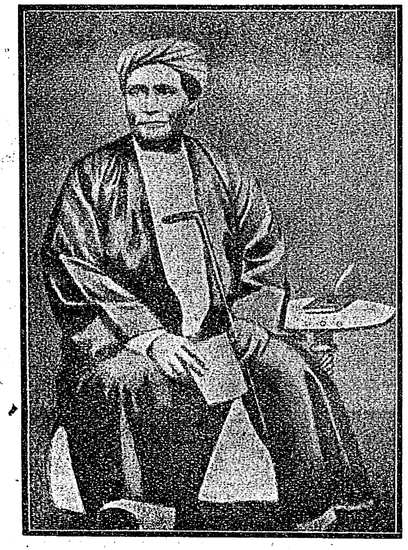

রাজেন্দ্র দত্ত

তাঁহাকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। তিনি একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং ১৫ কি ১৬ বৎসর বয়সে বিদ্যালয় হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হন। পিতার অবস্থার অসচ্ছলতা বশতঃ তিনি পাঠ শেষ করিবার পূর্ব্বেই বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার বয়ঃক্রম যখন একবিংশতি বৎসর, তখন ডেভিড্ হেয়ারের বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য্য প্রাপ্ত হন এবং ছাত্রবন্ধু ডেভিডের কৃপায় তিনি প্রত্যহ দুই ঘণ্টা করিয়া মেডিক্যাল কলেজে পড়িবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। জানা যায় তাঁহার স্ত্রীর হঠাৎ কঠিন পীড়া হওয়ায় চিকিৎসক আসিতে বিলম্ব হয় এবং সেই সময় তাঁহার মৃত্যু ঘটায় তাহার চিকিৎসা-বিদ্যায় অনুরাগ জন্মে। মিঃ জোন্স (Mr. Jones) যখন হেয়ার স্কুলের অধ্যক্ষ হন তখন দুর্গাচরণের মেডিক্যাল্ কলেজে পাঠের সুযোগ করিয়া দেন। ইহাতে তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদ ত্যাগ করেন এবং পরে পাঁচ বৎসর মেডিক্যাল্ কলে অধ্যয়ন করেন, কিন্তু এখানেও পাঠ শেষ করার পূর্ব ছাড়িয়া দিতে হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সময় ফোর্ট্ উইলিয়মে ৮০৲ টাকা বেতনের একটি যোগাড় করিয়া দেন। এই সময় তিনি প্রাতে ও বৈ চিকিৎসা করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে এই ছাড়িয়া দেন এবং স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় আ

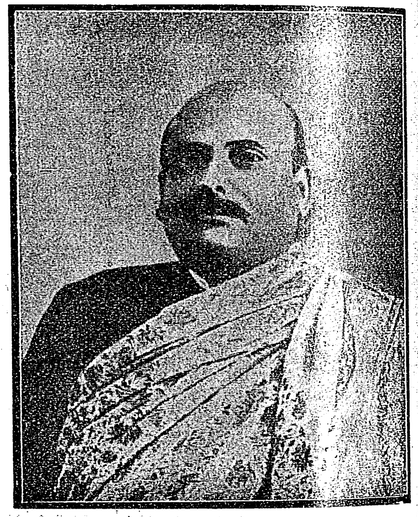

রায় পশুপতিনাথ বসু

করেন। অতি শীঘ্র সুচিকিৎসক বলিয়া তাঁহার নাম লাভ করে, এবং তিনি দশ বৎসরের মধ্যে এক লক্ষ টা অধিক উপার্জ্জন করেন। তাঁহার সময়ে তাঁহার হা নির্ণয় করিবার ক্ষমতা কোন চিকিৎসকের ছি ১৮৭০ সালে তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটে। সার সুরে বন্দ্যোপাধ্যায় ইঁহারই পুত্র।

* * *

রূপচাঁদ রায়—তিনি বেনিয়ানের কাজ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। বড়বাজারে তাঁহার ছিল। তাঁহার নামে একটী রাস্তা আছে।

* * *

রাজা দিগম্বর মিত্র—রাজা দিগম্বর মিত্র হইতেই নিয়ার মিত্র-বংশের খ্যাতি-প্রতিপত্তি। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজে শিক্ষিত তিনি ইংরাজি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া-লন। প্রথম আমিনরূপে ইনি মুর্শিদাবাদে কার্য্য ন এবং তথায় ক্রমে রাজা কৃষ্ণনাথের গৃহশিক্ষক ও তাঁহার বিস্তৃত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। র কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া রাজা তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা ার স্বরূপ দান করেন। ইহা অবলম্বন করিয়াই প্রথমে ও পরে রেশমের কাজ এবং তৎপরে জমিদারী দ্বারা ত সৌভাগ্যের অধিকারী হন। যৌবনকাল হইতেই নি ঠাকুর পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার াগ পাইয়াছিলেন এবং খ্যাতনামা দ্বারকানাথ ঠাকুর

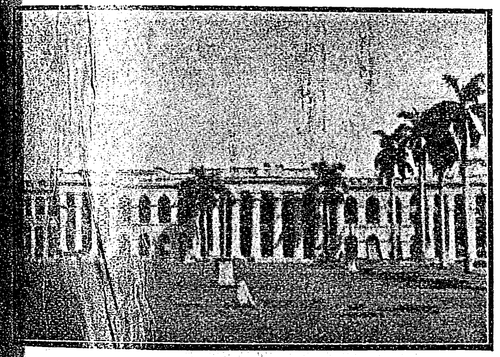

রায় পশুপতিনাথ বসুর বাটী

শয়ের নিকট হইতেই তিনি রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ রিয়াছিলেন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের তিনি ম সহকারী সম্পাদক হইয়া পরে তাহার সভাপতি ন্ত হইয়াছিলেন। তিনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট্, জিস্লেটিভ কাউন্সিলের সদস্য, ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবল্ সাইটির সম্পাদক ও কলিকাতার প্রথম দেশীয় সেরিফ্ ক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সরকার কর্ত্তৃক রাজা ও আই ই উপাধি ভূষিত হন। তিনি তাঁহার জীবন-লে বহু ছাত্রকে ভরণ-পোষণ করিতেন। তাঁহার এক পুত্র গিরীশচন্দ্র বিদ্যাশিক্ষার্থ বিলাতে প্রেরিত হন, এবং য় তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা তাঁহার দুই পৌত্র—কুমার মন্মথনাথ ও কুমার নরেন্দ্রনাথকে রিয়া মারা যান।

* * *

মদনমোহন দত্ত—ইনি হাটখোলার বিখ্যাত দত্তবংশ-সম্ভূত। ইহাঁরা বালির দত্ত বলিয়া খ্যাত। মদনমোহনের পূর্ব্বপুরুষ গোবিন্দশরণ দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া প্রথম আন্দুল হইতে গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করেন। ইহাঁর বাস হইতেই গোবিন্দপুর নামের উৎপত্তি এইরূপ প্রবাদ। কথিত আছে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত তাঁহাদের সম্পত্তি অদলবদল করিয়া তাঁহারা হাটখোলায় উঠিয়া আইসেন। গোবিন্দশরণের পৌত্র রামচন্দ্র ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমদানী রপ্তানি গুদামের মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। মদনমোহন অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ

প্রাণনাথ দত্ত

ও দানশীল ছিলেন। ইহাঁরই চেষ্টায় রামদুলাল দে বিদ্যায় ও ধনে এতাদৃশ সমৃদ্ধ হইয়াছিলেন। আমতা, মেদিনীপুর, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত যে সকল কীর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে গয়ার প্রেতশীল পাহাড়ের সোপান শ্রেণী তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। পাটনায় পাটনেশ্বরীর মন্দির এই বংশসম্ভূত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পাটনার দেওয়ান জগৎরামের কীর্ত্তি। পানিহাটি কোন্নগরের গঙ্গাপার্শ্বস্থ ঘাট ও দ্বাদশ মন্দিরও এই বংশের কীর্ত্তির পরিচায়ক।

* * *

অক্ষয়কুমার দত্ত—১৮২০ সালে নবদ্বীপের সন্নিহিত চুপী নামক গ্রামে অক্ষয়কুমার জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর

পিতা পীতাম্বর দত্ত বিষয়-কর্ম্ম উপলক্ষে খিদিরপুরে আসিয়া বাস করেন। প্রথমে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ করিয়া ইনি গৌরমোহন আঢ্যের "ওরিএণ্টাল্ সেমিনারী"তে ইংরাজি শিক্ষা করেন। কিন্তু তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ ঘটায় তাঁহাকে লেখাপড়া ছাড়িতে হয়। অভাবের তাড়নায় অল্প বয়স হইতেই তাঁহাকে ধনোপার্জ্জনের জন্য ব্যস্ত হইতে হইলেও জ্ঞানার্জ্জনের প্রবল স্পৃহা বশতঃ বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট হইতে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া শিক্ষা করিতে তাঁহাকে বহু ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তিনি প্রথম তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষক রূপে মাসিক আট

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার

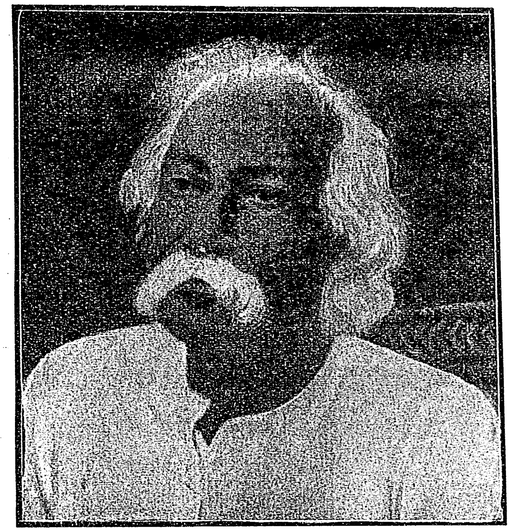

টাকা বেতনে শিক্ষকতা করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইলে তিনি তাহার সম্পাদক হন। এই সময় তিনি কিছুদিন মেডিক্যাল্ কলেজে অতিরিক্ত ছাত্ররূপে অধ্যয়ন করিয়া উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা প্রভৃতিতে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনীর সাহায্যে তিনি দেশীয়গণের জ্ঞানোন্নতির জন্য তাঁহার দেহ মন নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তিনি কয়েকখানি গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১৮৫৫ সাল হইতে তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হন। জীবনের শেষবস্থায় তিনি বালি গ্রামের গঙ্গাতীরবর্ত্তী এক উদ্যান-বাটীতে বাস করিতে থাকেন। ১৮৮৬ সালে তাঁহার দেহান্ত হয়।

* * *

রাজেন্দ্র দত্ত—১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ অক্রূর দত্তের বংশে তিনি জন্মগ্রহণ কারন। তিনি প্রথমে ড্রা... সাহেবের বিদ্যালয়ে এবং পরে হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন। এখানকার শিক্ষা শেষ করিয়া কিছুকাল মেডিক্যাল কলেজের অতিরিক্ত ছাত্ররূপে উপদেশ শ্রবণ করেন। চিকিৎসার দ্বারা লোকের দুঃখদূর ও পরোপকার-ব্রতে আত্মনিয়োজিত করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার প্রয়াস। বিষয়-কার্য্যে প্র... হইয়া কিছুদিন সওদাগর অফিসে বেনিয়ানের কাজ

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন অ... সায়ান্স

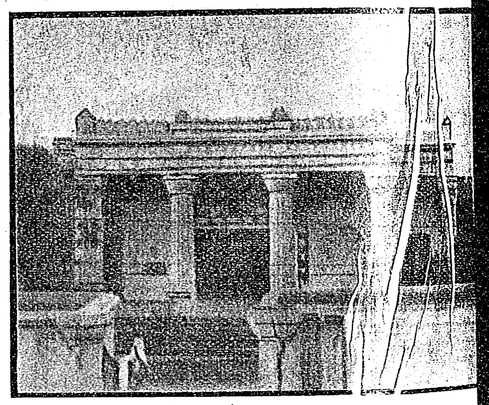

করিলেও তিনি সুপ্রসিদ্ধ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত মিলিত হইয়া নিজ বাটীতে একটী এলোপ্যাথিক ঔষধালয় স্থাপন করিয়া দরিদ্রদের চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ আরম্ভ করেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রচারের জন্যও তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইয়োরোপ হইতে আগত ডাক্তার টন্যার (Dr. Tonnere) ডাক্তার বেরিনি (Dr. Beriegny)কেও এ বিষয় তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য কার্য্য—তৎকালীন প্রসিদ্ধ বারাঙ্গনা হীরা বুলবুলের পুত্রকে হিন্দু-কলেজে ভর্ত্তি করায় সহরের মধ্যে যখন মহা আন্দোলন

সৃষ্টি হয়, তখন ১৮৫৩ বা ৫৪ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু মেট্রপলিট্যান্ কলেজ নামে যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়, রাজেন্দ্রবাবুই তাহার অগ্রণী ছিলেন। তিনি এই কলেজের অধ্যক্ষতা করিবার জন্য ক্যাপ্টেন ডি, এল্, রিচার্ডশন্‌কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কালগ্রাসে পতিত হন।

* * *

রায় পশুপতিনাথ বসু—১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাগবাজারের প্রসিদ্ধ বসুবংশসম্ভুত। পাটনা, গয়া, লোহারডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে তাঁহার জমিদারীর তত্ত্বাবধানে তাঁহার জীবনের অনেকটা অংশ অতিবাহিত হইলেও তিনি কলিকাতার অনেক জনহিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি দয়ালু ও পরোপকারী ছিলেন। বাগবাজারের "পল্লী সমিতি" তাঁহার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয় সঙ্গীত সমাজের তিনি একজন আজীবন সভ্য ছিলেন। তিনি বাগবাজারে একটি দাতব্য

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

কুমার কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (লালা বাবু)

দেওয়ান রামকমল সেন

চিকিৎসালয় খুলিয়া বহু লোকের উপকার করিয়াছিলেন। প্রায় ২৫ বৎসর ধরিয়া তিনি বহু দরিদ্র ছাত্রকে বাটীতে রাখিয়া ভরণপোষণ করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা কর্পো-রেশনের একজন কমিশনর ছিলেন এবং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। তিনি কংগ্রেসের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৯০৭ সালে তিনি মারা যান।

* * *

প্রাণনাথ দত্ত—হাটখোলার দত্ত-বংশের লোকনাথ দত্তের পুত্র প্রাণনাথ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ওরিয়েণ্ট্যাল্ সেমিনারি ও হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন। তিনি ইংরাজি, বাঙ্গলা, সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। "বিবিধার্থ সংগ্রহ", "রহস্য সন্দর্ভ" ও অন্যান্য যে সব সাময়িক পত্রিকা ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইত, পরে প্রাণনাথ সে সকলের সম্পাদক হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি ইয়োরোপে দেশীয় উৎপন্ন-বস্তু রপ্তানির জন্য প্রাণনাথ দত্ত চৌধুরী নামে এক ব্যবসা খোলেন। তৎপরে একটী ছাপাখানা, লোহা ঢালাই প্রভৃতির কাজও করেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্ব্বাচিত সদস্যের পদের

সৃষ্টি হইলে তিনি প্রথম দলেই নির্ব্বাচিত হন এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের এবং ইণ্ডিয়ান্ ইউনিয়নেরও সভ্য ছিলেন। এই সকলের সহিত সংযুক্ত থাকিয়াও তিনি সাহিত্যের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করেন নাই। তিনি এই সময় "বসন্তক" নামে একখানি হাস্যরসপূর্ণ বিদ্রূপাত্মক সচিত্র মাসিক প্রকাশ করেন। বাঙ্গালা ভাষায় এই শ্রেণীর পত্রিকা ইহাই প্রথম। ইহার বহুল প্রচার হইয়াছিল এবং তৎকালীন বিদ্বজ্জন সমাজে বিশেষ সমাদৃত

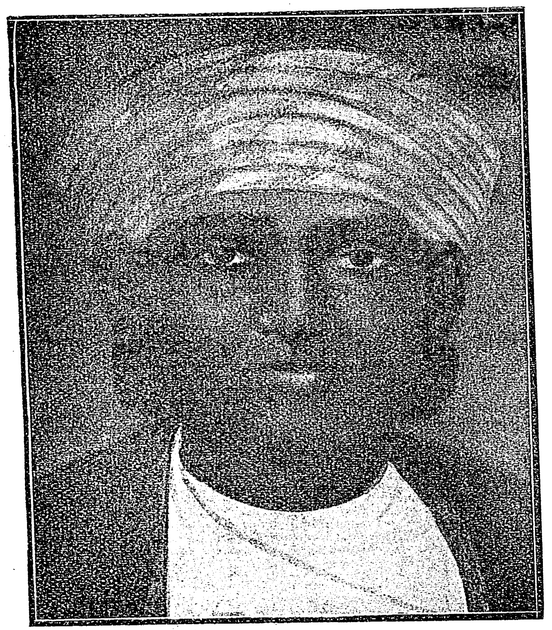

মতিলাল শীল

হইয়াছিল। সংস্কৃতের সহিত ইংরাজি ভূমিকা সম্বলিত গ্রন্থ তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন। ব্যবসায়ে লোকশান ও তাঁহার পুত্র কৃপানাথের স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়া হেতু হাটখোলা হইতে কাশীপুরের দিকে যাইয়া বাস করেন। তথায় অবস্থানকালে তিনি বিশেষ চেষ্টার দ্বারা কাশীপুর ও চিৎপুর কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্ভুক্ত হইতে না দিয়া স্বতন্ত্র মিউনিসিপ্যালিটী সৃজনে সমর্থ হন। ১৮৮৮ সালে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে।

* * *

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার—হাওড়ার অন্তর্গত পাইকপাড়ায় ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মহেন্দ্রলালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামতারক সরকার। মহেন্দ্রলাল শৈশবেই মাতৃহীন হওয়ায় কলিকাতায় নেবুতলায় তাঁহার মাতুলালয়ে প্রতিপালন হন। হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজের পাঠ শেষ করিয়া তিনি মেডিক্যাল্ কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং তথায় ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এম-ডি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি এলোপ্যাথিতে শিক্ষালাভ করিলেও কয়েক বৎসরের মধ্যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া উঠেন এবং এ সম্বন্ধে তিনি নিজ মত প্রচারের জন্য

রামগোপাল ঘোষ

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে Calcutta Journal of Medicine নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত উহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের প্রধান কীর্ত্তি Indian Association for the Cultivation of Science নামক বিজ্ঞান সভার প্রতিষ্ঠা। ১৮৭৬ সালে তদানীন্তন ছোট লাট স্যার রিচার্ড টেম্পলের সহায়তায় ইহার উদ্বোধন হয়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, সেরিফ্, লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য, মিউনিসিপ্যাল্ কমিশনর, এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ও যাদুঘরের ট্রাষ্টী ছিলেন। সরকার

তাঁহাকে সি-আই-ই উপাধি ভূষিত করিয়াছিলেন। কলেরা ও প্লেগ সম্বন্ধে তাঁহার দুইখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বৈদ্যনাথে তাঁহার স্ত্রীর নামে রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। ১৯০৪ সালে তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

* * *

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু—১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার ইন্সবা গ্রামে মাতামহের আলয়ে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি হুগলী কলিজিয়েট্ স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে চুঁচুড়ার অক্ষয়কুমার সরকারের সাধারণী পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে শিক্ষানবিশ রূপে প্রবেশ করেন। এই স্থান হইতেই তাঁহার সংবাদপত্র পরিচালনায় শিক্ষা লাভ হয়। তৎপরে কলিকাতায় গমন করেন এবং তথা হইতে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র "বঙ্গবাসী" প্রকাশ করেন। তিনি একখানি বাঙ্গালা দৈনিকও প্রকাশ

রমেশচন্দ্র দত্ত

করিয়াছিলেন। কিন্তু দশ বৎসর কোনরূপে রাখিয়া উহা বন্ধ করিতে বাধ্য হন। তৎপরে তিনি টেলিগ্রাফ্ নামে ইংরাজিতে একখানি সান্ধ্য সুলভ দৈনিক প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে হিন্দুধর্ম্মের বহু শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের রচিত

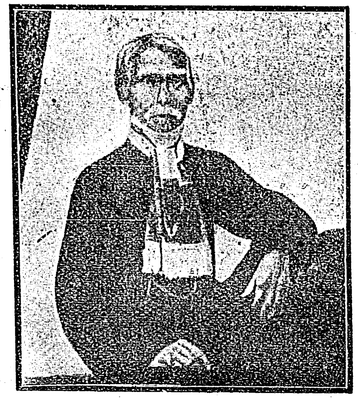

শিবচন্দ্র দেব

রাজলক্ষ্মী, মডেল ভগিনী প্রভৃতি গ্রন্থগুলিও বিশেষ আদৃত ছিল। ১৯০৫ সালে তিনি পরলোক প্রাপ্ত হন।

* * * *

রসময় দত্ত

দ্বারকানাথ গুপ্ত—ইনি সাধারণতঃ ডি, গুপ্ত বলিয়া খ্যাত। ইনি মেডিক্যাল্ কলেজের একজন পুরাতন ছাত্র।

ইহাঁর পেটেণ্ট জ্বরঘ্ন ঔষধ, যাহাকে সচরাচর লোকে ডি-গুপ্ত বলিয়া থাকে, তাহাই ইঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। এই ঔষধ বিক্রয় দ্বারা তিনি প্রচুর অর্থও উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

* * * *

লালাবাবু—ইহাঁর প্রকৃত নাম ছিল কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ। ইনি পাইকপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান্ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র ছিলেন। তিনি সংস্কৃত, ফার্সি ও আরবি ভাষায় বিশেষ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নানাকারণে অতি-সম্ভ্রান্ত ছিল, দানে ইহা বিখ্যাত ছিল। কথিত আছে গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহার

গোবিন্দচন্দ্র দত্ত

মাতৃশ্রাদ্ধে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন এবং লালাবাবুর অন্ন-প্রাশনের সময় সোনার পাতে লিখিয়া পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি রামচন্দ্রপুরে চারিটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র প্রাণকৃষ্ণ গঙ্গাগোবিন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার পিতৃব্য অপুত্রক রাধাকান্তেরও সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হন। কৃষ্ণচন্দ্র এতাদৃশ ধনবানের পুত্র হইয়াও পিতার সহিত মনোমালিন্য ঘটায় স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন মনস্থ করিয়া পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানে গভর্ণমেণ্টের সেরিস্তাদারের পদে নিযুক্ত হন। তৎপরে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যখন উড়িষ্যা অধিকার করেন, তখন তিনি দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি প্রধানতঃ কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিস্তৃত সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার ধর্ম্মভাব প্রবল হইতে থাকে এবং পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন ও পণ্ডিতগণের সহিত আলাপনে রত হন। তৎপরে তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তন হয় এবং সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণের মানসে তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীনারায়ণের শিক্ষা ও সংসারের ব্যবস্থাদি করিয়া বৃন্দাবনধামে গমন করেন। তথায় তিনি পঁচিশ লক্ষ টাকা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রজীউর মন্দির নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য লইয়া যান। তাঁহার এই অর্থের কথা প্রচারিত

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

হওয়ায় তাঁহার বাটীতে লুণ্ঠন দ্বারা ডাকাইতেরা তিন লক্ষ টাকা লইয়া যায়। তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে এক মহা বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। মন্দিরের জন্য নিজ পছন্দমত প্রস্তর ক্রয় করিবার জন্য তিনি স্বয়ং রাজপুতানায় গিয়াছিলেন। একজন স্থানীয় রাজাকে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা-দায়ক সন্দেহ করিয়া তথাকার পলিটিক্যাল্ এজেণ্ট মিঃ মেট্‌কাফ্ তাঁহাকে দিল্লীতে লইয়া যান! তথায় অনুসন্ধানে নির্দ্দোষ প্রমাণ হওয়ায় তিনি তাঁহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দিল্লীর সম্রাটের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। সম্রাট তাঁহাকে মহারাজা উপাধি দান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি নিজেকে সর্ব্বত্যাগী ভিখারী জানাইয়া তাহা

গ্রহণের অনিচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তখন তিনি সত্যই "মাধুকরী" ব্রত গ্রহণ করিয়া ভিক্ষা দ্বারা উদর পোষণ

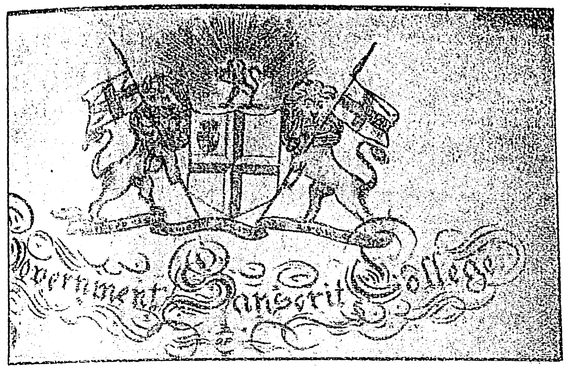

সংস্কৃত কলেজের প্রাবরণ চিত্র

করিতেন। ৪০ বৎসর বয়সে অপঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মন্দির বৃন্দাবনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আড়ম্বর-পূর্ণ ও উচ্চ। কথিত আছে, লালাবাবু একদিন হঠাৎ একজনের মুখে কথা প্রসঙ্গে 'বেলা গেল' এই কথাটি শুনিবামাত্র তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল। তাঁহার স্ত্রী রাণী কাত্যায়ণীও অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন।

* * * *

শোভারাম বসাক—পলাশী যুদ্ধের সময়ের তিনি একজন বিখ্যাত ধনী ও ব্যবসায়ী ছিলেন। সপ্তগ্রাম হইতে আসিয়া তাঁহারা সুতানুটীতে বাস স্থাপন করেন। কথিত আছে হলওয়েল সাহেব শ্যামবাজার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া চার্লস্ বাজার নাম রাখেন, কিন্তু শোভারাম চেষ্টা করিয়া তাঁহার নিকট আত্মীয় শ্যাম বসাকের নামে পুনরায় ইহা শ্যামবাজারে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। শোভারামের নামে কলুটোলায় একটি ষ্ট্রীট, ও বড়বাজারে একটী লেন্ আছে।

* * * *

রামকমল সেন—ইনি সুবিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ; ১৭৯৫ অথবা ৯৬ খৃষ্টাব্দে গৌরীভা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮০১ সালে শিক্ষার জন্য কলিকাতায় আইসেন। প্রথম কতিপয় বৎসর তিনি কয়েকটী সাহেবদের ছাপাখানায় কার্য্য করেন। তৎপরে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে একটি কর্ম্ম পান। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কেরাণীরূপে এসিয়াটিক্

রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর

দেওয়ান ও বেঙ্গল ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দুকলেজ স্থাপিত হইলে তাহার কমিটিতে ছিলেন।

কুঞ্জবিহারী মল্লিক

কিছুদিন নবপ্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। মেডিক্যাল্ কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে যে মেডিক্যাল্ কমিশন্ নিযুক্ত হয় তিনি তাহার সভ্য ছিলেন। তিনি

একখানি উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী অভিধান প্রকাশ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

* * * *

মতিলাল শীল—১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা চৈতন্যচরণ শীল কাপড়ের ব্যবসায় করিতেন। মতিলাল কিছু বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়াছিলেন মাত্র। ১৮১৫ সালে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে সামান্য একটী কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই স্থানে থাকিতেই ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে বোতল্ ও কর্কের ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং পরে তিনি জাহাজের মুচ্ছুদ্দির

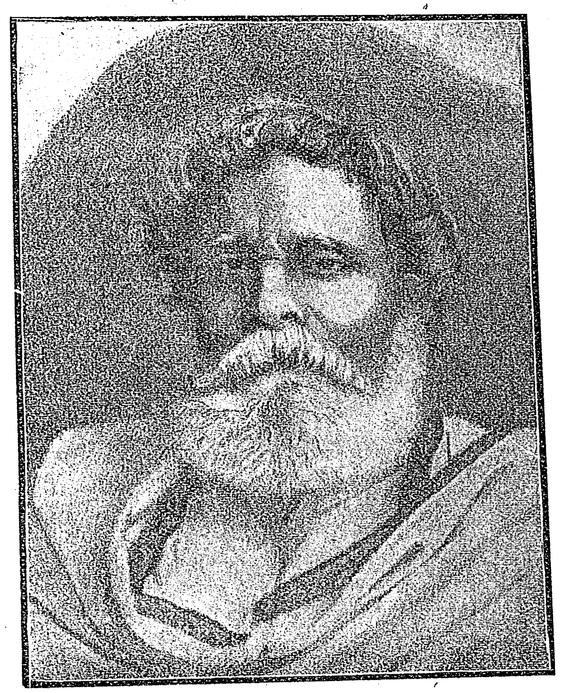

রাজনারায়ণ বসু

কার্য্য করেন। এই উভয় ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি কলিকাতায় কোম্পানীর কাগজের বাজারের হর্ত্তাকর্ত্তা হইয়া উঠেন। তিনি শিষ্ট, মিষ্টভাষী ও পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা মহাশয়ের উন্নতির আদি কালে তাঁহার সহিত যথেষ্ট সহযোগিতা ছিল। শীলস্ ফ্রী-কলেজ নামক যে অবৈতনিক বিদ্যালয়টি আছে, উহা তিনিই ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত করেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দেহান্ত হয়।

* * * *

রামগোপাল ঘোষ—ডিরোজিওর শিষ্যগণের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর তাঁহার অপেক্ষা কৃতি ও যশস্বী আর কেহ ছিলেন না। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে বেচু চাটুয্যের ষ্ট্রীটের বাটীতে রামগোপাল জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দেওয়ান রমাপ্রসাদ সিংহের পৌত্র ও গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের পুত্র ছিলেন। তাঁহাদের পৈত্রিক বাস ছিল হুগলী জেলার বাগাটী গ্রামে। তাঁহার পিতার অবস্থা মন্দ থাকায় পরের অর্থসাহায্যে লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। একাডেমিক্ এসোসিএশন্ নামক একটি সভা তাঁহার সময়ে স্থাপিত হয়,

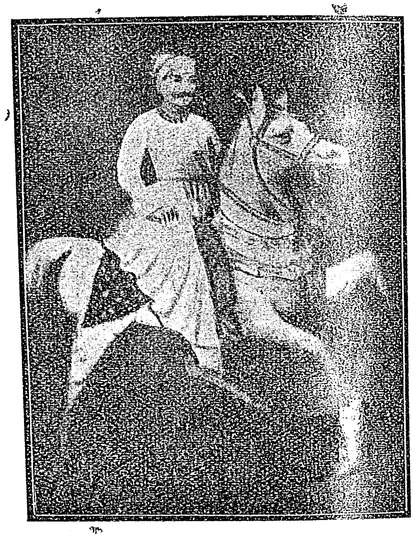

দেওয়ান শান্তিরাম সিংহ

তাহার সভ্যগণের মধ্যে তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন। এই সভাতেই তাঁহার বক্তৃতাশক্তির প্রথম বিকাশ হয়। তিনি কলেজে অধ্যয়ন কালেই ইংরাজি ভাষায় সুন্দর কথা কহিতে ও লিখিতে শিখিয়াছিলেন। এবং পাঠ শেষ করিবার পূর্ব্বেই ১৮৩২ সালে সোসেফ নামক একজন ধনবান ইহুদীর ব্যবসায় কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং পরে কেলসল্ ঘোষ এণ্ড কোং এবং অবশেষে নিজ নামে (R. G. Ghose & Co.) সওদাগরী কাজ করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে সুবক্তারূপেই তাঁহার প্রধান খ্যাতি। তাঁহার অদ্ভুত বক্তৃতাশক্তি দেখিয়া তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ মুগ্ধ

হইতেন। তিনি তাঁহার সময়ের সকল সভাসমিতি, রাজনীতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ডিরোজিওর শিষ্যদল মিলিত হইয়া "লিপি-লিখন সভা" (Epistolary Association) ও "সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জন সভা" (Society for the Acquisition of General Knowledge) নামে যে সভা স্থাপন করেন, রামগোপাল তাহার প্রধান উৎসাহী সভ্য ছিলেন। এই শেষোক্ত সভার সভ্যগণ কর্ত্তৃক "জ্ঞানান্বেষণ" নামক একখানি মাসিক প্রকাশিত হইত। রামগোপাল তাহার লেখকগণের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক ইংলণ্ড হইতে আনীত জর্জ টম্সন্ (George Thomson) সাহেবের উৎসাহে স্থাপিত ব্রিটিশ্ ইণ্ডিয়া সোসাইটী, যাহা পরে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিএশনে পরিণত হয়, ইনি তাহার একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। হেয়ার

প্রমথনাথ দেব (লাটু বাবু)

খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার নিকট তাঁহার বন্ধুগণের গৃহীত ৪০০০০৲ টাকা ঋণ তিনি ছাড়িয়া দেন।

* * * *

শিবচন্দ্র দেব—ইঁহার পিতার নাম ব্রজকিশোর দেব। শিবচন্দ্র ১৮১১ সালে কোন্নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ডিরোজিওর শিষ্যগণের মধ্যে তাঁহার ন্যায় সাধু পুরুষ খুব কমই ছিলেন। গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁহার শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ হইয়া হিন্দুকালেজে তাহার শেষ হয়। তথায় তিনি ১৬৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তিনি প্রথম সার্ভে অফিসে ৩০৲ বেতনে কার্য্য আরম্ভ করিয়া পরে দীর্ঘকাল ডেপুটী কলেক্টরের কার্য্য করেন। তিনি তাঁহার বাসগ্রামের উন্নতিকল্পে বহু কার্য্য করিয়াছিলেন। কোন্নগর হিতৈষিণী সভা, ইংরাজি স্কুল, বাঙ্গালা স্কুল, পোষ্ট অফিস, রেল-

নন্দলাল সিংহ

আশুতোষ দেব (সাতু বাবু)

ষ্টেশন, ডিস্পেন্সরি, ব্রাহ্মসমাজ, পুস্তকাগার প্রভৃতি তাঁহারই চেষ্টায় স্থাপিত হয়। ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার

বিষয়েও তিনি উদ্যোগী ছিলেন। বহু চেষ্টায় তিনি তাঁহার নিজ বাসভবনে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের পিতৃব্য হরিমোহন সেনের সহিত মিলিত হইয়া তিনি আরব্য উপন্যাস বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন এবং শিশুপালন ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

* * * *

রমেশচন্দ্র দত্ত—রামবাগানের প্রসিদ্ধ দত্ত বংশে ১৮৪৮ খৃঃঅব্দে রমেশচন্দ্রের জন্ম হয়। ইনি এই পরিবারের উজ্জ্বলতম রত্ন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ রসময় দত্তের ভ্রাতা পীতাম্বর

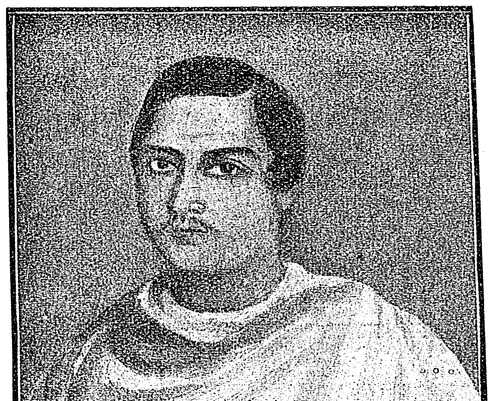

কালীপ্রসন্ন সিংহ

দত্তের পৌত্র ও ঈশানচন্দ্র দত্তের পুত্র। উক্ত রসময় বাবু সেকালের কোর্ট অব্ রিকোয়েষ্ট নামক বিচারালয়ের একজন বিচারক ছিলেন। এই দত্ত বংশেই সুপ্রসিদ্ধা তরুদত্ত ও অরুদত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই তাঁহাদের পিতা গোবিন্দদত্তের সহিত বিদ্যাশিক্ষার্থ ইংলণ্ডে গমন করেন। ইনি রসময় দত্তের পুত্র ছিলেন। ইহাঁরা ইংরাজি ও ফরাসী ভাষায় উত্তমরূপে শিক্ষা পাইয়াছিলেন। ইহাঁরা ইংরাজীতে বহু কবিতা লিখিয়াছিলেন। তরু ফরাসী ভাষায় একখানি উপন্যাসও লিখিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্র ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে সিবিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত যান এবং ৬৯ খৃষ্টাব্দে সিভিলিয়ান্ হইয়া এ দেশে আইসেন। তিনি একে একে বহু স্থানে ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টরের কাজ করিয়া, শেষে ১৮৯৪ অব্দে ডিভিসন্যাল কমিশনর পদে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালী এই পদ প্রাপ্ত হন নাই। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ইনি সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে C. I. E. উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। সরকারী কার্য্যে অবসর গ্রহণ করিলেও তিনি পুনরায় লণ্ডন্ ইউনিভার্সিটির ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তথা হইতে ফিরিয়া বরোদা রাজ্যে প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হন।

রামদুলাল দেব (সরকার)

এ কার্য্যে তিনি যথেষ্ট যশোলাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের তিনি প্রথম সভাপতি হইয়াছিলেন। এ সমস্ত বিষয় ছাড়িয়া দিলেও তাঁহার পাণ্ডিত্য ও গবেষণা-পূর্ণ ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও বঙ্গবিজেতা, মাধবীকঙ্কণ, সমাজ প্রভৃতি উপন্যাসগুলি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। বাঙ্গলা ১৩১৬ সালে তাঁহার দেহান্ত হয়।

* * *

নীলমণি মিত্র—ইনি পলাশী আমলের লোক, কোম্পানীর অধীনে চাকুরী করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

নবাব কর্ত্তৃক কলিকাতা লুণ্ঠনের পর সহরবাসীদের ক্ষতিপূরণের জন্য যে কমিশন বসে নীলমণিবাবু তাহার একজন সদস্য ছিলেন। দরজীপাড়ায় তাঁহার বাটী এখনও বর্ত্তমান আছে। যে রাস্তায় তাঁহার বাটী, তাহার নাম নীলমণি মিত্রের গলি।

* * *

রাজা গুরুদাস—ইনি মহারাজ নন্দকুমারের পুত্র, নবাব মীরজাফরের আমলে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত ছিলেন। পিতার ফাঁসির পর তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদ চলিয়া যান। কথিত আছে বর্ত্তমান বিডন গার্ডেন যে স্থানে আছে, তথায় তাঁহার আবাস-ভবন ছিল।

* * *

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—১২২৭ সালে বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থা ভাল ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র নয় বৎসর বয়সে বীরসিংহ হইতে পিতার সহিত পদব্রজে কলিকাতায় আগমন করেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইয়া ব্যাকরণ, স্মৃতি, সাহিত্য, অলঙ্কার, ন্যায় প্রভৃতিতে দক্ষতা লাভ করিয়া কলেজ হইতে বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। ১৮৪১ অব্দে ৫০৲ টাকা বেতনে ফোর্ট্-উইলিয়ম্ কলেজের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন। ইংরাজী জানা না থাকায় এখানে সাহেবদের পড়াইবার অসুবিধা হওয়ায়, তিনি এই সময় ইংরাজী ও হিন্দী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই উভয় ভাষায় সুদক্ষ হন। ৪৬ সালে তিনি সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত হন এবং ৪৯ সালে পুনরায় ফোর্ট্ উইলিয়ম্ কলেজের অধ্যাপক হন। ১৮৫০ সালে তিনি আবার সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন এবং পর বৎসর অধ্যক্ষের পদ সৃষ্ট হইলে ১৫০৲ টাকা বেতনে ঐ পদে বরিত হন। পরে তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইয়া ৩০০৲ হয়। এই সময় Special Inspector of Schoolsএর কাজও তাঁহাকে করিতে হইত, এ জন্য মোট ৫০০৲ টাকা পাইতেন। এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকার কালে ছোট লাট হ্যালিডের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি নানা স্থানে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়েই হিন্দু বালবিধবাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তিনি নির্ভীক হৃদয়ে গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করাইয়া লন। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন। তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর সাহেবের সহিত মনোবাদ ঘটায় তিনি এক কথায় পাঁচ শত টাকার চাকরীতে ইস্তফা দেন।

বিদ্যাসাগরের সকল পরিচয় দিবার স্থান এখানে নাই। তাঁহার মত পরদুঃখকাতর দাতা অধুনা খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মত বঙ্গভাষার সুহৃদও দেখা যায় না। তিনি বর্ণ-পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া বহু বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষা তাঁহার দ্বারা নূতন শ্রী লাভ করিয়াছে এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। নিজ রচিত পুস্তক বিক্রয় দ্বারা তিনি বহু অর্থও উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থই তিনি দানকার্য্যে ব্যয় করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় তিনি ছয় মাস কাল অন্ন বস্ত্র দিয়া শত সহস্র লোককে রক্ষা করিয়াছিলেন। মেট্রপলিটান্ কালেজ তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তি। তিনি বীরসিংহ গ্রামেও একটী উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই সকল কার্য্যের জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি-আই-ই উপাধি দান করিয়াছিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তি ঘটে।

* * *

অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—ইনি হুগলী জেলার ভাঙ্গা-মোড়া গোপীনাথপুরের দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র। ইনিই কলিকাতায় আসিয়া বাস স্থাপন করেন। ১৮২৯ সালে অনুকূলচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়া সিনিয়র স্কলারশিপ প্রাপ্ত হন। তিনি প্রথম হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট্ আদালতে নাজির রূপে কার্য্য আরম্ভ করিয়া ১৮৭০ সালে সিনিয়র গভর্ণমেণ্ট প্লিডার হন এবং অতি অল্পকাল পরেই অনারেবল দ্বারকানাথ মিত্রের পরলোক প্রাপ্তি হইলে তিনি হাইকোর্টের বিচারাসনে স্থান প্রাপ্ত হন। তিনি কিছুদিনের জন্য বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিলের সভ্য, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফেলো এবং ফ্যাকাল্‌টি অব্ ল-এর সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে মাত্র

বিয়াল্লিশ্ বৎসর বয়ঃক্রমে দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন।

* * *

মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল—সুপ্রসিদ্ধ ভূকৈলাসের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা জয়নারায়ণ কন্দর্প ঘোষালের পৌত্র। ইহাঁদের পূর্ব্ব বাস ছিল গোবিন্দপুরে, যেখানে বর্ত্তমান ফোর্ট্ উইলিয়ম দুর্গ অবস্থিত। কোম্পানী গোবিন্দপুর অধিকার করিলে তাঁহারা খিদিরপুরে উঠিয়া যান। কন্দর্প প্রচুর ধনশালী ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ও গোকুলচন্দ্রের মধ্যে গোকুলচন্দ্র বাঙ্গলার গভর্ণর ভেয়ারলেষ্টের দেওয়ান হইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি কৃষ্ণচন্দ্রের একমাত্র পুত্র জয়নারায়ণের দখলে আইসে। জয়নারায়ণ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর অধীনে কিছুকাল সন্দ্বীপের কানুন্-গো ছিলেন। তিনিই ভূকৈলাসের রাজবাটী নির্ম্মাণ করিয়া পরিখা দ্বারা বেষ্টন করেন। তিনিই স্বর্ণময়ী পতিতপাবনী দেবীর জন্য সুন্দর মর্ম্মর-খচিত দেবায়তন নির্ম্মাণ, এবং শিবগঙ্গা ও সত্যগঙ্গা নামক দুইটী দীর্ঘিকা খনন করান। তিনি ভূকৈলাসে দুইটী অতি বৃহদায়তনের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন। জয়নারায়ণ ইংরাজী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত, আরবী ও পারসী ভাষায় বিশেষ জ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন। তিনি বিনা ব্যয়ে শিক্ষা দিবার জন্য বারাণসীতে একটি উচ্চাঙ্গের বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তাহা জয়নারায়ণস্ কলেজ নামে খ্যাত। তথায় গুরুধাম নামে একটী ঠাকুরবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া করুণানিধান মহাদেবের নামে উৎসর্গ করেন। তিনি বহু সৎকার্য্য করার জন্য দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে মহারাজা বাহাদুর উপাধি এবং ৩৫০০ ঘোড়সওয়ার রাখিবার সনন্দ প্রাপ্ত হন।

জয়নারায়ণের পুত্র কালীশঙ্কর কাবুল যুদ্ধের সময় সরকারের সাহায্য করায় ও অন্যান্য দানশীলতার জন্য রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি কাশীতে একটী অন্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কালীশঙ্করের পুত্রগণের মধ্যে রাজকুমার সত্যচরণ ও সত্যশরণ রাজা বাহাদুর উপাধি এবং সত্যশরণ C. S. I. উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন। তৎপরে সত্যশরণের পুত্র সত্যানন্দ ঘোষাল ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি ব্রিটিশ্-ইণ্ডিয়ান্-অ্যাসোসিয়েসনের এবং কিছুকাল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ইনিও লোকহিতকর বহু সৎকার্য্য করিয়াছিলেন।

* * *

মাইকেল মধুসূদন দত্ত—বাঙ্গলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা মধুসূদন ১৮২৪ অব্দে যশোরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত। তিনি কলিকাতায় প্রথম গ্রামার স্কুলে এবং পরে হিন্দু স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। তিনি গ্রীক্ ও লাটিন ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং তদবধি তাঁহার নামের সহিত মাইকেল যুক্ত হয়। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজে যান এবং তথায় তাঁহার প্রথম গ্রন্থ Captive Lady প্রণয়ন করেন। এই সময় তিনি মাদ্রাজ কলেজের অধ্যক্ষের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং পরে তাঁহার সহিত বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইলে হেনরিয়েটা নাম্নী অন্য এক ইংরাজ মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার পুলিসকোর্টে চাকরী গ্রহণ করেন। তৎপরে কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি কৃষ্ণকুমারী, শর্ম্মিষ্ঠা, মেঘনাদ-বধ, বীরাঙ্গনা প্রভৃতি কাব্য সকল রচনা করেন। ১৮৬২ অব্দে তিনি ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। বিলাতে যাইয়া অর্থকৃচ্ছ্রতায় তিনি বড়ই কষ্ট পান। এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। প্রবাসে অবস্থানকালে তিনি চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী রচনা করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ফিরিয়া আইসেন এবং এখানে ব্যারিষ্টারি করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু এ কার্য্যে কোন উন্নতি করিতে পারেন নাই। তৎপরে তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর বিয়োগ ঘটে এবং ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। অর্থাভাবে তিনি হাঁসপাতালের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং অবশেষে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সেই স্থানেই তাঁহার জীবনান্ত হয়।

* * *

গোবিন্দরাম মিত্র—কুমারটুলির মিত্র বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দরাম রত্নেশ্বর মিত্রের পুত্র ও হংসেশ্বর মিত্রের পৌত্র ছিলেন। ১৬৮৬।৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্যারাকপুরের নিকট

একটী পল্লী হইতে গোবিন্দপুরে আইসেন এবং তথা হইতে কুমারটুলিতে উঠিয়া আইসেন। পলাশী যুদ্ধের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাকে ডেপুটী ফৌজদার নিযুক্ত করেন। হলওয়েল সাহেব তাঁহাকে "ব্ল্যাক্ ডেপুটী" বলিয়া তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ও দুর্দ্দান্ত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন এবং সুবৃহৎ ও উচ্চ নবরত্নের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া মহাদেব স্থাপনা করিয়াছিলেন। তিনি ১৭৬৬ সালে একমাত্র পুত্র রঘুনাথ মিত্রকে রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

* * *

দেওয়ান রামসুন্দর মিত্র—ইনি ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ব্যারাকপুরে কমিসারিয়েট্ বিভাগে কার্য্য করিতেন। তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট সম্মানিত ছিলেন। বাঙ্গলার নবাব নাজিমের নিকট হইতে তিনি বংশপরম্পরায় রায় উপাধি পাইয়াছিলেন।

* * *

কুঞ্জবিহারী মল্লিক—ইনি সুপ্রসিদ্ধ বীর নরসিং ওরফে বীরু মল্লিকের বংশসম্ভূত। তিনি ওরিয়েণ্ট্যাল্ সেমিনারীতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি একজন খুব সম্মানিত জমিদার ছিলেন এবং দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন। তাঁহার দানশীলতার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তিনি কখন নামের জন্য ব্যস্ত ছিলেন না। দর্ম্মাহাট্টা ষ্ট্রীটের উপর তাঁহার প্রাসাদসম অট্টালিকা গরীব দুস্থদের আশ্রয়স্থল ছিল। ১৮৯৯ সালে তিনি গতায়ু হন।

* * *

রাজনারায়ণ বসু—১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বোড়াল গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম ছিল নন্দকিশোর বসু। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের অন্যতম বন্ধু ছিলেন। হিন্দু কলেজে শিক্ষা শেষ করিয়া ইনি মেদিনীপুরের গভর্ণমেণ্ট স্কুলে শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ক্রমে ব্রাহ্ম-সমাজের অন্যতম নেতা বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ইনি একজন সমাজ ও ধর্ম্ম-সংস্কারক ছিলেন। ইনি বঙ্গভাষার একজন সেবক ছিলেন। তাঁহার "সেকাল আর একাল", "আত্মচরিত" প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বাঙ্গলা ভাষার মূল্যবান সম্পদ। ইঁহার বক্তৃতা দিবার শক্তিও বেশ ছিল। ইনি শেষ জীবন দেওঘরে অতিবাহিত করিয়া ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পরলোক প্রাপ্ত হন।

* * *

দেওয়ান শান্তিরাম সিংহ—ইনি কোম্পানীর আমলে কলেক্টর্ মিঃ মিড্‌লটন্ ও সার টমাস্ রমবোল্টের অধীনে দেওয়ান ছিলেন। তিনি একজন বিশেষ স্বধর্ম্মানুরাগী হিন্দু ছিলেন। নানাবিধ পুণ্য কার্য্যের দ্বারা তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন। বারাণসীতে তিনি একটী শিবস্থাপনা করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র ছিল—প্রাণকৃষ্ণ ও জয়কৃষ্ণ। এই জয়কৃষ্ণের পুত্র নন্দলালই মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের পিতা। তিনি সাতু সিংহ নামে পরিচিত ছিলেন।

* * *

কালীপ্রসন্ন সিংহ—সুবিখ্যাত মহাভারত-অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৪১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বাঙ্গালা-ভাষার উন্নতি-কল্পে তিনি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। মহাভারতের বঙ্গানুবাদ তাঁহার অতুল কীর্ত্তি হইলেও, তাঁহার রচিত "হুতোম পেঁচার নক্সা"ও সেকালের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ছিল। মহাভারতের অনুবাদ ও প্রকাশে তিনি এত অধিক ব্যয় করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে ঋণজালে জড়িত হইতে হইয়াছিল এবং সেজন্য পরিশেষে তাঁহার উড়িষ্যার মূল্যবান জমিদারী ও কলিকাতার বেঙ্গল ক্লাব প্রভৃতি বাটী তাঁহাকে বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। তিনি বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের একজন বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। সংস্কৃত নাটক বেণীসংহার ও বিক্রমোর্ব্বশীর প্রথম অভিনয় তাঁহার চেষ্টাতেই তাঁহার নিজ বাটীতে হইয়াছিল। কবি মধুসূদনের সম্মানের জন্য কালীপ্রসন্ন বাবু নিজ বাটীতে এক সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র ও এক রৌপ্য পাত্র দান করিয়াছিলেন। লং সাহেব নীল-দর্পণের ভাষান্তর করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলে তিনি

টাকা দিয়া তাঁহাকে কারাদণ্ড হইতে মুক্ত করেন। হিন্দু পেট্রিয়ট্ পত্রিকার তিনি একজন প্রথম ট্রাষ্টী ছিলেন। তিনি নানা গুণের আধার ছিলেন।

* * *

রামদুলাল দে—রামদুলাল দে ওরফে রামদুলাল সরকার অতি সামান্য অবস্থা হইতে কোটিপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা দমদমার নিকটবর্ত্তী রেকজানি নামক গ্রামে বাস করিতেন। রামগোপালের জন্মের অল্পকাল পরে তিনি পিতৃমাতৃহীন হন। তিনি মাতামহের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তিনি হাটখোলার মদনমোহন দত্তের বাটীতে প্রথম ৫৲ টাকা বেতনে বিল সরকাররূপে নিযুক্ত হন ও পরে ১০৲ টাকা বেতনে জাহাজ সরকারের কার্য্য প্রাপ্ত হন। এই সময় তিনি একদিন নিলামওয়ালা টুল্লো কোম্পানীর অফিসে তাঁহার প্রভুর পক্ষ হইতে ১৪০০০৲ টাকায় একখানি জলমগ্ন জাহাজ ক্রয় করেন এবং উহার মূল্য জমা দিবার পূর্ব্বেই এক সাহেবকে প্রায় এক লক্ষ টাকায় উহা বিক্রয় করেন। তিনি ঐ লাভের টাকা মদনমোহন বাবুকে দিতে চাহিলে, তিনি রামদুলালের সততা দর্শনে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত টাকা তাঁহাকে দান করেন। ইহাই তাঁহার সৌভাগ্যের ভিত্তি। তৎপরে তিনি আমেরিকার সওদাগরদিগের এজেণ্ট হইয়া এবং অনেক আফিসের বেনিয়ান হইয়া বিপুল ধন উপার্জ্জন করেন। তিনি অশেষ গুণসম্পন্ন, ধার্ম্মিক এবং অসাধারণ দানশীল ছিলেন। মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষে এক লক্ষ টাকা, হিন্দু কলেজ নির্ম্মাণে ৩০০০০৲ এবং কাশীতে ত্রয়োদশ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠায় ২২২০০০৲ টাকা ব্যয় করেন। তিনি ৭৩ বৎসর বয়সে, আশুতোষ ও প্রমথনাথ—যাঁহারা সাতুবাবু ও লাটুবাবু নামে খ্যাত—তাঁহাদের রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন। এই পুত্রদ্বয় পিতৃশ্রাদ্ধে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কথিত আছে রামদুলাল মৃত্যুকালে ১ কোটী ২২ লক্ষ টাকা রাখিয়া যান। সুপ্রসিদ্ধ অনাথনাথ দেব তাঁহারই পৌত্র।

বন্ধুর দেশ

জসীমউদ্‌দীন

বন্ধুর দেশ—বড় ভাল দেশ, লতাপাতা আর ফুল
কেউ ফুটিয়াছে, কেউ আধ-ফোটা, কোথা এর সমতুল।
প্রকাণ্ড মাঠ, কচি ধান শিশু লইয়া মাটীর মাতা
সারাটি বুকের স্নেহ নিঙাড়িয়া মেলিছে নবীন পাতা।
সবুজে সবুজ, ধানের সবুজে ঘাসের সবুজ মিশে
বনের সবুজে ধরিতে যাইয়া পথের হারাল দিশে।

গাছে গাছে পাখী খালি গান গায়—নানান রঙের পাখী
বন্ধুর দেশ উড়ায়ে লইল আড়াআড়ি করি ডাকি।
বনের বুকের, মাঠের বুকের গোপন ছিল যে কথা
চঞ্চুতে ধরি আজি তা উহারা ছড়াইছে যথা-তথা।

বন্ধুর দেশ—বড় ভাল দেশ, চিকন চিকন ধান,
চিকণ চিকণ ঘাসের আঁচলে দুলিতেছে দিনমান।
চিকণ চিকণ বাঁশের গায়েতে চিকণ চিকণ পাতা
বাতাসের সাথে যত দোলে, তত দোলে না চোখের পাতা।
তারি ধার দিয়ে পথখানি গেছে, চাষী-বউদের পার
খাড়ুর গানেতে আলতার দাগে ধূলি পবিত্র তার।
পথের দুপাশে ছোট ছোট ঝোপ আছে শাখা বাড়াইয়া
চাষী-বউদের বাড়ায় বিপদ অঞ্চল জড়াইয়া।

বন্ধুর দেশ—বড় ভাল দেশ, গগনে গগনে ঘুরি
পরদেশী মেঘ যেখানে সেখানে রচিছে রঙের পুরী।
অঙ্গণে তার হেলিয়া দুলিয়া নাচিছে বিজলী মেয়ে;
চরণের তালে গুরু গুরু গুরু চ'লে উদাসীয়া গেয়ে।
বন্ধুর দেশে কদম কেয়ায় বাতাসেরে করে ভারি;
যে পথে বন্ধু চলে সেই পথে সুবাস আঁচল নাড়ি।

কাব্যের ভূমিকা

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

সন্ধ্যার পরেই লগ্ন। বর আসিয়াছে বিবাহ করিতে; প্রচলিত নিয়মে বিবাহ যেমন করিয়া হয়। আসর বসিয়াছে। দামী গালিচা পাতা, আশপাশে লাল মখমলের গোটা চারেক তাকিয়া, দু'দিকে বড় বড় রূপার ফুলদানিতে দুইটি ফুলের তোড়া, মাথার উপরে ও দেয়ালের চারিদিকে ঝাড়ের আলো জ্বলিতেছে। বরযাত্রীতে বড় ঘরখানা ঠাসাঠাসি। ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র গোলমাল, লুচিভাজার গন্ধ, চুরুটের ধোঁয়া, ফুলের খোসবায়, গানের আওয়াজ, সুলভ রসিকতার ইঙ্গিত, অতিথি-অভ্যাগতের আদর-আপ্যায়ন। ঠিক সাধারণ বিবাহ যেমন করিয়া হয়, অতি সাধারণ প্রথায়।

বরের মাথায় টেরি, কপালে চন্দন, চোখে উৎসাহ, মুখে সংযত হাসি, সর্ব্বাঙ্গে পরিপাটি প্রসাধন। সভায় প্রকাশ, ছেলেটি শিক্ষিত, বিনয়ী, রূপবান এবং ধনী—কিন্তু অত্যন্ত সাধারণ, অন্যের চোখের পছন্দে সে বিবাহ করিতে আসিয়াছে। তাহাতে তাহার বিরক্তিও নাই; এই প্রচলিত প্রথা। মনের খুসিতে ও চাপা হাসিতে বর এদিক ওদিক তাকাইতেছিল। তাহার পাশেই দু'তিনটি আধুনিক যুবক গান গাহিতেছে।

দরজার কপাটে হেলান্ দিয়া তাহার যে বন্ধুটি চুপ করিয়া এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল, বর তাহাকে ইঙ্গিতে হাত বাড়াইয়া ডাকিল। বন্ধুটি কাছে আসিয়া বসিতেই বর হাসি-হাসি মুখে কহিল, বেশ লাগ্‌চে, না রে অমিয়?

অমিয় তাহার কথাটাকে তাচ্ছিল্য করিয়া কহিল, অত্যন্ত বিরক্তিকর কিনা, তাই তোর ভালো লাগ্‌চে।

তাই বটে, ঠিক বলেচিস্ তুই, বিরক্তিকর! সেই থেকে একটানা ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে' চলেছে।

একটু হাসিয়া অমিয় কহিল, তাহলে' নিশ্চয় বাজে কথা বলেচি। আমি যখন বাজে কথা বলি তখন সবাই আমার প্রশংসা করে।

বর তাহার কথা বুঝিতে পারিল না। কহিল, ওখানে এতক্ষণ চুপ করে' দাঁড়িয়েছিলি কেন?

দাঁড়িয়েছিলাম, হ্যাঁ—এম্‌নি।

চুপ করে' দাঁড়িয়েছিলি? দেখছিলি বুঝি কারো দিকে?

চুপ করে' দাঁড়িয়েছিলাম।

বর কহিল, গান শুন্‌ছিলি নাকি?

না, গান শুন্‌ব কেন? হ্যাঁ, গানই শুন্‌ছিলাম। বেশ গান।

কি করছিলি তোর মনে নেই!

অমিয় কহিল, হ্যাঁ মনে নেই, গান শুন্‌ছিলাম।

বর বলিল, চুরুট ধরাস্ ত নে, ঐটাতে রয়েছে। যাক্, তোর ঘট্‌কালির বাহাদুরি আছে কিন্তু, যাই বলিস্।

হ্যাঁ, চেনা মেয়ে, নিজেদের জানাশোনার মধ্যে। শ্বশুরবাড়ী কাছাকাছিই হল'। রোজ একবার করে' যাতায়াত চল্‌বে। বিদেশ বিভূঁয়ে না হয়ে এ বরং—

তোরই জানা মেয়ে, নিতান্ত একেবারে অচেনা নয়। আচ্ছা ঠিক বয়েসটা কত বল্ ত?

অমিয় কহিল, মেয়েদের বয়েস দেখতে নেই, দেখতে হয় বাঁধুনি,—যৌবন। তবে এর বয়েস বছর আঠারো!

আঠারো? ওরা যে বলেছে ষোল?

ওরা যে মেয়ের পক্ষ!—হ্যাঁ, এই বছর আঠারো, কিম্বা, এই ধরো দু'মাস কম। আঠারোর মতই তাকে দেখতে, ষোলও নয়, কুড়িও নয়—সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ আঠারো! আঠারোটি বছরকে সর্ব্বাঙ্গে সে থাকে-থাকে সাজিয়ে রেখেছে।

বর মনে মনে কৌতুক অনুভব করিয়া চুপ করিয়া রহিল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন ফুটিয়া তাহার মাথার ভিতর ভিড় করিতে লাগিল। এক সময় কহিল, আচ্ছা, মেয়ে ত সুন্দরী তুই বলেচিস্!

নানা গোলমাল, নানা কণ্ঠের কোলাহল, সকলেই

এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। পান তামাক সরবৎ সিগারেট ও অসংলগ্ন হাসি-মস্করা চারিদিকে ছড়াছড়ি হইতেছিল। কন্যাপক্ষীয়রা অতি সন্তর্পণে অতি-ভদ্রতার মুখোস পরিয়া অতি ক্ষিপ্রতার সহিত তদ্বির করিয়া বেড়াইতেছিলেন।

অমিয় চুরুটটা ধরাইয়া লইল। মুখের মধ্যে ধোঁয়া টানিয়া আবার ছাড়িয়া দিয়া বলিল, সুন্দরী!

বর বলিল, বলতে গিয়ে চুপ করেছিলি কেন? খুব সুন্দুরী নয় বুঝি?

আবার চুরুটে টান্ দিল এবং আবার ধোঁয়া ছাড়িয়া অমিয় কহিল, হ্যাঁ, খুবই সুন্দরী।

খুব নয় বোধ হয়, শুধু সুন্দুরী।

হ্যাঁ শুধু সুন্দরী; সুন্দরীই শুধু। খুব বললে বোঝানো যায় না, কত।

তবু কি রকম সুন্দুরী? কা'র মতন?

কারো মত নয়। তার মত হবার যোগ্যতা কারো নেই। যে শুধু সুন্দরী, তার সঙ্গে কারো তুলনা হয় না।

তুলনাই হয় না? এত রূপ?

এত রূপ নয়, এত সৌন্দর্য্য! বিয়ে করা উচিত রূপ দেখে নয়, সৌন্দর্য্য দেখে। সত্যিকারের সৌন্দর্য্যের কোনো সত্য বর্ণনা নেই।

চোখ উজ্জ্বল করিয়া বর বলিল, মাথায় চুল আছে খুব?

দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলির দিকে অমিয় তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। তারপর দেখিল ঝাড়ের সব আলোগুলি ঠিকমত জ্বলিতেছে কিনা। ওপাশে বন্ধুরা তাস খেলিবার আড্ডা বসাইয়াছে। মনে হইতেছে বিবাহের লগ্নের আরও একটু দেরি আছে।

সাজা পানের কপাল হইতে একটি লবঙ্গ খুলিয়া লইয়া মুখে পুরিয়া অমিয় কহিল, হ্যাঁ, অনেক চুল। চুলের অন্ধকার। সুমুখের দিকে কোঁকড়ানো, একরাশ আংটির মত, আর পেছন দিকে অসংখ্য সাপের মত, আঁকাবাঁকা—হিল্‌হিলে। অরণ্যের মত গভীর; চুল নয়, চালচিত্র। ঘরে এসে দাঁড়ালে চুলের গন্ধে ঘুম ভেঙে যায়। সে যদি পথ হারায় তুমি তার চুলের গন্ধ অনুসরণ করে' তাকে খুঁজে পাবে। সে যদি উলঙ্গ হয়ে বসে' চুলের রাশি খুলে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকে, তবে তার কাপড় না পরলেও চলে।

গভীর মনোযোগের সহিত বর তাহার কথা শুনিতেছিল। শেষের কথায় বিস্ময় অনুভব করিয়া কহিল, মুখখানি ভাল, কি বলিস্? তুই ত কতবারই দেখেচিস্।

হ্যাঁ, অনেকবার দেখেছি, বহুবার। সে কেমন দেখতে এ কথা বহুবার তাকে দেখে ভেবেছি।

কেমন দেখতে রে?

বলা কঠিন। দেখতে সে ভাল। দেখতে সে ভাল এইজন্যে যে, পৃথিবীর আর কোনো মেয়ের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে না। পৃথিবীর একটিমাত্র মেয়ে সে। চন্দ্রের চারিদিকে যেমন কোটি কোটি তারা, তেমনি তার পাশে পৃথিবীর আর সব মেয়ে। সে মেয়ে নয়, মেয়েদের রাণী।

বর কহিল, আমি বলছি তার মুখখানি কেমন দেখতে।

অমিয় কহিল, শ্যাওলা-পড়া দিঘীতে অনেক পদ্ম ফুটে রয়েছে। তুলতে তুলতে হঠাৎ দেখা গেল, একটি তার মধ্যে পদ্ম নয়, সেটি একটি মেয়ের মুখ, মুখখানির ওপর শরতের শিশির-বিন্দু। সেই মুখখানি এই মেয়ের, ঐ তুমি যাকে বিয়ে করবে।

আচ্ছা, তা ত' হল'! মেয়ে লেখাপড়া জানে?

যথেষ্টই জানে! বিদ্বান নয়, সুশিক্ষিত!

বর কি ভাবিয়া কহিল, কিন্তু লেখাপড়া জানা মেয়ে শুনেছি তেমন—

হ্যাঁ, লেখাপড়া জানা মেয়েরা ভালবাসতে পারে না আর নিরক্ষর মেয়েরা ভালবাসতে জানে না,—ওদের মধ্যে তফাৎ।

তাহলে এ মেয়ের সঙ্গে—

এ মেয়ে বিধাতার সর্ব্বপ্রথম সু-সৃষ্টি! এর মধ্যে নিরক্ষর মেয়ের সারল্য এবং শিক্ষিতা নারীর সৌজন্য, দুই আছে। এ মেয়ের মধ্যে ভালবাসা ছাড়াও আর একটি বস্তু আছে যা আর কোনো মেয়ের মধ্যে নেই। সে হচ্ছে প্রেম!

আচ্ছা, ভালবাসা আর প্রেমের মধ্যে কি তফাৎ?

অমিয় কহিল, ভালবাসা হচ্ছে বোঁটা, প্রেম হচ্ছে ফুল। সব বোঁটায় ভাল ফুল ফোটে না।

বর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল, মেয়েটির আচার-ব্যবহার কি রকম অমিয়?

অমিয় কহিল, হয় অত্যন্ত সরল, নয় অত্যন্ত রহস্যজনক।

রহস্যজনক?

না, সরল। মেয়েদের সবই পুরুষের চোখে রহস্যজনক আগে। অত রহস্য আছে বলেই অত সরল।

পাশাপাশি বসিয়া দুইজনে ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহিতেছিল, কথার আর তাহাদের বিরাম নাই। বর আনন্দে বসিয়া বসিয়া পান চিবাইতেছিল। পান যে তাহার খাইতে নাই এ কথা সে তখন ভুলিয়া গেছে।

একটি কন্যাপক্ষীয়ের লোক গামছা কাঁধে ফেলিয়া কি একটা কাজে তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেছিল, একজন যাত্রী বলিয়া উঠিল, আচ্ছা মশাই, বিয়ের লগ্নটা ঠিক ক'টার সময় বলুন ত?

লোকটি বলিয়া গেল, এই, সময় প্রায় হয়ে এল আর কি, ন'টাখানেক দেরি, ন'টার পর।

ন'টার পর, অথচ বর এল সাতটার সময়। এতক্ষণ তাহলে' বসে' বসে'—অমিয়বাবু, চুপি চুপি কি গল্প করছেন বরের সঙ্গে? পাত হয়েছে কিনা দেখুন না একবার! আপনি ত কন্যেপক্ষের—

অমিয় কহিল, হ্যাঁ এদিকে আমি মাসি, ওদিকে পিসি।

সবাই হাসিয়া উঠিল। যে লোকটি বসিয়া গান গাহিতেছিল, সে আরও উঁচুতে গলা চড়াইয়া দিল। পাশে বাঁয়া-তব্‌লায় চাঁটি পড়িতে লাগিল।

বালিশে হাত চাপিয়া বর কাৎ হইয়া বসিল। তারপর চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, মেয়ের চোখ দুটি কেমন অমিয়?

অমিয় হাসিল, হাসিয়া বলিল, মেয়ে দেখে যে বিয়ে করে না তার এই দুর্দ্দশাই হয়! চোখদুটি তার অত্যন্ত সাধারণ, এত সাধারণ যে মনে হয় সে চোখ বহুবারই দেখেছি। বহু মেয়ের মধ্যে বহুবার সে চোখ দেখেছি, দেখে চিনে রেখেছি। সে চোখ এত সাধারণ এবং এত স্বাভাবিক।

বর চুপ করিয়া রহিল। মনে হইল সে যেন ভগবৎ কথা শুনিতেছে। অমিয় বলিতে লাগিল, কোথায় তুমি সে চোখ দেখেছ তোমার মনে নেই! মনে হবে বহু জন্ম আগে থেকে তুমি ওই চোখদুটি খুঁজে এসেছ। সে চোখের সামনে দাঁড়ালে তোমার মুখের ছায়া পড়বে তার মধ্যে। সে চোখ যেন দুই বিন্দু আকাশ।

বর মুখ তুলিয়া তাহার দিকে তাকাইল। অমিয় নিজের মনে বলিয়া চলিল, অতিরঞ্জিত নয়,—সে চোখে ইসারা-ইঙ্গিত নেই, সুন্দরী মেয়ের স্বভাব-সুলভ ছলাকলা নেই, তা'তে আছে প্রাণের গভীরতা। সে চোখে পিপাসা নেই, আছে নিবিড় তপস্যা।

বর কহিল, তপস্যা? তাহলে' ঘর করবে কেমন করে'?

অমিয় মৃদু হাসিল,—ঘর করবারই তপস্যা! তুমি যখন তাকে ভাল করে' চিন্‌বে, তোমার মনে হবে সে সন্ন্যাসিনী নয়, নিতান্তই গৃহবাসিনী।

খুব শান্ত বুঝি?

খুব। শান্ত এবং ধীর। ঝড় যখন ছোটে না, তখন সে বসে' ধ্যান করে। এত শান্ত যে মানুষের বিস্ময় আনে। তাকে দেখলে মনেই হয় না যে এই দক্ষিণ হাওয়ার পিছনে রয়েছে প্রলয়ের ঝড়। হ্যাঁ, তুমি যখন তা'র কাছে বসবে, মনে হবে, তোমার পাশেই বিশাল বিশ্বপ্রকৃতি। এ মেয়ের সর্ব্বাঙ্গে তরুলতা, ফুল-ফল, বন-প্রান্তর, গিরি-গহ্বর, অরণ্যের শ্যামশোভা, অপরিমাণ আকাশ,—সূর্য্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র। তোমার শরীর হবে রোমাঞ্চ, আবেগে আন্দোলিত হবে তোমার সর্ব্বদেহ, তোমার স্তব করতে ইচ্ছে হবে।

স্তব করতে? ভালবাসতে নয়?

ভালবাসতে এবং স্তব করতে। ভালবেসেই তুমি তৃপ্ত হবে, ভালবাসা পেয়ে নয়।

বর কহিল, সে কি রে? সে ভালবাসবে না? ভালই যদি না বাসবে তাহলে এত কাণ্ড করে'—?

অমিয় বলিল, এক একটি মেয়ে থাকে, তারা ভালবাসতে আসে না, ভালবাসা পেতে আসে। তুমি তাকে স্ত্রী বলে' পরিচয় দেবে এই তোমার পরম ঐশ্বর্য্য! মেয়েরা ত ভালবাসে না, তোমাদের ভালবাসায় তারা মুগ্ধ হয়, এই মাত্র। মেয়েদের আসক্তিকে প্রেম না বললে সব পুরুষই সন্ন্যাসী হয়ে যেত'। মেয়েরা পূজায় তুষ্ট হয়, তাই তাদের নাম—দেবী। তুমি দেবে পূজা, সে দেবে প্রসাদ।

এ মেয়েটি কেমন?

কেমন—এই কথাটাই ত তোমাকে আবিষ্কার করতে

হবে! এ মেয়েটি তোমার মুখের দিকে যখন মুখ তুলে তাকাবে, তোমার মনে হবে তুমি জীবনে অনেক অন্যায় ও অনেক পাপ করেছ। মনে হবে তুমি অত্যন্ত দুর্ব্বল, ভীরু, অসহায়। এমন একটা চোখেরি দৃষ্টি, যাতে তোমার মনে হবে তুমি অতিশয় ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, তুমি তার পায়ের কাছে বসবারও যোগ্য নও। এর কাছে এলেই তুমি বারে বারে নিজের দৈন্য অনুভব করবে।

চুপি চুপি বর কহিল, এ কথা তোমার বুঝতে পারলাম না অমিয়।

বুঝতে পারবে, প্রথম যখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে। বুঝবে তুমি কী। তোমার প্রতি রোমকূপ থেকে তোমার সব লজ্জা ফুটে বেরোবে, তোমার যত পঙ্গুতা, যত গ্লানি,—তা'র চোখের দৃষ্টিতে হবে তোমার শুদ্ধি, তোমার নবজন্ম। তুমি যদি সারাজীবন ধরে' দুঃখ পেয়ে থাকো, এর কাছে বসে' তুমি সকল দুঃখের কৈফিয়ৎ পাবে, সকল বেদনার। এ মেয়ে তোমার কাছে হবে বিস্ময়!

বিস্ময়?

হ্যাঁ, বিস্ময়! বিস্ময় আর বিচিত্র! নারীজাতি বহুদিন ধরে' তপস্যা করেছে একটি নারীর জন্য; সে এই মেয়েটি। শ্রাবণের আকাশ আপন অন্তর্বেদনায় কালো হয়ে উঠেছিল, সেই প্রসব-বেদনায় ফুটল একটি কেয়াফুল!

বর যেন তাহার কথাগুলির মধ্যে একটি সুস্বাদ গ্রহণ করিতেছিল। বলিল, যাক্ তোকে বহু ধন্যবাদ, তোর জন্যেই এ মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হওয়া সম্ভব হল'। তোর সঙ্গে পরিচয় ছিল বলেই ত—আচ্ছা, আমাকেও ত চিনিস্, বেশ বনিবনা হবে ত আমার সঙ্গে?

অমিয় প্রথমে কথার উত্তর দিল না। সমস্ত কোলাহলের মাঝখানে বসিয়া একা তাহার মন কোথায় যেন উধাও হইয়া ছুটিয়াছিল। যেদিকে তাকাইয়া ছিল সেদিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না। মৃদুস্বরে বলিল, বনিবনা তোমার সঙ্গে নাও হতে পারে!

বিস্মিত হইয়া বর কহিল, সে কি রে?

হ্যাঁ, এর অহঙ্কার একটু বেশী।

অহঙ্কার? সর্ব্বনাশ—

অহঙ্কার সুন্দরী বলে' নয়, সুন্দর বলে'। অহঙ্কার এর কলঙ্ক নয়, অলঙ্কার। কোথাও মাথা হেঁট করে না, তার কারণ এর আছে গভীর আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাসই এর অহঙ্কার। তোমার স্ত্রী হবে, কিন্তু তোমার কাছে ছোট হবে না। তুমি যদি তা'র সমান না হতে পারো, অনায়াসে সে তোমাকে ছাড়িয়ে যাবে। জীবনে সে কিছুর জন্যেই অপেক্ষা করেনি। প্রেমের জন্য নয়, ঐশ্বর্য্যের জন্য নয়, সংসারের জন্যও নয়।

স্বাধীন মেয়ে নাকি?

স্বাধীন নয়, সহজ। সহজ হতে পারাই তার মন্ত্র।—চুরুটে আর একটা টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া অমিয় কহিল, তোমার সঙ্গে যখন প্রথম আলাপ হবে, বুঝবে, সে নিতান্ত নারী নয়।

নারী নয়, মানে?

মানে তার মেয়েলিপনা কম। নারীর স্বার্থপরতা তার মধ্যে নেই; ছোট লোভ, তুচ্ছ ঈর্ষা, ক্ষুদ্র হিংসা, ছলনা ও লালসার ছোট ছোট ইঙ্গিত—এগুলো তার কাছে স্বপ্ন। এগুলো সে জয় করেছে তা নয়, এগুলোকে সে আনতে ভুলে গেছে। আনতে ভুলে গেছে বলেই তার এত অহঙ্কার।

বর বলিল, এই যদি সত্যি হয় তবে সে ত কাদার পুতুল। প্রাণহীন মাটির মূর্ত্তি। তার গায়ে মানুষের রক্ত কোথায়?

অমিয় হাসিল। হাসিয়া কহিল, সাধারণ নরনারীর দেহে আছে দুই রক্ত, মানুষের আর জানোয়ারের। এর শিরায় আছে শুধুই মানুষের রক্ত। এ মেয়ে হচ্ছে দেবতার আসন।

খুব তেজ আছে নাকি?

তেজ নয়, জ্যোতিঃ। দিনের আলোতেও তুমি দেখবে তা'র চারিদিক ঘিরে জ্যোতির্মণ্ডল। সেই জ্যোতির্মণ্ডলের কাছে বসলে মাথার মধ্যে তোমার প্রলাপ জমে' উঠবে। আনন্দে তুমি হবে অস্থির, তোমার হাসি পাবে, কিন্তু কান্নায় গলা বুজে আসবে; আরামের অসহ্য ব্যথায় তোমার সর্ব্বশরীর থর থর করে' কাঁপবে। তোমার মাতাল করবে না, কিন্তু বিভ্রান্ত করবে। তৃপ্তিতে অচেতন হবে, ঘুম পাবে।

বর কহিল, সে ত মোহ!

মোহ নয়, মোহমুক্তি।

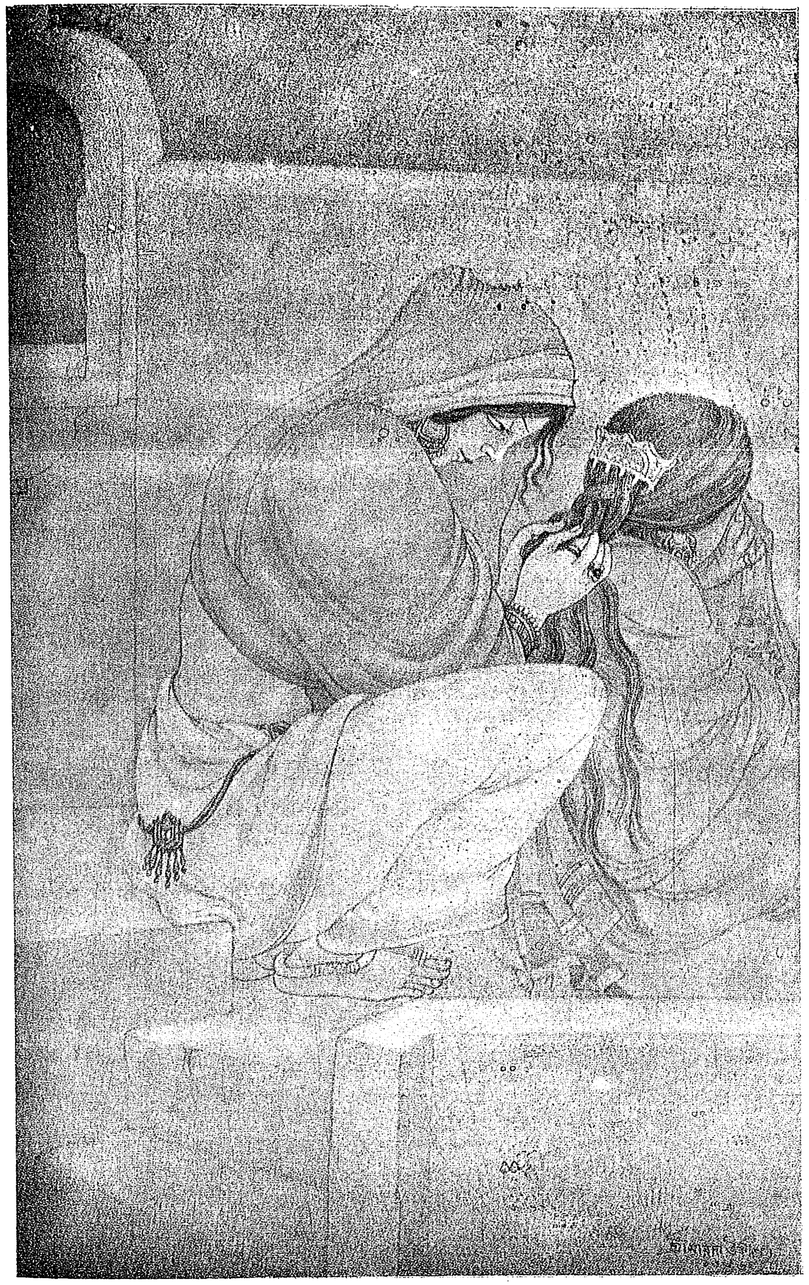

বেণী-বিনোদিনী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকীল

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

একটু অস্বস্তি বোধ করিয়া বর বলিল, এ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হচ্ছে অমিয়। তা'র আসল পরিচয়টা চেপে রেখে তুমি অনর্থক ধোঁয়ার সৃষ্টি করছ! আচ্ছা, সে কি ভালবাসে বল দেখি?

অমিয় বলিল, সে ভালবাসে অশোক আর শিমুল ফুল, রক্ত, সিঁদুর, আল্‌তা, সূর্য্যাস্তের আকাশ, আগুনের আভা, রেলপথের বিপদসূচক আলো।

দুইজনে কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিল। বর এক সময় তাহার হাতঘড়িটা ফিরাইয়া সময় দেখিয়া লইল। অমিয় আপন মনে মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল, সব চেয়ে কঠিন···সব চেয়ে কঠিন তুমি যখন তাকে ভালবাসার কথা বল্‌তে যাবে। মনে হবে তাকে ভালবাসা জানাবার ভাষা তোমার হাতে নেই, তুমি একেবারে দেউলে হয়ে গেছ। তুমি অনেক কথা ভেবে তার কাছে বসবে, কিন্তু কিছুই বলা হবে না। তুমি যত বড় ঐশ্বর্য্যশালীই হও, তার কাছে মনে হবে তুমি ভিখারী। সব চেয়ে কঠিন তাকে ভালবাসা জানানো, সত্যি, সব চেয়ে কঠিন।

অমিয় চাপিয়া চাপিয়া অলক্ষ্যে একটা নিশ্বাস ফেলিল। তারপর বলিল, যত দিন যাবে ততই তুমি তার কাছে ছোট হতে থাকবে। একদিন তুমি তার নাগাল পাবে না··· তুমি তার পায়ের তলায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, তুমি চীৎকার করতে পাবে না, কাঁদতে পাবে না, তোমার পালাবার শক্তি নেই, তোমার টুঁটি টিপে ধরেছে, তুমি ক্লিষ্ট, ক্লান্ত··· নিজের কাঙালপনায় তোমার চোখে জল আসবে। মনে হবে জন্ম জন্ম ধরে' ছায়ার মত ওর পেছনে পেছনে তুমি ঘুরছ, অনাগত বহু জীবন ধরেও তোমাকে ওর অনুসরণ করতে হবে।

তাকে ভালবাসতে গিয়ে এই হবে আমার শাস্তি?

একটা অতি উগ্র আনন্দ অনুভব করিয়া অমিয় বলিল, হ্যাঁ, এই শাস্তি। এই শাস্তিই পুরুষের প্রেম!

বর কথা কহিল না। অমিয় একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল, প্রতিদিন তুমি আয়োজন করবে একটি কথা বলবার জন্য, 'তোমায় ভালবাসি'—প্রতিদিন চূর্ণ হবে তোমার সে স্বপ্ন। ভালবাসার কথা শোনবার আগ্রহ যার আছে কিনা তুমি বুঝতে পারবে না, তাকে ভালবাসা জানাবার মত সাহস তোমার হবে কেমন করে'? সে যে-ঘরে থাকবে, আপন অস্থিরতায় তুমি সে-ঘরে টেঁক্‌তে পারবে না, তোমার দম্ আট্‌কে আসবে। তোমার কেবলই মনে হবে এ মেয়ে সঙ্গীহীন, নিরন্তর কি একটা অনির্দ্দিষ্ট বস্তুর জন্য ধ্যান করছে! তোমার কাছে কেবলই সে জটিল হতে জটিলতর হতে থাকবে।

বর কহিল, এমন মেয়েকে তা হলে বিয়ে করা উচিত নয়, তাই না?

অমিয় হাসিল। তারপর গভীর কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, তোমার মনে হবে বিয়ে করে' তার কোনো পরিবর্ত্তন হয়নি। পরিবর্ত্তন হয় তার ভেতর থেকে, বাইরের অবস্থা থেকে নয়। হৃদয়টা তার পুরুষের, মাথার ভেতরটা তার তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী, পুরুষের মত তার প্রতিভা, বীরের মত তার সাহস ও শক্তি, কিন্তু তবু সে মেয়ে! সেই গোপন মেয়েটি তার ভেতরে যে কোন্ গহনে বাস করছে, তাই আবিষ্কার করাই হবে তোমার সাধনা, তোমার প্রেম! নৈলে তাকে ভালবাসি—এ কথা বল্‌তে গেলেই সে হেসে উঠ্‌বে, তার কারণ সে নারী নয়। সে নারী নয়, এই কাঁটাই বার বার ফুটে ফুটে তোমায় ক্ষতবিক্ষত করবে, যাতনায় তোমাকে জর্জ্জরিত করবে, বেদনায় তোমার জীবন হবে দুর্ব্বিসহ, দেহে আর মনে এমন জ্বালা ধরবে যে মনে হবে, তোমার শরীরের সমস্ত রক্ত নিঃশেষে বা'র করে' দিলে তুমি শান্তি পাও। তোমার মনে হবে—

বর বলিল, যথেষ্ট হয়েছে, আর আমি শুন্‌তে চাইনে। —বলিয়া পরম আগ্রহভরে সে বক্তার মুখের কাছে মুখ সরাইয়া আনিল।

ভিতরের অনুপ্রেরণায় ও আবেগে অমিয়র চোখ দুইটা জ্বালা করিতেছিল। তাহার চোখের ভিতর তাকাইলে মনে হইত, চোখের ধারগুলি তাহার সজল হইয়া আসিয়াছে। সে বলিল, কেবলই তোমার মনে হবে সে নিষ্ঠুর, তার হৃদয় নেই, ভেতরটা তার মরুভূমি, তোমার প্রতি সে উদাসীন; তোমার মধ্যে যখন ঝড় বইছে, তা'র তখন সময় হল' ছবি দেখবার। এবং সব চেয়ে কঠিন পরীক্ষা তোমার, সে যখন তোমাকে ভুলে থাকবে।

ভুলে থাকবে? স্বামীকে?

হ্যাঁ, ভুলে থাকবে এবং ভুলেও তোমার খোঁজ নেবে না। চোখের আড়ালে তুমি গেলেই মনের মঞ্চে সে

যবনিকা ফেলে দিল। তোমার প্রতি তা'র অবজ্ঞা নয়, বিতৃষ্ণা নয়—এই তার রূপ।

স্বামীর প্রতি এই ব্যবহার করবে?

স্বামীর প্রতি নয়, তোমার প্রতি। স্বামী তার কেউ নয়। হ্যাঁ, রাত্রে তোমার হবে কণ্টকশয্যা। ঘুমের ঘোরে তুমি শিউরে উঠ্‌বে, দুঃস্বপ্নের ভয়ে তুমি অস্থির হয়ে পায়চারি করে' বেড়াবে। শত শত কঠিন বাহু দিয়ে কে যেন তোমাকে বাঁধবে, তুমি চীৎকার করতে যাবে, পারবে না, তুমি শক্তিহীন, নিশ্বাস নেবার হাওয়া তোমার ফুরিয়ে যাবে, সমস্ত শরীর তোমার পক্ষাঘাতগ্রস্ত!

বর উদ্‌ব্যস্ত হইয়া কহিল, আর আমি শুনতে চাইনে ভাই, তুই চুপ কর্ অমিয়।—বলিয়া সে একবার ঘড়িটা দেখিয়া লইল।

অমিয় চুপ করিল না, মুখখানা আরও সরাইয়া আনিয়া বলিতে লাগিল, ভাঙা খেল্‌নার মত যদি কেউ তা'র কাছে গড়াগড়ি যায়, সে ফিরেও তাকায় না। নিজের মাথা তোমার চূর্ণ বিচূর্ণ করে' ফেল্‌তে ইচ্ছে হবে, মনে হবে, এ প্রবঞ্চনা, এ অন্যায়,—বিধাতার বিরুদ্ধে তোমার যুদ্ধ ঘোষণা করতে ইচ্ছে হবে, আকাশ তোমার চোখে হবে বিষাক্ত, জীবন তোমার কাছে হবে ভয়াবহ বিদ্রূপের মত···একটিমাত্র নারীর জন্য তোমার চোখে পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি ওলোট-পালোট হয়ে যাবে। অথচ এই দুঃখের মধ্যেও তোমার ভেতরে জ্বল্‌বে আনন্দের অগ্নিশিখা। দুঃখের পাত্র থেকে আনন্দ পান করবে অঞ্জলী ভরে'। তা'র জন্য দুঃখ পেতেও তোমার ভাল লাগবে। একদিন সেই তোমাকে—বলিতে বলিতে গলা ধরিয়া আসিতেই সে হঠাৎ সচেতন হইয়া মুখ সরাইয়া লইল। বর তাহাকে এতক্ষণ ধরিয়া সন্দেহ করিতেছে নাকি?

ভয়ে তাহার সর্ব্বশরীর অবশ হইয়া আসিতেই সে আর বসিল না, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

এমন সময় আসরে একটা সোরগোল উঠিল। কন্যা পক্ষের একটি লোক আসিয়া করযোড়ে নিবেদন করিল, দয়া করে' উঠুন আপনারা, লগ্ন হয়ে এসেছে।

একসঙ্গে সবাই উঠিয়া হুড়োহুড়ি করিয়া ভিতরে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বরকে লইয়া গেল সর্ব্বাগ্রে।

বাহিরের নির্জ্জনে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া অমিয় একবার রাত্রির আকাশের দিকে তাকাইল। দুই দিকে বড় বড় বাড়ীর মাঝখান দিয়া সে-আকাশ সামান্যই দেখা গেল। তারপর মুখ ফিরাইয়া কাছে একটা বাড়ীর রোয়াকে উঠিয়া সে পা ঝুলাইয়া বসিল। পকেট হইতে চুরুট ও দেশালাই বাহির করিয়া সে অন্ধকারে ধরাইতে গেল, কিন্তু পারিল না, দুইটা হাত তখনও তাহার ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। বর কি তাহাকে সত্যই সন্দেহ করিয়াছে? এমন কী দে বলিয়া ফেলিয়াছে যাহাতে তাহার প্রতি সন্দেহ আসিতে পারে?

বার বার অমিয় শুধু এই কথাই ভাবিতে লাগিল।

জীর্ণ মন্দিরের কথা

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর, বি-এ

বারেক তরীটি ভিড়াও ওখানে,
শুনে যাও দুটি প্রাণের কথা,
কণ্ঠের স্বর যায় না অতটা
ক্ষমা কর তার অক্ষমতা।
কাছে ডাকি বাছা,—দিনেরি বেলা-ত
ভাঙা ঘাট পাবে একটু আগে,
ফাটা সিঁড়ি, দেখো—সাবধানে উঠ'
ফাটলে ও-পায় ব্যথা না লাগে।

ভয় পেলে না কি? ও কিছুই নয়,—
পাখা ঝট্‌পটে বনের পাখী,
অতিথি বরণে ঝিল্লীরা বুঝি
একতানে ঐ উঠেছে ডাকি'।
ভূত মান' না কি? ভূত কি আছে রে?
ভূত থাকিলে ত ভালোই হ'তো,
তাদের নিয়েই নব সংসার
গড়ে' তুলিতাম মনের মত।

ডাকাতের ভয়? ডাকাতো মানুষ,
থাকিলে তাদের সাথেই বেশ
হইতে পারিত মরমের কথা,
দিতাম না বাছা তোমারে ক্লেশ।

অনেক কথাই জানাতে পরাণ
আকুলি বিকুলি করিছে কত,
মাথায় আমার জটাজূট দেখে
ভেবোনা মৌন আমার ব্রত।
ধ্যানী মুনি নই, শীর্ষে আমার
নয়ক' কঠোর তপের ঘটা,
তৈলবিহনে ধূলায় বালিতে
রুখু চুলে মোর বেঁধেছে জটা।
থাক্, বাজে কথা! কেন ডাকিলাম?
দাঁড়ায়ে রয়েছ কৌতূহলী!
ওখানে একদা হাজার ভক্ত
দাঁড়াত নিত্য কৃতাঞ্জলি।
একটি মানুষে কাছে আনিবারে
কত সাধাসাধি করছি আজি,
ভেবে দেখ দেখি নৌকা বাঁধিতে
কত গররাজী তোমার মাঝি।
শত শত বাঁকী অর্ঘ্য বয়েছে
উঠেছে নিত্য জয়ধ্বনি,
গঙ্গার ঘাটে যাত্রী বহিয়া
নাচিত দুলিত কত তরণী।
বাদ্য-ঘটায় উদ্বেল বায়ু
ছিল তার গতি ধূপমোদিত,
হিরণ মূল্যে বিক্রীত হতো
মোর দেবতার চরণামৃত।

চারিপাশ ঘিরি ছিল জনপদ
ধনসম্পদে আঢ্য সুখী,
তাহার চিহ্ন—ভয় নেই বাছা
একটা শিয়াল দিতেছে উঁকি—

ঐ জনপদে আছিল যাহারা
তারা ছিল মোর সেবকদল,
ভাবিত তাহারা তাদের ভাগ্য
মোর মহিমা বা কৃপার ফল।
ভাবিত তাহারা,—আহা ব্যথা পেলে?
বেলকাঁটা বুঝি বিঁধিল পায়?
আহা মিছামিছি এখানে ডাকিয়া
কত বেদনাই দিনু তোমায়।—

হায় মূঢ় নর,—কোথা তোরা আজ
আমি ত তেমনি রয়েছি খাড়া,
আমার বুকের শিবলিঙ্গটি
আজিকে সেবক পূজারীহারা।
হায় মূঢ় নর,—দেবতা, দেউল
তোদেরি সৃষ্টি সুখের দিনে,
তোদেরি ভাগ্যে আমার ভোগ্য,
মহিমা যা কিছু তোদেরি ঋণে।
মিছা কথা,—মোরা তোদেরে বাঁচাই,
তোদেরি কৃপায় আমরা বাঁচি,
মানুষেরি কৃপালাভের আশায়
মরণ দশায়ও বাঁচিয়া আছি।

জরা অনশনে এ কণ্ঠ ক্ষীণ
একটুতে অবসন্ন হই,
ভাবিয়াছিলাম অনেক কথাই
বলিব, বলার শকতি কই?
আর না, তোমায় রাখিব না ধ'রে,
অনেক কথা ত বলাই হ'লো,
যাচ্ছ নগরে? আমার কাহিনী
পুরা-পরিষদে বারেক ব'লো।
দরদী পাইলে বলিও তাহারে
ভিক্ষা আমার এই কেবল,—
শিবরাত্রিতে একটি সলিতা,
বোশেখে দু'কোশা ঝারার জল।

ম্যাডাগাস্কার

শ্রীভারতকুমার বসু

আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব সাগর-তীর: থেকে ২১৫ মাইল দূরে ম্যাডাগাস্কার অবস্থিত। সুদূর অতীতে এই দেশটীকে গ্রীক এবং আরবেরা সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। কিন্তু দেশটির 'ম্যাডাগাস্কার' এই নামকরণ করেন মিঃ মার্কো পোলো ১৩শ শতাব্দীতে। মার্কো পোলো ঐ দেশটীকে জীবনে কিন্তু কোনো দিনই দেখেন নি।

১৬শ শতাব্দীতে পোর্ত্তুগীজরা ম্যাডাগাস্কারে এসে সেখানে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে ফরাসীরা সেখানে হাজির হ'য়ে, পোর্ত্তুগীজদের ধর্ম্মযাজকদের দেশ থেকে তাড়ালেন। এইতেই হ'লো যত অনিষ্টের সূত্রপাত। ফ্রান্স ক্ষেপে গেল। এবং তার পরই যুদ্ধ বাধলো ফরাসী ও ম্যাডাগাস্কারবাসীদের মধ্যে। ঐ যুদ্ধ অনেক বছর ধ'রে চ'লেছিল। শেষে, ১৮৯৫ সালে জেনারেল্ গ্যালিনির দ্বারা ম্যাডাগাস্কার পরাজিত হয়।

ম্যাডাগাস্কার দ্বীপটী আজকাল একজন ফরাসী বড় লাটের দ্বারা শাসিত হচ্ছে। বিভিন্ন জেলায় রাজকীয় নিয়ন্ত্রণ কাজে নেটিভদের নিযুক্ত করা হ'য়েছে। তবে সেখানকার উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী মাত্রেই ইয়োরোপীয়।

হাসিমুখ

উপনিবেশ নষ্ট ক'রে দিলে। এইভাবে সেখানে ইয়োরোপীয়রা এসে বাসা বাঁধতে লাগলো। ম্যাডাগাস্কারের নেটিভ রাজা প্রথম রাদামাও কোনো আপত্তি করেন নি। বরং তিনি ইয়োরোপীয়দের পছন্দ ক'রতেন এবং খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি উৎসাহ দেখাতেন। কিন্তু ১৮২৮ সালে তাঁর মৃত্যু হ'তেই, তাঁর রাণী রাণাভালোনা সিংহাসনে উঠে প্রথমেই খৃষ্টান

ঐ দ্বীপটীর মধ্য-প্রদেশগুলিতে আছে—আল্পস পর্ব্বত-শ্রেণী। কোনো কোনো পর্ব্বতের উচ্চতা ৮০০০ ফিটেরও বেশী। সাগর-তট থেকে উক্ত প্রদেশের ভূমি উচ্চতা প্রায় তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার ফিটের মধ্যে। সেখানকার সাধারণ দৃশ্য কিন্তু নিতান্তই একঘেয়ে তার একমাত্র কারণ, প্রকৃতি সেখানে সৌন্দর্য্যের আধিক্য

বর্ষণ করেন না। সেখানে বছরে মাত্র দুটী ঋতুর আত্ম-প্রকাশ হয়—গ্রীষ্ম ও শীত। নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম এবং মে থেকে অক্টোবর পর্য্যন্ত শীত। গ্রীষ্মের সময়ে সেখানকার জল-হাওয়া সমস্ত পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রদেশের তুলনায় অনেক বেশী স্বাস্থ্যকর থাকে। পশ্চিম-প্রদেশগুলি ত দারুণ গ্রীষ্ম-প্রধান এবং জ্বরের ডিপো। পূর্ব্ব-প্রদেশ-

ধানের ক্ষেতে মাটী কাটছে

নৃত্য—(১)

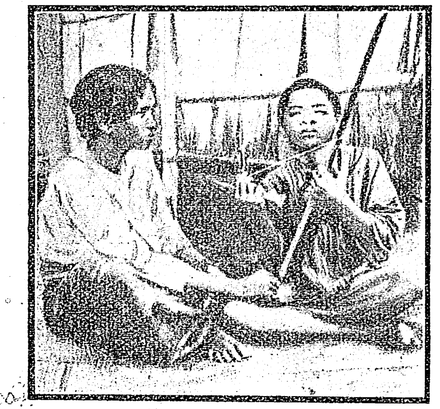

ছড়ির তারে ছড় টেনে সুর বাজাচ্ছে

বর্ষাও কিছু পরিমাণে দেখা দেয়। শীতের সময়টী সেখানে ধান ও ফল-আবাদের উপযোগী। শীতকালটীকেই সেখানকার ইয়োরোপীয়রা পছন্দ করে বেশী। এই সময়েই গুলিও যার-পর-নাই 'ড্যাম্প'; সারা বছর ধ'রে প্রচুর বৃষ্টিপাত-ই এর কারণ।

পশ্চিম-প্রদেশগুলির জমি মাঝারি-রকমের উর্ব্বরা। কিন্তু

সেখানে বৃষ্টিপাত হয় বছরের মধ্যে অল্পদিনই। এইজন্য, সন্তোষজনক চাষ-আবাদ যা-কিছু সেখানে হয়, তা হয় সাগর-তীরস্থ স্থানে।

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তেও বৃষ্টির চিহ্ন দেখা যায় কদাচ। কাজেই, সেখানে প'ড়ে আছে কেবল ধূ-ধূ বালুর মরুভূমি। সূর্য্যের প্রখর তাপে এবং গরম হাওয়ায় দিনের বেলা সে স্থান যেন ঝ'ল্‌সে যায়। আবার, রাত্রে ঠিক উল্টো ভাবে হঠাৎ একেবারে ঠাণ্ডা হয়।

ম্যাডাগাস্কারের প্রধান দ্রষ্টব্য হচ্ছে—তার বন বন্ধনী (forest-belt)। বাস্তবিকই সমুদ্রতীরের কাছ পর্য্যন্ত

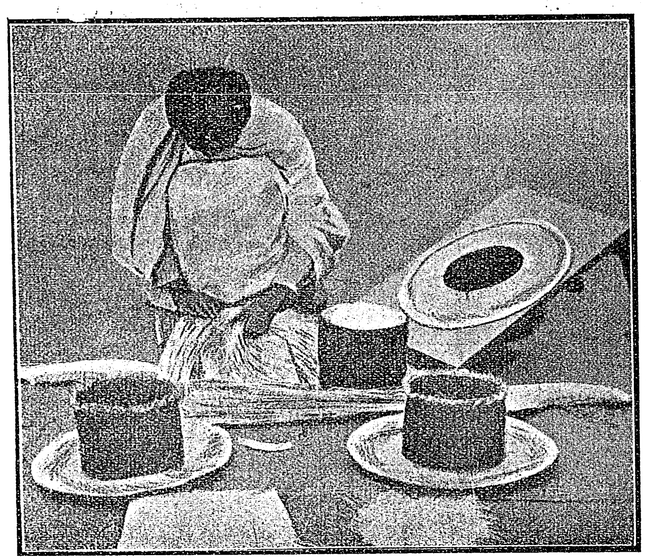

টুপী তৈরী ক'রছে

অজস্র বনরাজি যেন ম্যাডাগাস্কার-দেশটীকে বেঁধে রেখেছে। উত্তর-পূর্ব্ব দিকের বনগুলিতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ায় সেখানকার গাছ-পালা বাড়তে থাকে দ্রুতগতিতে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ওই সব বনে মাটীর গভীরতা খুব বেশী নয়। তা হ'লেও, ওই মাটীতেই জন্মায় নানারকমের বর্ণ-বিচিত্র ফুল ও ফলের তরু-লতা। আবলুস্-কাঠও পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে। ব্যবসায়ীরা এই কাঠের প্রতি লোভ রাখেন যার-পর-নাই বেশী, কারণ, হিন্দু ক্রেতারা অন্যান্য কাঠের চেয়ে এই কাঠ বেশী মূল্যেও কিনতে অত্যন্ত উৎসুক হ'য়ে থাকেন।

ম্যাডাগাস্কারে বড়-বড় জন্তু একেবারে নেই। সিংহ, জেবরা, জিরাফ, হাতী ইত্যাদির সেখানে একান্ত অভাব। সেখানে বড় জন্তুর আসন কায়েমী ক'রে আছে—একমাত্র বন্য-শূকর। কিন্তু সেখানকার বুনো জন্তুদের মধ্যে সকলের চেয়ে বিশেষ জন্তু হচ্ছে—"লেমার্" (lemur)। এরা যখন মুখে এক রকম অদ্ভুত শব্দ ক'রে এক গাছ থেকে আর-এক গাছে লাফিয়ে যায়, তখন তা দেখলে যে-কোনো সাধারণ ব্যক্তি নিশ্চয়ই ধারণা ক'রবেন যে, তারা বানর এবং কাঠ-বিড়ালের জগা-খিচুড়ী-পাকানো নতুন এক জীব বিশেষ।

সেখানকার আরও একটী অদ্ভুত জন্তুর

নৃত্য—(২)

নাম "আই-আই" (aye-aye)। পৃথিবীর আর-কোথাও এ-রকম জন্তু দেখা যায় না। এরা নিশাচর। কিন্তু এদের শিকার করা হয় কদাচ; কারণ, সেখানকার লোকদের এই রকম একটা সংস্কার আছে যে, যে-ব্যক্তি ঐ জন্তুকে হত্যা ক'রবে, এক বছরের মধ্যে সেও ম'রবে।

সেখানকার নদীগুলিতে কুমীরের দল রাজত্ব করে। কুমীরগুলো দস্তুরমত দীর্ঘ। নদীতে নামতে হ'লে, নেটিভরা ত ভয়েই সারা হয়।

ম্যাডাগাস্কার-বাসীরা মালায়ো-পলিনেশিয়ান্‌দের বংশধর। এই বংশধরদের মধ্যে সম্প্রদায়-বিভাগ আছে

অনেকগুলি। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই আকারে এবং প্রকারে ভিন্ন। কিন্তু তবুও আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এদের কাহারও ভাষার কোনো প্রভেদ নেই।

প্রধান সম্প্রদায়গুলির মধ্যে হোভা, শাকালাভা, বেট্‌সিলিয়ো এবং মাহাফালি—এই কয়টীর নাম উল্লেখ-যোগ্য। হোভা-সম্প্রদায় বাকীগুলির তুলনায় সুশ্রী-তনু।

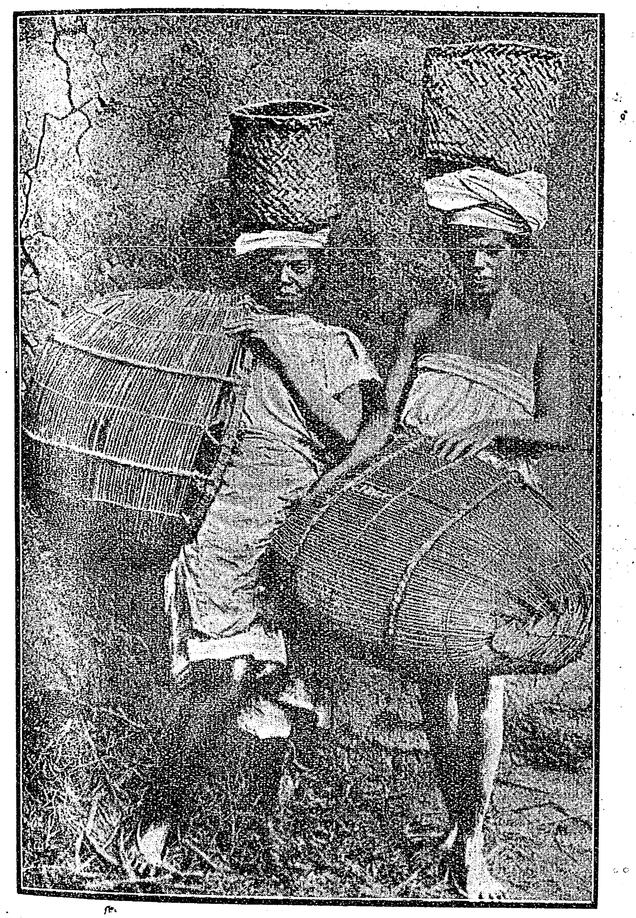

ধীবর-রমণী

তারা শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমানও বেশী! চাষের কাজে তারাই অধিকতর সিদ্ধহস্ত।

শাকালাভা সম্প্রদায়ের লোকেরা কৃষ্ণবর্ণ। তারা অহঙ্কারী এবং স্বাধীনচেতা লোক। যুদ্ধ তাদের প্রিয় বস্তু। শিল্পোন্নতির পথে বাধা আনাই তাদের কাজ। তাদের মধ্যে একদল লোক আছে, যারা ধীবর এবং নাবিকের কাজ ক'রে দিন কাটায়। সাঁতারে তারা ওস্তাদ। জমি কিম্বা জল—যে-কোনো স্থান-ই তাদের কাছে বাড়ীর সমান।

মাহাফালি-সম্প্রদায়ের লোকেরা দক্ষিণ-প্রদেশে বাস করে। তারা অত্যন্ত দুর্দ্দমনীয় জাতি। যুদ্ধই তাদের জীবনের আকাঙ্ক্ষা। প্রতিবেশীদের ঘরে লুঠ-তরাজ ক'রে তারা আমোদ পায়।

বেট্‌সিলিয়ো-সম্প্রদায়ের লোকেরা হচ্ছে ম্যাডাগাস্কারের কর্ম্মকার। লোহার কাজে,

জননী

এবং ছুরী-কাটারী ইত্যাদি তৈরীর ব্যাপারে তাদের যথেষ্ট দক্ষতা আছে। এই দক্ষতার বিনিময়েই তারা তাদের জীবিকা অর্জ্জন করে।

ম্যাডাগাস্কারের লোকদের যথেষ্ট বুদ্ধি-চাতুর্য্যের জন্য তারা অনেকেরই অনেক প্রশংসা পায়। তারা নকল

ক'রতে পারে হুবহু। তবে তাদের মস্তিষ্কের মধ্যে মৌলিক সৃজনী-শক্তি নেই একটুও। তারা সহজেই লিখতে এবং প'ড়তে শেখে। তাদের একটা প্রথা আছে এই যে, যে-কোনো কথারই তর্ক-আলোচনা খোলাখুলিভাবে করা দরকার, এবং প্রত্যেকেরই নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করার অধিকার থাকা উচিত। এই কারণেই, নেটিভদের অনেকে বেশ ভাল বক্তৃতা দিতে পারে।

শাকালাভা-জাতীয় মেয়ে

সেখানকার মেয়েদের অন্যতম প্রধান সম্পদ হচ্ছে—তাদের আত্ম-সম্মান-জ্ঞান। স্ত্রী-স্বাধীনতা আজ যে সেখানে সচল হ'য়ে উঠেছে, এর একমাত্র কারণ, উক্ত সম্পদ তাকে বর্ম্মের মতো আগ্‌লে রেখেছে।

আরব-অধিবাসীর সংখ্যাও সেখানে অল্প নয়। সুদূর অতীতে আরব-দেশ-থেকে-আসা ব্যক্তিরা এদেরই পিতৃ-পুরুষ। এরা হজরৎ মহম্মদকে জানে না, জানে কেবল সেই পিতৃপুরুষদেরই কীর্ত্তি-কথা।

বিগত দিনে সেখানকার দেশগুলিতে সুরক্ষিত ক'রে রাখা হ'তো বেশ মৌলিক নিপুণতায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ইমারিণা-দেশটীকে, শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্য, পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় সেটীকে তৈরী করা হয়। দেশটীর চারিদিকে চারটী গভীর খাদ কাটানো হয়—আত্মরক্ষার জন্য। দেশে প্রবেশের জন্য এক কিম্বা একাধিক তোরণ তৈরী করা হয়। প্রত্যেক তোরণের মুখ বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'তো—একটী গোলাকার বৃহৎ পাথরের দ্বারা। এই পাথরের ব্যাস—আট কিম্বা দশ ফিট।

দুই সখী

মধ্য-প্রদেশের ক্ষেত্র-রক্ষার পদ্ধতিও চমৎকার। ঐ সব ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে ন্যাসপাতি ও অন্যান্য সুস্বাদু ফলের আবাদ করা হয়। কিন্তু পাছে তা গৃহপালিত জন্তুরা এসে নষ্ট ক'রে দেয়, এইজন্য ক্ষেতের চারিদিকে কাঁটার বেড়া দেওয়া হয়। দক্ষিণ-প্রদেশস্থ লোকেরাও চাষ-ক্ষেতের চারিদিক এইভাবে 'ক্যাক্‌টাস্'-নামক কাঁটার সুদৃঢ় গুল্ম বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখে। এই বেড়া এত শক্ত যে, ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ফরাসী-কামানের গোলাকেও প্রতিরোধ ক'রেছিল।

আজকাল সেখানকার লোকদের মধ্যে যাদের অবস্থা

ভাল, তারা প্রাচীন পদ্ধতিতে তৈরী বাড়ীগুলিকে ধ্বংস ক'রে, সেই জায়গায় ইয়োরোপীয় ধাঁচে বাসভবন তৈরী করিয়েছে। কিন্তু সাধারণ লোকেরা আবহাওয়া অনুযায়ী বাড়ী তৈরী করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, মধ্য-প্রদেশ উচ্চভূমি হওয়ায়, সেখানকার উত্তাপ প্রায়ই অল্প থাকে। সেখানে বুক দেওয়ালযুক্ত মাটীর বাড়ী তৈরী করা হয়। বাড়ীর ছাদ দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে হয় উত্তর-দক্ষিণ-মুখো। কাঠের বাড়ীও

মাদুর বুনছে

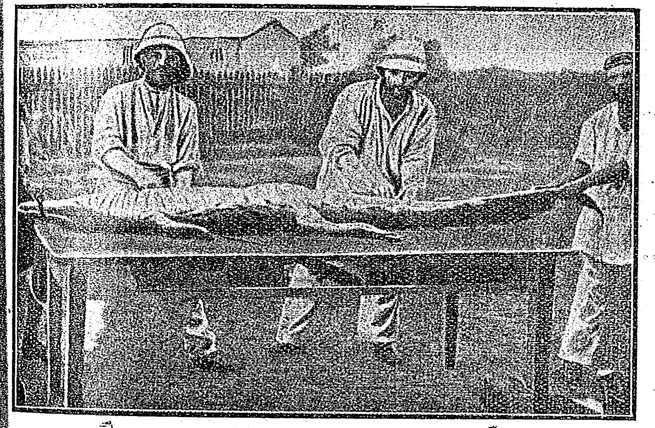

শিকার-করা মৃত-কুমীরের চামড়া খুলছে

প্রদেশে দেখতে পাওয়া যায়। তবে রকম বাড়ী সকলেই তৈরী ক'রতে রে না; এর একমাত্র কারণ, ব্যয়-ল্য। কাজেই, যে-ব্যক্তি সরকারী থবা বেসরকারী পদস্থ কর্ম্মচারীর জ করেন, অর্থাৎ যাঁর অধীনে অনেক ী কাজ করে, কেবল তিনি-ই ওই কুলীর সাহায্যে দূরস্থ জঙ্গল থেকে য়োজনীয় কাঠ সংগ্রহ ক'রে আনতে রেন।

পশ্চিম-প্রদেশগুলিতে উত্তাপ হচ্ছে ারি রকমের, এবং সেখানকার

জমি হচ্ছে বালির জমি। সেখানে শাকালাভা-সম্প্রদায়স্থ লোকেরা কাঠ ও পাতা দিয়ে বাড়ী তৈরী করে। অনেক ইংরাজ বলেন, এই ধরণের বাড়ী, ওই রকম কুঁড়ে লোকদের পক্ষে যথেষ্ট।

ম্যাডাগাস্কারের লোকেরা যাদের বংশধর, তারা সেখানে এসেছিল সুদূর দেশ থেকে, ভারত-মহাসাগর পার হ'য়ে। তারা ছিল সুদক্ষ নাবিক। কিন্তু তাদের-ই বংশধরদের বেশীর ভাগ লোকই নৌ-চালনের দক্ষতা রাখে অল্পই, এদের নৌকা-তৈরীর বহর দেখলেই তার বেশ-ই মালুম হয়। এদের

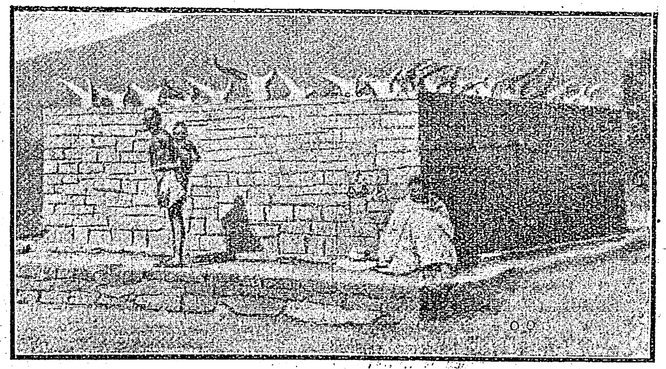

পাথরের প্রাচীর-ঘেরা সমাধি-ক্ষেত্র। মৃতব্যক্তির স্মৃতিরক্ষার জন্য সমাধি-ক্ষেত্রে প্রচুর বলদের শিং পোঁতা হ'য়েছে

নৌকা ব'লতে তিরিশটী কিম্বা চল্লিশটী বাঁশকে বোঝায়। এই বাঁশগুলিকে লতার সাহায্যে তারা কোনো প্রকারে বাঁধে। এইটাই তাদের নৌকা। এ-হেন নৌকা এম্‌নি মজ্‌বুত যে, মালপত্তর সমেত দুটী কিম্বা তিনটী লোক তার উপর উঠলেই, তিনি আধা-ডুবন্ত হ'য়ে পড়েন। ঐ নৌকায় একটী বিভক্ত বাঁশ, দাঁড়ের কাজ করে। মাত্র একশ' গজ দীর্ঘ একটী নদীতে এক ঘণ্টায় চারবারের বেশী ঐ নৌকায় 'ফেরী' করা চলে না। দক্ষিণপূর্ব্ব অঞ্চলের লোকেরা কিন্তু বেশ বুদ্ধিমান। তারা গাছের গুঁড়ি বেঁধে নৌকা তৈরী ক'রতে জানে। এই নৌকা দৈর্ঘ্যে হয় ৩০ ফিট, এবং প্রস্থে হয় ৮ ফিট। এই রকম নৌকা এক সময়ে ৫০ জন যাত্রীকে নিয়ে যেতে পারে।

কেশ-বিন্যাস

ডুলি-বাহক

সেখানে ডোঙ্গা তৈরী হয়—গাছের গুঁড়ি ফাঁপা ক'রে। এগুলি সাধারণতঃ লম্বায় হয় প্রায় তিরিশ কিম্বা চল্লিশ ফিট। এদের গতি বেশ দ্রুতই।

উত্তর-পশ্চিম উপকূলে মৎস্য শিকারের সুবিধা আছে। শাকালাভা-জাতীয় লোকেরা নৌকায় পাল তুলে ঐ স্থানে মাছের সন্ধানে যায়।

ম্যাডাগাস্কারের লোকেরা খুবই সংস্কার-প্রবণ জাতি। কথায়-কথায় তারা গণৎকারের শরণাপন্ন হয়। কোনো প্রয়োজনীয় কাজ আরম্ভ হবার আগেই গণৎকারকে ডেকে আনা চাইই। গণৎকারের ভাগ্য-গণনার ব্যাপারটী বেশ-একটু নতুন ধরণের। প্রথমেই তিনি একটা মাদুর পাতবেন ব'লবেন। তার পর সেই মাদুরের উপর কতকগুলি ঘর কাটবেন। সেই সব ঘরে বিভিন্ন সংখ্যার মটর রাখবেন। তার পর তিনি সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় বিড়্‌বিড়্‌ ক'রে কি-সব মন্ত্র প'ড়বেন। এই কাজ শেষ হ'লেই তিনি প্রকাশ ক'রে বলবেন যে, জিজ্ঞাসু ব্যক্তির জাতব্য শুভ কি, অশুভ।

সেখানকার ডাক্তারদের কাছে লোকের ভীড়ও একটা দ্রষ্টব্য ব্যাপার। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ডাক্তাররা রোগ সারাতে পারে খুবই অল্পই। কিন্তু তবুও লোকেরা পঙ্গপালের মতো ছোটে তাঁদের কাছে প্রত্যহই। ডাক্তারদের অর্জ্জিত পুণ্য আছে, নিঃসন্দেহ!

সেখানকার বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহের বিভিন্ন প্র

বর্ত্তমান আছে। কোনো-কোনো জাতি অতি দূর-আত্মীয়কেও বিবাহ করে না। যদি করে, তা হ'লে একটা সামাজিক গণ্ডগোল হবেই। আবার কখনো-কখনো এমনও হয় যে, যথারীতি দেখা-শুনোর পর বিবাহ হ'য়ে গেছে। কিন্তু বিবাহের পরই যদি আগে থেকেই কোনো আত্মীয়তার সম্বন্ধ বেরিয়ে পড়ে, তা হ'লে ওই বিবাহ তৎক্ষণাৎ ভেঙ্গে যাবে। এই বিবাহ-বিধির একবার কিন্তু পরিবর্ত্তন হ'য়েছিল। সেবার এ্যান্টিমেরিনা-জাতীয় এক রাজা তাঁর এক বোন্‌কে বিবাহ ক'রেছিলেন। এর কারণ শোনা যায় যে, রাজ-পরিবারের মধ্যে শুচিতা রক্ষা করাই ছিল রাজার উদ্দেশ্য।

হোভা-জাতীয় লোকেরা তাদের ছেলেদের জন্য নিজেরাই পাত্রী পছন্দ করে। কিন্তু শাকালাভা-জাতীয় যুবকেরা ঐ ব্যাপারে পিতার রুচির ধার ধারে না। তারা নিজেরাই নিজেদের ক'নে পছন্দ করে। কাজেই, তাদের বিবাহ-প্রথাটী অনেকটা যেন ইয়োরোপীয় ভাবাপন্ন, এ কথা ব'ললে ভুল বলা হবে না। অধিকাংশ লোকের মধ্যেই বিবাহ-বিচ্ছেদ চল্‌তি আছে। সেখানকার বিবাহ-বিচ্ছেদ হচ্ছে একটী খুবই সোজা ব্যাপার। স্বামী স্পষ্ট ক'রেই স্ত্রীকে বলে যে, এবার থেকে আর পরস্পরের দাম্পত্য-সম্বন্ধের দরকার নেই; সুতরাং—

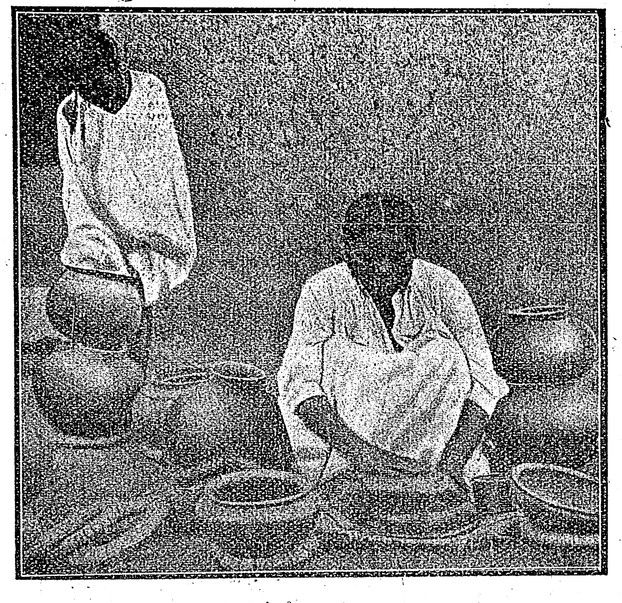

মৃৎ-শিল্প ও শিল্পী

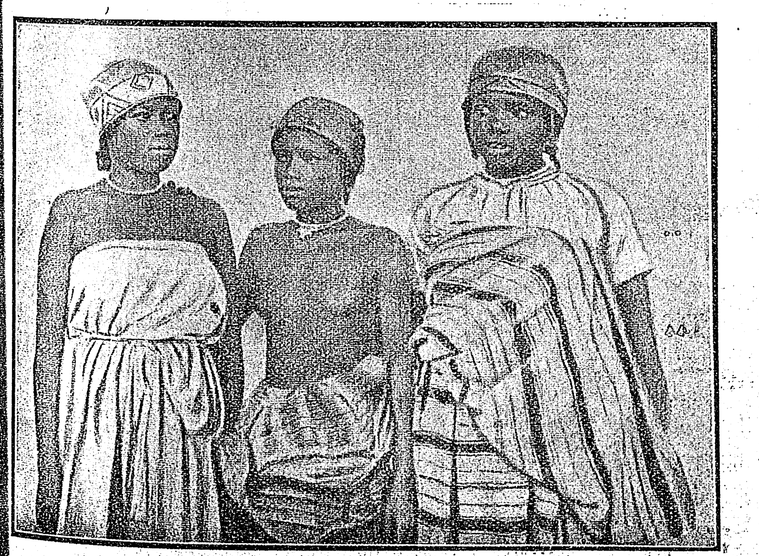

ম্যাডাগাসি-মেয়ে

সুতরাং দুজনেই দুজনকে সেলাম ঠুকে তফাৎ হয়।

বিবাহের মতো সে খা নে মৃতদেহ কবরস্থ করার প্রথাও বিভিন্ন। কেউ-কেউ মৃতদেহকে নির্জ্জন স্থানে কবরস্থ করে, আবার, কেউ-কেউ তা করে—নিজেদের গ্রা মে র ভিতরেই। কেউ-কেউ মৃত্যুর ঠিক পরেই মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করে; আবার, কেউ-কেউ অ পে ক্ষা করে ঠিক ত তু দি ন পর্য্যন্ত, যতদিন পর্য্যন্ত না মৃতদেহ রীতি-মত প'চে যায়। সাধারণতঃ সেখানকার অধিকাংশ লোকই মৃ ত দে হ কে কবরস্থ করে—

নিজেদের বাড়ী থেকে বেশ কিছু দূরেই। মৃতদেহকে লম্বা-লম্বা কতকগুলি বাঁশে বাঁধা হয়। তার পর সেটীকে নিয়ে সমাধি-ক্ষেত্রের দিকে যাওয়া হয়। শব-যাত্রীদের যাবার পথে যদি রাত্তির হ'য়ে পড়ে, তা হ'লে কোনো রাত্রি-নিবাসের দেয়ালে বাঁশে-বাঁধা শবদেহকে হেলিয়ে রেখে, সকলে ঐ নিবাসে রাত কাটায়।

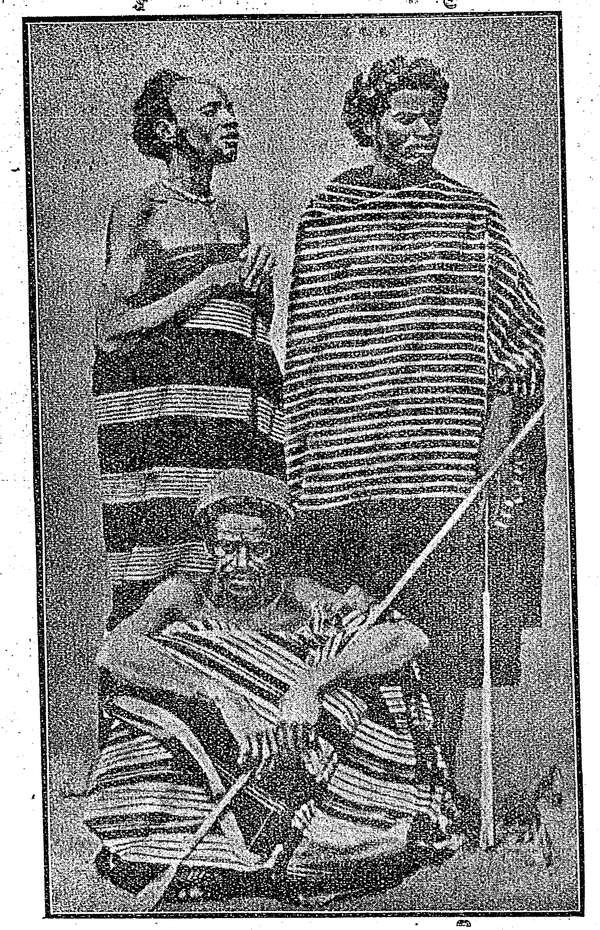

যুদ্ধ-প্রিয় পাহাড়ী লোক

কবর-ক্ষেত্রগুলিকে সেখানকার লোকেরা দস্তর মত ভয় করে, যেহেতু, তাদের এই রকম ধারণা যে, ঐ সব স্থানে মৃত ব্যক্তিদের প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়ায়। কাজেই, তারা সেখান দিয়ে-যাওয়া পথিকদের ঘাড় না ম'ট্‌কে আর যায় কোথা! মৃতব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া খুব ধুম-ধাম ক'রেই সম্পন্ন হয়। দীয়তাং-ভুজ্যতাং-এর ব্যবস্থা হয় প্রচুর। যথা:- অনেকগুলি বলদ বলিদান করা হয় এবং পেয়ারও সুবন্দোবস্ত হয়।

প্রায়ই, পাথর কিম্বা কাঠ দিয়ে মৃত ব্যক্তির স্মৃতিচিহ্ন তৈরী করা হয়। শাকালাভাদের কবর-ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যে প্রচুর বলদের শিং পুঁতে রাখা হয় এবং চারিদিক পাথর ঘিরে রাখা হয়। মৃত দেহের সঙ্গে মৃত ব্যক্তির অর্থরাশিও কবরস্থ করা হয়।

হোভা-জাতীয় লোকেরা কিন্তু খোলা জায়গায় মৃতদেহ কবরস্থ করে না; তারা তা করে—গুহার মধ্যে। বেট্‌সিমিসারাকা-জাতীয় লোকেরা ফাঁপা করা কফিনের মধ্যে মৃতদেহ রাখে। সে-কফিনকে কফিন বলা উচিত নয়, এম্‌নি তা বিশ্রী। তাকে ঢেকে রাখে একটা সীসের চাদর। এ-হেন কফিনের ধারণা ক'রতে পারবেন—একমাত্র তাঁরাই, যাঁরা স্বচক্ষে ডোঙ্গা দেখেছেন। ডোঙ্গার চেয়ে তা কোনো অংশেই শ্রেষ্ঠ নয়। যাই হোক, শবদেহ কিন্তু কবরস্থ করা হয় না। রীতি অনুযায়ী, গরীবলোকেরা অনাবৃত মাটীর ওপর, এবং ধনীলোকেরা মঞ্চের উপর মৃতদেহ রেখে দেয়।

বেট্‌সিলিয়ো-জাতীয় লোকেরা এক প্রকার সাপকে বাড়ীর লোকের মতোই ব্যবহার করে। তারা মনে করে যে, ওই সব সাপ হচ্ছে—মৃত ব্যক্তিদের আত্মার-ই রূপান্তর। এইজন্য সাপদের প্রতি তারা শ্রদ্ধাও দেখায় কম নয়! কিন্তু এই সব সাপ বা সরীসৃপ কোথা থেকে আসে? এর একটু ইতিহাস আছে:—

কোনো লোক মারা গেলে, তার মৃতদেহকে বাড়ীতে রাখা হয়, যতক্ষণ না তা প'চে গ'লতে আরম্ভ করে। ওই গলিত তরল পদার্থের খানিকটা অংশ একটা পাত্রে নেওয়া হয়। কিছুদিনের মধ্যেই ঐ পাত্রে বড় বড় পোকা জন্মায়। তখন ঐ পাত্রের মুখ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়; কেবল একটা ছিদ্র-পথে একটা লম্বা কাঠি এমন ভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যাতে পোকাগুলো ওই কাঠি বেয়ে' বেরিয়ে আসতে পারে। পরে, ঐ পাত্রটীকে পারিবারিক সমাধি-ক্ষেত্রে

রেখে আসা হয়। কিছুদিনের মধ্যে কতকগুলি সরীসৃপ ঐ পাত্র থেকে বেরিয়ে পড়ে। গ্রামের মধ্যে এই রকম সরীসৃপ দেখলেই, তাকে রেশমের কাপড় ও খাবারের অঞ্জলি দেওয়া হয়। এই দেওয়াতেই প্রকাশ পায় যে, অঞ্জলি দাতা হচ্ছে সরীসৃপের আত্মীয়।

প্রধানতঃ সেখানকার ধর্ম্ম হচ্ছে পিতৃ-পুরুষের পূজা। অবশ্য সেখানকার দেবাদি-দেবও আছেন। তিনি হচ্ছেন জানাহারি। কিন্তু তিনি কারুর অনিষ্ট ক'রতে পারেন না এবং মানুষের ব্যাপারে তাঁর কোনো হাতও নেই। কাজেই, তিনি আমল-ও পান না। যে-দেবতার দ্বারা কাজ হয় না, সে-দেবতার পূজা ক'রে লাভ কি?—এই রকমই সেখানকার মনোবৃত্তি।

সেখানকার এক প্রকার কু-সংস্কারের কথা বলা বিশেষ দরকার। সংস্কারটীকে কতকগুলি "বাধা"র সমষ্টি ব'ললে ভুল বলা হবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, জল তুলতে যাবার সময় কোনো লোককে তার নাম ধ'রে ডাকায় বাধা আছে, কারণ, লোকটা তাতে নিশ্চয়ই ম'রবে। কাজেই, তাকে বাঁচাতে হ'লে, তার উদ্দেশ্যে অভিসম্পাত উচ্চারণ ক'রে, তার দুরদৃষ্টকে খণ্ডন ক'রতে হবে।

দাঁড়িয়ে, শুয়ে, কিম্বা মাথায় টুপী প'রে যাওয়া, একাধিক বড় চাম্‌চে পরস্পরের উপর আড়াআড়ি রাখা, চাম্‌চে দিয়ে মারা, এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় ফল ছুঁড়ে দেওয়া, খাবার সময়ে হাত ঢেকে হাড়ের ভিতর থেকে মজ্জা চুষে বের করা,—ইত্যাদি ব্যাপারেও 'বাধা' আছে। এমন কি, জোরে হাসা, টুপী পরা, আর্শীতে মুখ দেখা, দাঁত মাজা, ছাতা-ব্যবহার এবং সাঙ্কেতিক বাঁশী-বাজানোর মধ্যে 'বাধা' আছে অগুন্তি।

কেশ-বিন্যাসের ফ্যাসান

তাঁত

চাল সেখানকার প্রধান খাদ্য। শাঁকআলুও লোকেরা খুব ভালবাসে। দুধের চেয়ে মাছের ঝোলের আদর সেখানে বেশী।

সেখানে মোট ২৫০,০০০ বর্গমাইল জায়গা আছে। ম্যাডাগাস্কারের দৈর্ঘ্য প্রায় এক হাজার মাইল, এবং প্রস্থে তিনশ' মাইল।

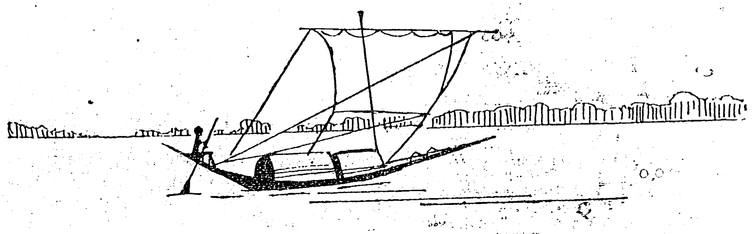

ব্রতচারী

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়

(এক)

সহরের সামান্তে একটি পল্লী। পল্লী-প্রান্তে একটি নদী। নদী-তীরে খোলা মাঠ। এক শত বিঘা জমির বেড়ের মাঝখানটায় খানকয়েক ঘর। ঘরগুলির সুমুখে সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণ-খানি দূর্ব্বাদলের আচ্ছাদনে শ্যামল-শ্রী। প্রাঙ্গণের দুধারে পুষ্পোদ্যান—সুরচিত, সুসজ্জিত। উদ্যান ছাড়িয়ে খানিকটা দূরে গোয়াল-ঘর। গোয়ালে পাঁচ সাতটা গাভী—বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট, দুগ্ধবতী। গোয়ালের আশে-পাশে শাক-সব্জী, তরি-তরকারীর বাগান। বাড়ীর বেড়ের ধারে-ধারে নানান্ রকমের ফলের গাছ।

গোয়াল-ঘর ও রান্না ঘর ভিন্ন আর সব কয়খানি ঘরই খড়ের ছাউনীর। কিন্তু নির্ম্মাণ-নৈপুণ্যে বেশ সুদৃশ্য। একখানি ঘরে বাড়ীর মালিক থাকেন। সে ঘরের ভিটি পাকা। পাক ভিটির মেঝের উপর ফরাসের বিছানা পাতা। ভিতরে কোথাও বিলাস-বিভবের চিহ্নই নাই। কিন্তু সব এম্‌নিভাবে সাজানো-গোছানো, দেখেই মনে হয়—ঘরে যিনি থাকেন তিনি সুরুচি-সম্পন্ন। আর একখানি ঘর—এখানা আয়তনে বড়। দুটি কামরা—বেশ প্রশস্ত। একটি অতিথি-অভ্যাগতের জন্য, আর একটি বাড়ীর লোকজনের থাক্‌বার। লোকজনের মধ্যে মালিকের তিনটি চাকর, আর জন দশেক অনাথ ছেলে। চাকর তিনটি সেই সম্প্রদায়েরই লোক যাদের বুকের উপর অস্পৃশ্যতার জগদ্দল পাষাণ চাপিয়ে দিয়ে সমাজ-প্রধানেরা অচল করে' রেখেছে। অনাথ ছেলেদের মধ্যে একটি মুচি, একটি মেথর, আর কয়টি কোন্ জাতের কেউ জানে না। আর দুখানি ঘরও বড়। একখানি রোগীদের বস্‌বার, আর একখানি নৈশ-বিদ্যালয়ের ছেলেদের পড়্‌বার।

(দুই)

বাড়ীর মালিক ডাক্তার সুবিমল বসু। যুবাপুরুষ, বেশ বলিষ্ঠ গঠন, সুস্থ, সুশ্রী! চোখে-মুখে সংযম-নিষ্ঠার জ্যোতিঃ সুস্পষ্ট। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত। বছর কয়েকের মধ্যেই সহরের একজন বড় চিকিৎসক বলে' সুনাম হয়েছে।

বৈশাখের বেলা-শেষে। গোধূলির লালিমায় আকাশ রাঙা। রঞ্জিত গগনের সে রক্তিম ছবিটি নদী-জলে প্রতিফলিত। তীরে বসে' দুই বন্ধু। সুবিমল কোনো দিনই সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফিরবার অবসর পায় না। বন্ধু আজ তার গৃহে অতিথি। তাই বেলা-শেষেই বাড়ী ফিরে' এসেছে।

"তোমার সুখ্যাতি সহরের বাইরে গাঁয়ে পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। সহরে তোমার ব্যবসা ত একচেটে। প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ আছে বলে' ত শুন্‌লুম না।" বন্ধুর এই প্রশংসায় সুবিমল নিরুত্তর। বন্ধু জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"টাকা-পয়সা সব কি কর?"

"কি আর কর্‌ব, খরচ করি।"—হাসিমুখে সুবিমল এই উত্তর দিলে। বন্ধু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"সব টাকা?"

"প্রায় সবই।"

"হাজার টাকার উপরে ত তোমার আয়।"

"ঐ রকমেরই একটা কিছু হবে। হিসেব-টিসেব বড় একটা কিছু রাখি না। সময়ও হয়ে ওঠে না।"

বন্ধু আবার বললেন—"এত টাকা কিসে তাহ'লে খরচ কর? বাড়ীতে ত তোমার টাকা-পয়সার অভাব নেই। কিছু দিতেও হয় না।"

"গরীব রোগীদের ঔষধ বিতরণে অনেক টাকা যায়। অনেকের পথ্য-খরচও চালা'তে হয়। তার পর চাষী-মজুর আর অস্পৃশ্য জাতের ছেলেদের জন্যে নৈশ-বিদ্যালয় খুলেছি, তাতেও খরচা কম হয় না। মাসে শ'তিনেক টাকা করে জমাচ্ছি। একটা সেবা-সদন্ প্রতিষ্ঠা কর্‌ব। পঞ্চাশজন রোগীর স্থান সঙ্কুলান হতে পারে, এমন একটা পাকা বাড়ী তৈরী হবে। সকল জাতের গরীব রোগীদের বিনি-খরচায়

চিকিৎসা আর সেবা-শুশ্রূষার বন্দোবস্ত থাক্‌বে। জমানো টাকাটা ঐ কাজেই লাগাব।"

"শুধু তোমার ঐ জমানো টাকায় কি আর ঐ রকমের একটা বড় প্রতিষ্ঠান গড়্‌তে পার্‌বে?"—বন্ধুর প্রশ্নটির জবাবে সুবিমল বল্‌লে—"তা'ত হবেই না। সহরের কয়েকজন সহৃদয় ধনী এ কাজে সাহায্য কর্‌বেন বলে' কথা দিয়েছেন। গ্ল্যান্ হয়ে গেছে। পাশেই আরো জমি নিয়েছি। তোমায় সব দেখাব। আস্‌ছে শীতেই কাজ আরম্ভ হবে।"

"বিয়ে-থা কর্‌বে না?"

"সে কাজের আর অবসর কই?"

"ওতে আবার অবসরের দরকার হয় না কি?"

"হয় না! বল কি?" এর-উত্তরে বন্ধু বল্‌লে—"না ভাই, তাম্‌সা নয়। তোমার বাবা-মা আমাকে পাঠিয়েছেন। তাঁদের অনুরোধে তিন মাসের ছুটি নিয়ে এসেছি শুধু এরই জন্যে।"

"কেন, বাংলাদেশে কি ঘটকের অভাব হয়েছে, যে, পশ্চিমাঞ্চল থেকে তোমায় ডেকে' আন্‌তে হবে। আচ্ছা, তুমি এখন কত মাইনে পাচ্ছ?"

"সাড়ে চার শ'।"

"প্রফেসারের কাজে বেশ আরাম। আমাদের ডাক্তারী ব্যবসার মতন এত দায়িত্ব আর এত ভাবনা-চিন্তাও নেই।"

বন্ধু বলে' উঠ্‌লেন—"ওসব কথা রেখে' দাও। কাজের কথায় এস। সত্যি বল, কি স্থির করেছ। আমি ত চিঠিতেও তোমায় সব কথা লিখেছি।"

"হ্যাঁ, তা' ত লিখেছই। আমি ত অনেক দিন থেকেই স্থির করেছি, বিয়ে কর্‌ব না।"

"কেন?"

"একটা বন্ধনের মাঝে জড়িয়ে পড়্‌লে জীবনের আদর্শটিকে সার্থক করে' তুল্‌তে পার্‌ব না।"

"নারীকে তাহ'লে তুমি শ্রদ্ধা কর না! নারীর শক্তিতেও তোমার বিশ্বাস নেই!" বন্ধু কঠোর স্বরেই ঐ কথা কয়টি বল্‌ল।

তখন সন্ধ্যার ম্লান ছায়া ধরার বুকে নেমে আস্‌ছিল। কথার কোনো জবাব না দিয়েই সুবিমল 'চল, যাই' বলে' উঠে' দাঁড়াল। বল্‌লে—"ছেলেরা সব এতক্ষণ পাঠশালে এসে গেছে। পড়াতে হবে তাদের।" এই বলে' বাড়ী চল্‌ল; বন্ধুও সাথে। পথ চল্‌তে চল্‌তে সুবিমল বল্‌তে লাগ্‌ল—"নারীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা—নারী-শক্তিতে আমার বিশ্বাস গভীর। সে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস তোমাদের মত বিবাহিত লোকের—যাদের বেশীর ভাগই নারীকে বিলাসের বস্তু বলে' মনে করে—তাদের শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের চেয়ে সত্যিকার। তাদের শ্রদ্ধা মুখের, আমার শ্রদ্ধা অন্তরের।" সুবিমলকে ভাবোদ্বেল দেখে' বন্ধু এবার কোমল কণ্ঠে বল্‌লে—"আমার কাছে, ভাই, নারী কিন্তু রহস্যময়ী। বিশ্ব কবির-ই কথা—'রমণীরে কেবা জানে, মন তার কোন্‌খানে।"

"হতে পারে তোমার কাছে নারী একটা হেঁয়ালী। তা আর আশ্চর্য্য কি।"

বন্ধু হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—"আচ্ছা, আমি যদি নারীকে কবির ভাষায় বলি—'অর্দ্ধেক মানবী তুমি, অর্দ্ধেক কল্পনা।"

"বল্‌তে পার।"—সুবিমল শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলে।

(তিন)

বাড়ী পৌঁছে' সুবিমল দেখ্‌তে পেল নৈশ-বিদ্যালয়ের ছেলেরা সব পাঠ-গৃহের আঙিনায় ছুটোছুটি কর্‌ছে। তাকে দেখে' ছোট ছোট ছেলেগুলি লাফিয়ে তার পাশে জড় হল। কেউ তার হাত ধরে' নাচ্‌তে নাচ্‌তে বল্‌ল—"গুরুজি! চল, আমাদের পড়াবে চল।"

বৈশাখী-পূর্ণিমার সন্ধ্যা। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। চাঁদের আলো ম্লান, নিষ্প্রভ। মাঝে মাঝে দম্‌কা হাওয়ার ঝাপ্‌টা জমাট-বাঁধা মেঘগুলোকে যখন উড়িয়ে নিয়ে যায়, তখন চাঁদের ম্লানিমা দূর হয়ে আলোক-রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে ধরার গায়। আবার বাতাসের নাচন যখনই বন্ধ হয়, আকাশের চাঁদিমা, মেঘান্তরালে তার সলাজ মুখটি লুকায়। চন্দ্র ও মেঘের এই কোলাকুলি, আলো-বাতাসের গলাগলি—প্রকৃতির লীলায়িত গতি-ভঙ্গী সুবিমল মুগ্ধ-নেত্রে নিরীক্ষণ কর্‌ছিল। আর প্রাণের মাঝে তার জাগ্‌ছিল বন্ধুর কণ্ঠোচ্চারিত কবি-বাণী—"অর্দ্ধেক মানবী তুমি, অর্দ্ধেক কল্পনা।" আকাশের পানে চেয়ে এম্‌নি তন্ময় সে, কি যে বল্‌ছিল পড়ুয়া ছেলেরা তা তার কানে পৌঁছয় নি। ছোট ছোট ছেলেরা অভিমানে মুখ ভারি করে' বল্‌লে—"আম্‌রা চলে' যাই। গুরুজী রাগ করেছে।" এই বলে' ছেলেগুলো সুবিমলের হাত ছেড়ে দিয়ে যখন তার কাছ

থেকে সরে' গেল, তখন তার দৃষ্টি সেদিকে পড়ল। সুবিমল ছেলেদের কাছে এগিয়ে গিয়ে হাত বুলিয়ে কত আদর করে' বল্‌লে—"কি রে, হলো কি তোদের?" "তুমি কথা কও না যে। রাগ করেছ। আমরা বাড়ী চলে' চাই।"—ছেলেগুলো আরও কত কি বল্‌তে লাগ্‌ল। সুবিমল তাদের সেধে-সুধে বল্‌লে—"নারে রাগ ত করিনি। চল্, পড়্‌বি চল।" এই বলে' ছেলেদের নিয়ে পাঠ-গৃহে চাটাই পেতে' বসে' গেল। কিছুক্ষণ পড়া হল। কিন্তু সেদিন পড়া জমেনি ভালো। সুবিমল ছিল উন্মনা। আর এদিকে বাইরে দুর্য্যোগের লক্ষণ প্রকট। আকাশের গায় বিজ্‌লী-চমক, ঘন ঘন্ দেয়া গরজন, ঝড়ো হাওয়ার বেতাল ছন্দের নাচন—যেন কাল-বৈশাখীর তাণ্ডব লীলার পূর্ব্ব-আয়োজন। সুবিমল ছেলেদের বল্‌লে—"ঝড় আস্‌ছে, চল্, তোদের এগিয়ে দি।" বলে' ছেলেদের নিয়ে বেরিয়ে পড়্‌ল।

(চার)

ফিরে' এসে সুবিমল বন্ধুকে বল্‌ল—"চল, খেতে যাই। তোমায় বল্‌তে ভুলে' গেছি, আমার এখানে জাত্-বিচার নেই। সবারই সাথে এক পংক্তিতে বসে' খেতে হবে কিন্তু। আমার এখানে তুমি বামুন-পণ্ডিতের বংশধরও যা, আর মুচি-মেথরের ছেলেও তা'। বুঝ্‌লে ত ভাই?" বন্ধু হাসিমুখে জবাব দিল—"তোমার এখানে কি হয়-না-হয় সব খবর রাখি আমি। জাত্-বিচার আমি যে কতটা মেনে চলি, তা' ত তোমার অজানা নেই।" বলে' দুই বন্ধু আহারে গেল।

পরদিন সকালবেলা বন্ধু বিদায় নিয়ে চলেছে। বিদায়-কালে বন্ধু হাসিমুখে বল্‌ল—"প্রার্থনা করি, নারীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা একদিন যেন লীলা-কমল হয়ে তোমার অন্তর-মাঝে ফুটে' ওঠে।"

"ওঠেই যদি, তবে আমি নির্ম্মমের মতন তার পাপড়ি-গুলো ছিঁড়ে ফেলে' চরণ-তলে দল্‌তে পার্‌ব না।" স্মিতমুখে এই কথাটি বলে' সুবিমল বন্ধুকে বিদায় দিল।

(পাঁচ)

চার বছর পরের কথা। সুবিমলের সংকল্পিত সেবা-সদনের দ্বারোদ্‌ঘাটন-উৎসব সম্পন্ন হয়ে গেছে। নানা-বিভাগের কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সুবিমলের পরিপূর্ণ সাধনাকে আশ্রয় করে' যে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে' উঠ্‌ছে, তার সুখ্যাতি দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে।

লোকনাথবাবু সহরের একজন বড় উকীল। তিনি এই প্রতিষ্ঠানে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে দশ হাজার টাকা দান করেছেন। তাঁর পারিবারিক চিকিৎসক হিসাবে সে বাড়ীতে সুবিমলের যাতায়াত আছে। এই দানের মধ্য দিয়ে সুবিমলের সঙ্গে লোকনাথবাবুর একটা অন্তরের যোগ স্থাপিত হল।

কুমারী মালতী লোকনাথবাবুর একমাত্র কন্যা। কলেজের ছাত্রী। বয়স আঠারো। মালতী তার পিতার সাথে মাঝে মাঝে সুবিমলের প্রতিষ্ঠানটি দেখ্‌তে যেত। প্রতিষ্ঠানটিতে একজন ব্রতচারী তরুণের বিপুল সাধনা ও মহান্ হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে মালতী কতদিন তাঁর উদ্দেশে মৌন শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে।

মালতীর জ্বর। দিনের পর দিন যায়, জ্বরের বিরাম নাই। সুবিমলের আপ্রাণ চেষ্টায় ও সুচিকিৎসার ফলেও কোনো পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। মালতীর পরিপুষ্ট দেহখানি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগ্‌ল। তার সুন্দর মুখখানি ভোর-গগনের তারাটির মতন ম্লান, নিষ্প্রভ। সুবিমল যখনই মালতীর শয্যায় এসে বসে, তখন তার রোগ-মলিন মুখখানি ক্ষণেকের তরে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সুবিমলের স্পর্শে তার জীর্ণ বুকের মাঝে এক অজানা পুলকের অনুভূতি জাগে। সকালে যাওয়ার বেলা রোগিণী নিজেই বলে' দেয়—দুপুর বেলা আর একবার দেখে যাবেন; আর দুপুরে সে বলে—বিকেলে আস্‌তে ভুল্‌বেন না। এভাবে সুবিমলকে রোজ তিনবার করে' আস্‌তে হয়। মালতী ভাব্‌ত, তার রোগ যেন আর না সারে। রোগ সেরে' গেলে ত সুবিমলের বাঞ্ছিত সান্নিধ্য থেকে সে কত দূরে পড়ে' থাক্‌বে—তার সুখ-স্পর্শ থেকে সে বঞ্চিত হবে। তার মনের মধ্যে ঐ এক চিন্তা—তিনি যে ব্রতচারী! আমার দেহ নিরাময় হলে তিনি আর স্পর্শ করবেন কেন!

জ্বর টাইফয়েডে পরিণত হল। মালতী প্রলাপ বক্‌তে লাগ্‌ল। অবস্থা খারাপের দিকেই। সুবিমলকে এখন এ-বাড়ীতেই রাত্রি-যাপন কর্‌তে হয়। সারা দিন-রাতের মধ্যে কতবার যে রোগিণীর কাছে আস্‌তে হয়, তার আর সীমা নেই। চিকিৎসা করে'ই সুবিমলের এখন আর

তৃপ্তি হয় না, নিজহাতে রোগিণীর সেবা-শুশ্রূষাও সে করে। সুবিমলের মনের মধ্যে একটা বিপ্লব যে আসন্ন, মাঝে মাঝে সে তা' অনুভব কর্‌ত।

সময় সময় জ্বরের বিরাম হতে লাগ্‌ল। জ্বরের বিরামের অবস্থায় প্রলাপ বন্ধ হত,—কোনো কোনো সময় রোগিণীর পূর্ণ চেতনা ফিরে' আস্‌ত। বাড়ীর লোক কিছু আশ্বস্ত হল; কিন্তু ডাক্তার রোগিণীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারে নাই।

(ছয়)

রোগের এম্‌নি অবস্থায় একদিন আসন্ন সন্ধ্যায় সুবিমল রোগিণীর শয্যা-পার্শ্বে উপবিষ্ট। তখনও সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলেনি। মালতীর চোখ তন্দ্রা-নিমীলিত। মালতীর রোগ-শীর্ণ বিশুষ্ক মুখখানি—মুদিত দুটি আঁখি। সুবিমলের মুগ্ধ দৃষ্টি তারই পানে নিবদ্ধ। মনে হল—এ যেন কোন্ দেবতার সোনার দেউলের হিরণ্ময় প্রদীপটি নিভে গেছে। ভাব্‌তে সুবিমলের সমবেদনা-ভরা প্রাণটি ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল। সে নাড়ী পরীক্ষা কর্‌তেই রোগিণীর তন্দ্রা টুট্‌ল। সুবিমল তা' বুঝ্‌তে পারে নি। রোগিণীর চোখ দুটি তেম্‌নি নিমীলিত। নাড়ীর গতি মন্দ নয়। সুবিমলের হাতের মধ্যে মালতীর হাতখানি। মালতী চোখ মেলে' দুর্ব্বল কণ্ঠে বল্‌ল—"কখন আস্‌লেন?" সে ক্ষীণ কণ্ঠ-স্বর সুবিমলের কানে পৌঁছয় নি। কিন্তু সে বুঝেছিল, মালতী যেন কি বল্‌ছিল। মালতীর মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে' সুবিমল জিজ্ঞেস কর্‌লে—"কি বল্‌ছিলে?" "বল্‌ছিলুম, কখন আস্‌লেন।"—বল্‌তেই মালতীর চোখ দুটি দৈহিক দুর্ব্বলতায় আপনি বুজে আস্‌ল। "হল কতক্ষণ"—সুবিমলের কণ্ঠস্বর বেদনা-করুণ।

মালতী পাশ ফিরবার চেষ্টা কর্‌তেই সুবিমল তাকে ধরে' আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়ে দিল। সুবিমলের হাতখানি মালতী তার বুকের দিকে টেনে' নিয়ে বল্‌ল—"দেখুন ত আমার জ্বর আস্‌ছে না কি!" "না, তেমন কিছু ত মনে হচ্ছে না।" সুবিমলের হাতখানি মালতী গভীর আবেশে বুকের 'পরে চেপে' রেখে বল্‌ল—"আমাকে বাঁচাবার জন্যে আপনার এই আপ্রাণ চেষ্টা, আর আপনার ঐ প্রাণ-ভরা সেবা-যত্ন—বলুন ত, এর ঋণ কি করে' শুধ্‌ব?"

"এ কাজটিকে এত বড় করে' দেখ্‌বার কি আছে? কর্ত্তব্য করে' যাচ্ছি মাত্র।"

"তার বেশী কিছু করেন নি বুঝি?" মালতীর এই প্রশ্নে সুবিমল নীরব। দুর্ব্বল কণ্ঠে মালতী আবার বল্‌ল—"যাই করুন না কেন, আমাকে বাঁচাতে পারবেন না। আপনি যতই গোপন করুন, আমি বেশ অনুভব কর্‌তে পারছি দিনের পর দিন আমার শরীর ক্ষয়ে' যাচ্ছে। আপনার দুঃখ থাক্‌বে, এত করে'ও আমাকে রাখ্‌তে পারলেন না। কিন্তু আপনার ঐ কত-আপন-করা সেবা-যত্নটির স্নিগ্ধ স্মৃতি বুকে নিয়ে আমি সত্যি সুখে মর্‌ব। বিশ্বাস করেন না বুঝি?"—এই বলে' মালতী চোখ মেলে' সুবিমলের পানে চাইল। দেখ্‌তে পেল—সুবিমলের অশ্রুভারাক্রান্ত সুন্দর চোখ দুটির স্থির, নিশ্চল দৃষ্টি তারই মুখ-পানে। দু'জনায় কিছুকাল এম্‌নি নীরব। ভৃত্য কখন যে সন্ধ্যা-প্রদীপ জেলে' দিয়ে গেল, কেউ টের পায় নি। দেওয়ালের কোণে টেবিলের নীচে মিটি মিটি আলোটি জ্বল্‌ছে।

(সাত)

সে-দিন ছিল আশ্বিনের স্নিগ্ধ সন্ধ্যা। সাম্‌নের আঙিনার পুষ্পোদ্যান থেকে মৃদু-মন্দ বাতাসে ফুলের গন্ধ ভেসে আস্‌ছিল। মুক্ত বাতায়নের মধ্য দিয়ে শুক্লপক্ষের শারদ-চন্দ্রমার নির্ম্মল জ্যোৎস্নারাশি গৃহ-মধ্যে বিকীর্ণ। মালতী বল্‌ল—"আমার মরণ যে নিশ্চিত, সে কাল রাত্তিরে আমি ভালো করে'ই বুঝেছি।" "কি করে?"—বিস্ময়-জড়িত কণ্ঠে সুবিমল জিজ্ঞেস কর্‌ল। "রাত তখন অনেক—স্বপ্নে দেখ্‌তে পেলাম—মা আমার শিয়রে বসে' মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। মা বলে' ডাক্‌তেই ঘুম ভাঙল। বাবাকে বলি নি। তিনি অস্থির হয়ে পড়বেন। মনটা তাঁর কত নরম—মেয়েমানুষের মতন। দাদা আর আমার দিকে চেয়ে মায়ের স্মৃতিটুকু বুকে করে' দিনগুলো কেমন করে' কাটিয়ে দিলেন। পুরুষের মধ্যে বাবার মতন চরিত্রের লোক খুব কম মিলে। না, কি বলেন?" "তিনি ত দেব-চরিত্র। তাঁর—।" সুবিমলের কথা শেষ না হতেই মালতী আবার বল্‌তে লাগ্‌ল—"আপনি ত মাকে দেখেন নি। তিনি ছিলেন দেবী। মা বেঁচে থাক্‌লে আপনাকে আজ কত স্নেহ—।" বল্‌তেই ভাবাবেগে

মালতীর কণ্ঠস্বর জড়িয়ে গেল। সুবিমল তা অনুভব কর্‌তে পেরে বল্‌ল—"মায়ের কথা আমি শুনেছি। তিনি সত্যি দেবী ছিলেন।" মালতী আবার বল্‌তে লাগ্‌ল—"সাত বছর আগে আশ্বিনের এম্‌নি এক সন্ধ্যায় মা আমার—।" উদ্বেলিত শোকাবেগে মালতীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ। মাতৃ-শোকাতুরা মালতীর শীর্ণ কপোল দিয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মালতী ডাক্‌তে লাগ্‌ল—মা! মা! মা! সুবিমল ব্যথিত, ব্যাকুল। মালতীর মাথা কখন যে বালিশের ওপর থেকে সরে' পড়েছে তা' সে দেখ্‌তে পায় নি। সেদিকে চোখ পড়তেই সুবিমল দুই হাতে খুব আস্তে মালতীর মাথাটি বালিশের ওপর তুলে' দিল; আর, নিজের গায়ের চাদরের কোণে অশ্রু-প্লাবিত চোখ-মুখ মুছিয়ে' দিতে দিতে বল্‌ল—"এ দুর্ব্বল শরীরে শোকের কথা ভাব্‌তে নেই।"

এতক্ষণে সুবিমল ধর্‌তে পার্‌ল যে, মালতীর শরীরের উত্তাপ বাড়্‌ছে। পরীক্ষা করে' দেখ্‌ল জ্বর এক শ' তিন ডিগ্রিতে। সুবিমলের মুখ বিষণ্ণ। নিরাশার কালো ছায়াটি তার চোখে-মুখে সুস্পষ্ট দেখে' মালতী মৃদু-স্বরে বল্‌ল—"আমি ত বলে দিয়েছি, আমায় বাঁচাতে পারবেন না।" মালতীর হতাশ কণ্ঠের ঐ কাতর উক্তিতে সুবিমলের হৃদয় ব্যথিত। উচ্ছ্বসিত দীর্ঘ-নিশ্বাসটি অতি কষ্টে চেপে রেখে' সুবিমল শান্ত কণ্ঠে বল্‌ল—"এখন চুপ করে' না থাক্‌লে অসুখ বাড়্‌বে।"

"এতদিন রোগে ভুগে' আমি বেশ বুঝ্‌তে পারি, এবার চেতনা হারালে আর তা ফিরে আস্‌বে না। আরো কয়টি কথা—।" মালতীর মুখের কথা শেষ না হতেই সুবিমল ব্যস্ত হয়ে পায়ের তলা থেকে লেপ টেনে নিয়ে মালতীর গা ঢেকে দিল। শিয়রের ধারে এগিয়ে বসে' মালতীর মাথায় পাখা দিয়ে বাতাস কর্‌তে লাগ্‌ল। মালতী আবার বল্‌তে সুরু কর্‌ল—"আমার কথা কয়টি শুন্‌তে হবে আপনাকে। পাখা রেখে দিন ত। মাথায় বাতাস লাগ্‌বে না। কষ্ট ত অনেক করলেন। আর কেন?" একটু থেমে' শ্রান্ত কণ্ঠে বল্‌ল—"উঠুন ত। টেবিলের ডান-দিকের দেরাজে একছড়া চাবি রয়েছে। নিয়ে আসুন দেখি।" সুবিমল উঠে' গিয়ে চাবি নিয়ে এলে মালতী দেওয়ালের পাশে একটা সেগুন কাঠের আলমারী দেখিয়ে বল্‌ল—"ওটা খুলে' ওপরের থাকে একটা চন্দন কাঠের ছোট বাক্স পাবেন। নিয়ে আসুন ত।" এই বল্‌তে বল্‌তে মালতীর চোখ দুটি জ্বরের দুঃসহ উত্তাপে ও শারীরিক অবসাদে আপনা-আপনি বুজে এল। সুবিমল বাক্সটি এনে বিছানার ধারে রেখে' দিয়ে শিয়রের পাশে বসে' আবার মাথায় বাতাস কর্‌তে লাগ্‌ল। একটু পরে মালতী চোখ মেলে' জিজ্ঞেস কর্‌ল—"কই, বাক্স কোথা?" সুবিমলের কাছ থেকে জবাব না পেতেই বাক্সটি মালতীর চোখে পড়ল। "খুলুন দেখি বাক্সটা। ওর মধ্যে দুটা শ্বেত-পাথরের বড় কৌটা আছে।" কৌটা দুটি বের কর্‌বার আগেই মালতী প্রশ্ন কর্‌ল—"পান্ নি এখনো?" মালতীর কণ্ঠস্বরে প্রবল উৎকণ্ঠা। "পেয়েছি, এই যে"—বলে' সুবিমল কৌটা দুটি মালতীর কাছে নিলে মালতী তার গায়ের লেপটা সরিয়ে ফেল্‌তে বল্‌ল। লেপখানা সরিয়ে দিলে মালতী কৌটা দুটি নিয়ে দু'হাতে বুকে চেপে ধরে' চক্ষু দুটি মুদ্রিত কর্‌ল। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ এমনি কেটে গেল। সুবিমল তার বিস্ময়-বিমুগ্ধ চোখ দুটি মালতীর মুখপানে নিবদ্ধ করে আছে। মনে হল তার —এ যেন কোন্ তপস্বিনীর তপোদীপ্ত মূরতি! চোখ মেলে' মালতী বল্‌ল—"আমার গেল বছরের জন্ম-দিনের উৎসবের কথা মনে আছে ত আপনার?"

"না থাক্‌বে কেন? আমি যে উপস্থিত ছিলাম তা বোধ হয় মনে নেই?" কথা শুনে' মালতী স্মিতমুখে বল্‌ল —"আপনি হয়ত মনে করেছেন রোগে আমার স্মৃতি-বিভ্রম হয়েছে। তা হয় নি এখনো। আপনি আমায় একটা উপহার-ও দিয়েছিলেন। কেমন, ঠিক বল্‌ছি না?" বলে' মালতী শ্বেতপাথরের কৌটা দুটি সুবিমলের হাতে দিয়ে বল্‌লে—"আমার গত জন্মদিনের উৎসব-রাতে যে দুটি প্রিয় বস্তু আপনার উদ্দেশে সঞ্চিত করে' রেখেছিলাম এতে তা রয়েছে। উৎসবান্তে নিশীথ-রাতে এই ঘরেই আমার এই বিছানাটাতে শুয়ে' চোখের জলে বুক ভাসিয়েছি। অশ্রুজলের উৎসে সেদিনকার উৎসব-রাত ভোর করেছি। সেদিন মনে করি নি আপনাকে ঠিক এখানটাতেই এমন-ভাবে পাব।" এই বল্‌তে বল্‌তে মালতীর ভাবোদ্বেলিত কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হল। একটু পরে শ্রান্ত কণ্ঠে বল্‌ল—"একটা অনুরোধ আমার মরণের আগে কৌটা খুল্‌বেন না। আমায় কথা

দিন—অনুরোধ রাখবেন।" বলে' মালতী উত্তরের প্রতীক্ষায় সুবিমলের পানে চাইলে সুবিমল বল্‌ল—"কথা দিলুম—অনুরোধ রাখব।" সুবিমলের অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠ-স্বরে কি এক অব্যক্ত বেদনার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি।

(আট)

এর-ই দিন সাতেক পরে আশ্বিনের এক সন্ধ্যায় মালতীর জীবন-প্রদীপটী নিভে গেল। লোকনাথ বাবু শোকে অধীর। মালতীর পুষ্পাচ্ছাদিত শবদেহ শ্মশানে। লোকনাথ বাবু সকলের শ্রদ্ধাভাজন। তাঁর এই শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন কর্‌বার জন্যে সহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, গুণগ্রাহী, উপকৃত—ছোট বড় বহুলোক শ্মশানে সম্মিলিত হয়েছে।

মালতীর মৃত্যুকালে সুবিমল তার পাশেই বসে' ছিল। দেহ-মন তার অবসন্ন, মুখ মলিন। বাড়ী ফিরে' এসে নিজের হাতের সাজানো বাগান থেকে ফুল তুলে অতি যত্নে একছড়া মালা গাঁথ্‌ল। নিজহাতে-গাঁথা সে মালাটি তার শোকাশ্রুজলে অভিষিক্ত। সে যত্ন-রচিত, অশ্রু-পূত, মালাটি নিয়ে সুবিমল পাগলের মতন শ্মশানে ছুটে গেল। চিতা সজ্জিত। মালতীর পুষ্পাচ্ছাদিত শবদেহের পার্শ্বে মালা হাতে সুবিমল শোক-ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে। সে নিঃশব্দে থুক্‌করে কিছুক্ষণ ঊর্দ্ধে তাকিয়ে রইল। তার পর প্রাণহীনা মালতীর নিশ্চল মুখের পানে সুবিমল তার শেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে' গলায় মালাখানি পরিয়ে দিয়ে বিপুল জনতার মধ্য দিয়ে চলে গেল।

(নয়)

সুবিমল শোকে অভিভূত। সে-রাত্রে বাড়ী ফিরে' তার আর নিদ্রা হল না। শোকে তার সান্ত্বনা—মালতীর শেষ দান। নিশীথ-রাতে সুবিমল তার নির্জ্জন কুটীরে বসে' কৌটা খুলে দেখ্‌তে পেল—একটিতে তারই দেওয়া জন্মদিনের সামান্য উপহারটি ফুল দিয়ে সাজানো। ফুল-গুলি শুক্‌নো, পাপ্‌ড়ি-ঝরা। আর একটিতে ছোট্ট একছড়া শুষ্ক পুষ্পমাল্য দিয়ে সাজানো একখানা চিঠি। মুগ্ধ-বিস্ময়ে সুবিমল দেখ্‌তে পেল—মালতীর সে লিপিখানি রক্তে লেখা। রক্তাক্ষরে লিখিত ছিল এই কয়টি কথা—

দেবতা আমার! জন্মদিনের উৎসবে এই দেহ-মন তোমার উদ্দেশে নিবেদিত হল।

দেবতার পূজার ফুল—
মালতী

অশ্রু সজল চোখে সুবিমল লিপিখানি পাঠ কর্‌ল। একবার, দুইবার, তিনবার। আর পড়া হল না। স্বতঃ-উৎসারিত অশ্রুধারার অবিরাম প্রবাহে লিপিকা সিক্ত। সে নৈশ নিস্তব্ধতার মাঝে, লোক-চক্ষুর অন্তরালে মিশে' গেল—মালতীর নিষ্কলঙ্ক বুকের অনবদ্য রক্তবিন্দু সুবিমলের অনাবিল অশ্রুনীরে।

জীবন-সঙ্গিনী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ

জীবনের সাথী দিবা আর রাতি
কতই ছলনা জানে!
একই পথে যায় তবু দুজনায়
দুই হাত ধরে' টানে;—
আলোয় আঁধারে রৌদ্রছায়ায়
রূপে ও অরূপে কায়ায় মায়ায়
ঘরে ও বাহিরে জানা-অজানায়
দুদিকের সন্ধানে।
একজন এসে বাঁধে যে বাঁধন
আরজন দেয় খুলি',
দিবস আসিয়া যে বুলি শিখায়
রজনীতে তাই ভুলি!

নিত্য উষায় নির্ম্মল বায়
নির্জ্জন মন্দিরে
আলোক-পরশে যত বাতায়ন
খুলে' যায় ধীরে ধীরে ;
জেগে উঠে ধরা কর্ম্মের যাগে,
কলকোলাহল কানে এসে লাগে ;
বন্দী এ হিয়া সেই সন্ধিতে
বন্ধন তার ছিঁড়ে।
নূতন নেশায় মেতে উঠে মন
দিগ্বিজয়ের টানে,
বাহিরের বানে ঘরের ঠিকানা
ভেসে যায় কোন্‌খানে !

হাটে-মাঠে-ঘাটে ছুটে' ছুটে' যবে
ক্লান্তিতে ভরে কায়,
বাসনার সোণা গলে' ঝরে' পড়ে
সন্ধ্যার সোহাগায়,
গৃহমন্দিরে বেজে ওঠে শাঁক—
শ্রান্তি-ভুলানো শান্তির ডাক,
মর্ম্মপুরীর গোপন কক্ষে
কর্ম্মের কিনারায়।
অনেকের সাথে হট্টগোলের
পুঞ্জিত অবসাদ
একের মাঝারে বিরাম মাগিয়া
লভে চিত্তের স্বাদ।

একবার করে' চোখ বোঁজা আর
একবার চোখ মেলা—
আঁখিপাতা সাথে আঁখির চুক্তি
আলো আঁধারের খেলা !
একজন বলে—বাহিরিয়া আয়,
জলে-ভরা চোখে আরজন চায়—
এমনি করিয়া দোমনার মাঝে
কাটে জীবনের বেলা !
দিনের আলোকে বাহিরের চোখে
একবার ফুটে গতি,
রাতের আঁধারে অন্তর-পারে
আরবার তারি যতি !

দিনে আর রাতে, রাতে আর দিনে
এমনি দোটানা টানে
জীবনের গতি শেষ হয় যবে
পথেরি মধ্যখানে—
চমকিয়া থামে সেথায় যাত্রী,
ঘনাইয়া আসে গহন রাত্রি—
কাজল-তিমিরে হারায় যে দিশা
প্রভাতের পথপানে !
ফিরে দুই সখী উদাসচক্ষে
বিধাতার বাঁধা পথে,
নূতন পথিকে টানিয়া আবার
নবজীবনের রথে !

ইহজীবনের কৌতুকময়ী
হে যুগল সঙ্গিনী,
যেমন সঙ্গ তেমনি রঙ্গ—
চিনি তোমাদের চিনি !
জানা-অজানার মোহন মেলায়
হিয়াহীন এই লীলার খেলায়
তোমরা কেবলই দাও করতালি
বাজাইয়া কিঙ্কিনী !
মহাকাল-নাটে যে নাচ চলিছে,
তারি সাথে তাল রাখি'
মানবেরে লয়ে চালাও মর্ত্তে
জীবন-লীলার ফাঁকি !

রুদ্ধ স্রোত

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু বি-এ

বড়দিনের ছুটি। শীতের দুপুরবেলায় যে যাহার ঘরে লেপ-মুড়ি দিয়া শুইয়া দিবানিদ্রা উপভোগ করিতেছিল, বিপিনবাবুর কণ্ঠ শোনা গেল,—চল, আজ সব সার্কাস যেতে হবে !

বিদ্যুৎবেগে কথাটা বাড়ীময় প্রচার হইয়া গেল—জ্যেঠামশাই বলেছেন সার্কাস যেতে হবে। একপাল ছেলে উঠিয়া মোজা পরিতে আরম্ভ করিল, মেয়েরা চুল খুলিয়া দিয়া চিরুণী খুঁজিতে বসিল—আজ সার্কাস !

মাঝে মাঝে জ্যেঠামশায়ের গম্ভীর কণ্ঠ শোনা যাইতে লাগিল, শীগ্‌গির নাও, শীগ্‌গির নাও।

তাঁর নিজের মোটর ও আর একখানা ট্যাক্সী আসিয়া হাজির হইল,—দুইখানা গাড়ী বোঝাই করিয়া ভাইপো ভাইঝিদের লইয়া বিপিনবাবু চলিলেন সার্কাসে।

এমনি নিত্য। বড় অপিসে তিনি বড় চাকরী করিতেন। আপন ও খুড়তুতো ভাইবোনদের মধ্যে তিনিই সকলের বড়; তাই মা-ষষ্ঠীর কৃপাদৃষ্টিপূর্ণ বাড়ীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া ভাইপো-ভাইঝির ছোটখাট একটি দল লইয়া বিপিনবাবুকে প্রায়ই ব্যস্ত দেখা যাইত।

আজ মেমোরিয়াল, কাল চিড়িয়াখানা, পরশু বোটানিক্‌স্, তরশু বায়স্কোপ—এ লাগিয়াই আছে।

তা ছাড়া তাহাদের চোর-ধরায়, তাহাদের কলহে, তাহাদের ঘুড়ী ওড়ানোয়, তাহাদের পুতুল খেলায় তিনি নিত্য উপস্থিত থাকিতেন।

উমার মেয়ের সঙ্গে ডাক্তারবাবুর মেয়ে রাণীর ছেলের বিবাহ যখন স্থির, তখন মুস্কিল হইল—জ্যেঠামশাই কলিকাতায় থাকিবেন না, অপিসের কাজে আসানসোল যাইবেন। উমা ত মাথায় হাত দিয়া বসিল,—সুবিধা প্রেসের পকেট-পঞ্জিকা হইতে পুত্তলিকা-পরিণয়ের বিশেষ শুভদিন স্থির হইয়াছে,—এমন দিনে জ্যেঠামশাই না থাকিলে ত সব মাটি।

জ্যেঠামশাই বলিলেন, ভয় কি রে বেটি, আমি ১০০৲ টাকা দিয়ে যাচ্ছি—এইতেই কোনোরকম করে সেরে নিস্। আমি এসে আরো কিছু দোব, কাজ আট্‌কাবে কেন ?

টাকার দিক দিয়া যে কাজ আট্‌কাবে না, এ বিশ্বাস উমারও ছিল। কিন্তু জ্যেঠামশাই না উপস্থিত থাকিলে দেখাশোনা করে কে,—পুতুলের বিয়ে হইলেও ঝক্কি ত কম নয় ?

জ্যেঠামশাই বলিয়া গেলেন, তিনি বিবাহের তিথিতে সকালবেলা কলিকাতা পৌঁছিবেন,—করিলেনও তাহাই। অপিসে দরখাস্ত দিয়াছিলেন—তাঁহার ভাইঝির কন্যার বিবাহ। কন্যাটি সজীব কি নির্জ্জীব অবশ্য তার কোনো উল্লেখ ছিল না !

রীতিমত প্রোসেশন করিয়া বিবাহ ত হইয়া গেল। সারা বছরের তত্ত্বতাবাস—সেই কি কম হাঙ্গাম। ফরমাস দিয়া ছোট্ট ছোট্ট দই ও ক্ষীরের হাঁড়ী ও তার অনুরূপ বাঁক ; ছোট ছোট থালায় ঠিক সত্যকারের মত সন্দেশ ক্ষীরমোহন লেডিকেনী চন্দ্রপুলি তৈয়ারী প্রভৃতি ; ছোট পুঁটি মাছকে ইলিস মাছ বলিয়া চালানো ও কপির সময় ছোট কপির ফুল ও আমের সময় কচি আমের বোল ছোট ঝুড়ি করিয়া ভরিয়া দেওয়া শুধু পয়সা ফেলিলেই হয় না, রীতিমত পরিশ্রম করিয়া যোগাড় করিতে হয়, ইহা কাহার না জানা আছে ? জ্যেঠামশাই সব করিতেন।

পূজার সময় সব ভাইপো-ভাইঝিকে ডাকিয়া গায়ের মাপ নেওয়াইয়া এক দামের এক ধরণের কাপড় জামা সকলের জন্য আনিতেন ; কিন্তু পূজার উপহারে নিজের দুটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে বাড়ীর অন্য ছেলেদের একটু তফাৎ করিতেন। ভানু হয় ত বলিল, আমার ক্যামেরা চাই জ্যেঠামশাই। তাকে বলিলেন, আচ্ছা, তোমাকে এক ১০৲ টাকা দামের ক্যামেরা কিনে দোব, তাতে হবে ত ? মাণিক হয় ত বলিল, আমার টেরাই সাইকেল চাই। তাকে বলিলেন, যদি পুরোন একটা কিনে নতুনের মতন করে দিই তাতে আপত্তি আছে ? মীনা হয় ত বলিল, আমার হার্ম্মানি

চাই। বলিলেন—বেশ, ছোট একটা হার্ম্মোনি তোমার আসবে! কিন্তু নিজের ছেলে সতু অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে যখন বলিয়া বসিল, আমার একটা দোয়াতদানী দরকার বাবা, তখন তাহাতেও ব্যয়সঙ্কোচ করিলেন, বলিলেন, দোয়াতদানীতে দুটো দোয়াত থাকে—তোমার দুটো কি দরকার? তুমি ত লাল কালীতে লেখো না, তোমায় একটা দোয়াত দোব, কি বল? আর নিজের মেয়ে হাসি যখন বলিল, আমার একটা রংএর বাক্স চাই, তখন বলিলেন তুমি ত আঁকতে শেখো নি এখনো,—তোমার রংএর বাক্স কি হবে? তোমায় একটা লাল-নীল পেন্সিল কিনে দোব।

মোট কথা স্কুলের বেতন, মাষ্টারের মাহিনা, জুতা জামা কাপড় হইতে খাই-খরচের প্রায় সমস্ত ভার বিপিনবাবু নিজের স্কন্ধে লইয়াছিলেন। ভাইয়েরা অল্প-স্বল্প যা মাহিনা পাইত, দাদার হাতে ফেলিয়া দিত, তাহা হইতে তিনি ইলেক্‌ট্রিকের খরচ, বাড়ীর ট্যাক্স টেলিফোন ইত্যাদি মিটাইতেন।

রাজার হালে তিনি সকলকে রাখিয়াছিলেন; কিন্তু কাহাকেও বুঝিতে দিতেন না—বাড়ীর বড় হইয়া তিনি কতটা করিতেছেন। নিজে ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়া, নিজে অভুক্ত থাকিয়া তিনি কোলাহলমুখর বাড়ীখানিকে নিত্য আনন্দময় করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেন।

কিন্তু এ চেষ্টায় বাধা পাইল। তাঁর স্ত্রী শরৎশশী সাতে-পাঁচে থাকিতেন না, কিন্তু তিনি আশা করিতেন অন্য জায়েরা তাঁকে মান্য করিয়া চলুক; যেহেতু তাঁহার স্বামী সকলকে এতটা করিতেছেন। প্রথম প্রথম মান্য পাইয়াও ছিলেন; কিন্তু এ কথা যখন সকলের কাছে পরিষ্কার হইয়া আসিল—শরৎশশীকে খুসি রাখার উপর বিপিনবাবুর দেওয়া নির্ভর করে না, তা ছাড়া যতই কম হোক্ অন্য বাবুরাও সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিতেছেন এই পরিবারের সংসার-যাত্রায়, কেহ অমনি খাইতেছেন না,—তখন তটস্থ ভাবটা ক্রমশঃই শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল এবং অবশেষে প্রায় রহিলই না।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শরৎশশীর মনেও ক্রমে এ ধারণা ঢুকিতে লাগিল যে, ন দেবায় ন ধর্ম্মায় তাঁর স্বামী যে খরচ করিতেছেন, তা সঞ্চিত হইলে তাঁহারই ছেলেমেয়ের থাকিবে। রাত্রের কলগুঞ্জন সুরু হইল ও দিনে দিনে দীর্ঘরাত্রিব্যাপী হইতে লাগিল।

বিপিনবাবু থামাইবার অনেক চেষ্টা করিয়া অবশেষে হাল ছাড়িয়া দিলেন। রাত ভোর হইয়া আসে গুন্ গুন্ গুন্ গুজ্ শব্দে রহিয়া রহিয়া চলে—ন-বৌ কি বলিয়াছে, মেজ-বৌ কি করিয়াছে, বিনে কি মনে করে, ক্যাবলার আব্দার কতদূর অসহ্য হইয়াছে!

দিনের পর দিন বিনা প্রতিবাদে শুনিতে শুনিতে বিপিনবাবুর আর বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট রহিল না যে, ভাইগুলা তাঁর স্বার্থপর—তাঁর মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া নিজেদের কাজ গুছাইয়া লইতেছে; ভ্রাতৃবধূরা অকৃতজ্ঞ, ভাইপো-ভাইঝিরা গোঁয়ারগোবিন্দ;—সব কটাই তাঁর ছেলে এবং মেয়ের হিংসা করে।

পত্নীর কৃপায় দিব্যদৃষ্টি লাভ হইল, তাঁর সঙ্গে বিনা পরামর্শে তিনি অতঃপর কোন কাজ করিতেন না এবং হঠাৎ একদিন তাঁরই প্ররোচনায় বাড়ী ভাগের কথা তুলিয়া বসিলেন।

জমি তৈয়ারীই ছিল, অন্য ভায়েরাও তাহাদের গৃহিণীর মুখে শুনিয়াছিল তাহাদের বড়-ঠাকুর বড়-দি আসলে কত বড় শয়তান। সকলেরই মুখে অস্ফুট আর্ত্তনাদ শুনা যাইতেছিল—আর ত পারা যায় না; কিন্তু কেন যে পারা যায় না, সে সম্বন্ধে খোঁজ করিলে হয় ত কয়েকজনের চক্রান্তই শুধু বাহির হইয়া পড়িত!

যাই হোক পার্টিশন হইতে এতটুকু দেরী হইল না। সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভালো, এই নীতি মানিয়া লইয়া ভায়েরা নিজেদের দুঃখের দুমুঠার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাদার অংশ বুঝাইয়া দিল। দাদা আলাদা হইয়া গেলেন এবং উঠানের মাঝামাঝি একটা পাঁচীল তুলিয়া সু-উচ্চ অট্টালিকা বানাইয়া ফেলিলেন।

ওধারে প্রাসাদ গড়িয়া উঠিল, এধারের বিদ্যুৎ আলো নিভিয়া গিয়া প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল, বালির চাপড়া খসিয়া পড়িল, টেলিফোন সরিয়া গেল,—পাড়ার মধ্যে যে বাড়ীখানি সবচেয়ে সমৃদ্ধ ছিল, তারই ভিতরের কঙ্কাল বাহির হইয়া গিয়া খোলার বাড়ীর অধম হইয়া পড়িল।

কিন্তু সবচেয়ে অস্বস্তি হইতে লাগিল বিপিনবাবুর—ভাইপোগুলা কেউ একবার উঁকি মারে না। হতভাগারা কেন আলাদা কেউ সংসারে কি হয় না? বরঞ্চ একান্নবর্ত্তী পরিবার কমই আছে—সকলেই ত পৃথক!

এমন কি ঘটিয়াছে, যার জন্য ভাইপো ব্যাটারা এ বাড়ী ছাড়াইবে না?

একদিন থাকিতে না পারিয়া তিনি সকলকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন—তোরা আস্‌বি। তখন সকলেই একে একে আসিয়া জ্যেঠার ঘরের অদৃষ্টপূর্ব্ব শোভা ও গৃহসজ্জার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে লাগিল। আসিল না শুধু ক্যাবলা যাকে বিপিনবাবু সকলের চেয়ে ভালবাসিতেন। সে না কি বলিয়াছে, জ্যেঠামশায়ের বাড়ী যা, গভর্ণরের বাড়ীও তা, আমার ত কোনো অধিকার নেই!

হাসির বিবাহ আসিয়া পড়িল। তিনি সকলকে সাধারণ ভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন—জনে জনে বিশেষ করিয়া বলেন নাই। ক্যাবলা আসিল না,—বলিয়া পাঠাইল, জ্যেঠা কি আমাকে বলেছে? বিপিনবাবু ভাবিলেন, থাক্, নাই আসিল! ক্যাবলা আসিল না বলিয়া তার মাও আসিল না, বাপও আসিল না। শরৎশশী বলিলেন, ওদের হিংসেটা সকলের চেয়ে বেশী। কিন্তু বিপিনবাবুর মনে হইল—হিংসা নয়, অভিমানটাই হয় ত সকলের চেয়ে বেশী। গৃহিণীর ভয়ে তাহাদের ডাকিতে যাইতে পারিলেন না।

নীল আকাশে সাদা মেঘের রাশ দেখিয়া বিপিনবাবুর মনে পড়িল পূজা আসিতেছে। এমন দিনে তিনি কি ভাইপো-ভাইঝিদের কিছুই করিতে পারিবেন না! করিবার সাধ্য কি?

সপ্তমীর দিন দেখিলেন পুরানো বাড়ীর সামনে একখানা থার্ডক্লাশ গাড়ী অনেকক্ষণ হইতে দাঁড়াইয়া আছে। চাকরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন বৌ-মারা নাকি সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব দেখিতে যাইবেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর গাড়োয়ান চেঁচামেচি সুরু করিল। ভানু বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, না যাস্ চলে যা—আমাদের মোটর গাড়ী ঐ দেখ দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়োয়ান সংসারানভিজ্ঞ নয়। সে বলিল, ও-বাড়ীতে মোটর গাড়ী আছে তা তোমাদের কি? মোটর থাকলে কি আর আমাকে বোলাতে?

উপরের বারান্দা হইতে এ কথা শুনিয়া বিপিনবাবুর আর ধৈর্য্য রহিল না। তিনি থাকিতে থার্ডক্লাস গাড়ী কখনো বাড়ীর সামনে দাঁড়াইতে দেন নাই,—আজ তাঁহারই সামনে তাঁহারই ভাইপো একটা ছোটলোকের কথা সহিয়া চুপ করিয়া থাকিতে বাধ্য হইবে, আর তিনি দাঁড়াইয়া দেখিবেন?

তখনই হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, রামসিং, গাড়ীটা ভাগায় দেও। হামারা মোটর হুঁয়া পর রাক্ষো, মায়ী লোক যাঁহা যায় লে যাও!

'বড়াবাবু'র চেঁচামেচির চোটে গাড়ী পলাইল এবং ভানু বীরদর্পে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

কালীপূজার দিন নিজের বাড়ী তিনি সাজাইতে দিলেন না; কারণ পাশের বাড়ীতে আলো নাই! প্রদীপ আসিয়াও পড়িয়া রহিল। ছাতে উঠিয়া দেখিলেন শীতের কন্‌কনে সন্ধ্যায় ছোট ছোট ভাইপো-ভাইঝিরা আকাশের দিকে লোলুপনেত্রে চাহিয়া বাজীর খেলা দেখিতেছে। একটিমাত্র ফুলঝুরি জ্বালিয়া তিনজনে পালা করিয়া হাতে লইয়া ঘুরাইয়া বাজী পোড়ানর সখ মিটাইতেছে।

তখনি দোকান হইতে প্রকাণ্ড একঝুড়ি ভর্ত্তি বাজী কিনিয়া একটা মুটের হাতে দিয়া বলিয়া দিলেন—ঐ বাড়ীতে দিয়ে আয়; বলবি বাদুড়বাগানের হরিশবাবু দিয়েছে। মুটে দিয়া আসিয়া পয়সা লইয়া চলিয়া গেল। বিপিনবাবু প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন—এখনি পট্‌কার চট্‌পটি, আর রংমশাল, লাল নীল দেশলাইয়ের আলো পাশের বাড়ীতে ফুটিয়া উঠিবে; তার পরে তাঁর ছেলেমেয়েরা বাজী পুড়াইবে; কিন্তু কই, কোনই সাড়াশব্দ নাই। তিনি ত জানিতেন না যে, অদৃশ্য হরিশবাবুর হঠাৎ এই বদান্যতা দেখিয়া বধূরা বাবুরা না আসা পর্য্যন্ত নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেছে না এবং বাবুরা যখন ফিরিল তখনও কাহার ভুল হইয়া থাকিবে মনে করা ছাড়া কিছু স্থির হইল না। সুতরাং লোভকাতর ছেলে-মেয়েদের দুর্লভ বস্তুগুলিতে হাত দেওয়া আর ঘটিয়া উঠিল না।

ফুলকপি ত গলা দিয়া নামিতে চাহে না। দু-একটা পাশের বাড়ী পাঠাইয়া দিলে হয়; কিন্তু দু'একটায় অতবড় বাড়ীর কি হইবে? বেশী দিলে লইবে কি? যে তেজ! গৃহিণীরও খরদৃষ্টি সবদিকে! অবশেষে একদিন যা থাকে কপালে বলিয়া বাজার হইতে প্রকাণ্ড একঝোড়া কপি কিনিয়া বন্ধু জগদীশের বাড়ী হাজির হইলেন। তার চাকরকে বলিয়া দিলেন—এটা আমার ভাইয়েদের বাড়ী দিয়ে আয়; বলবি, নিবারণ বাবু শ্যামবাবুকে হোমিওপ্যাথি দিয়ে আরাম করেছিলেন, তাই তিনি দিলেন। সে বড়বাবুর এই অকারণ মিথ্যা কথার তাৎপর্য্য না বুঝিয়া যেমন বলা হইল তেমনি করিল।

নিবারণ কথাটা কিন্তু বুঝিল না। শ্যামবাবু বলিয়া কেহ ত তার ঔষধ লন নাই ; বরঞ্চ যদুবাবু একজন আছেন। যাই হোক সাত পাঁচ ভাবিয়া তারা গ্রহণ করিল। বিদায় দিবার সময় দেখা গেল লোক পলাইয়াছে।

দিনকতক বাদে আবার যখন একটি লোক কমলালেবুর ঝাঁকা লইয়া হাজির হইল এবং বলিল শ্যামবাবু দিয়াছেন, তখন নিবারণেরও বিশ্বাস করা শক্ত হইল। সে বলিল বোধ হয় দাদার কাজ! তার স্ত্রী বলিল, দাদার ওপর যা বিশ্বাস তোমার,—বয়ে গেছে তাঁর দিতে। একবার ডেকে খোঁজ করেন? লোকটিকে যাইতে বলিয়া নিবারণ তার পিছু লইল। দেখিল বড় রাস্তায় গিয়া একটা গ্যাসের নীচে তার বড়দাকে লোকটা কি বলিল এবং তিনি একটি টাকা তার হাতে দিলেন।

নিবারণ রুক্ষকণ্ঠে গিয়া বলিল—এ তোমার কি কাণ্ড বড়দা, আমরা কি খেতে পাইনে?

বড়দা হঠাৎ চমকাইয়া উঠিয়া পরে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—তোদের ত দিই নি, আমার ভাইপোদের দিয়েছি। চোখের জল ঝরিয়া পড়িবার আগে তিনি সরিয়া পড়িলেন।

খবর পাওয়া গেল—ক্যাবলা ফেল করিয়াছে। বুকটা তাঁর ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। মাষ্টার রাখবে না তার কি হবে! মাস্তর অমন ভাল সম্বন্ধ টাকার জন্য ভাঙিয়া গেল—তার জন্যও আপশোষ হয়! কিন্তু কিই বা করিবেন তিনি, কেউ কি তাঁর পরামর্শ লয়?

গভীর রাত্রে ছাতে উঠিয়া পুরোনো ভাঙা বাড়ীটার দিকে চাহিয়া তিনি ভাবিতে থাকেন—তাঁরই বংশধরেরা দুঃখে, দারিদ্র্যে, কুশিক্ষায়, অস্বাস্থ্যে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে! একি তাঁর গৌরবের? তাঁর পরিচয়েই না সমাজে তারা চলাফেরা করে?

উঠানের সামনে ঐ দালানটায় বসিয়া কত দীর্ঘকাল ধরিয়া দিনের অন্ন তিনি মুখে তুলিয়াছেন ; একই জানালার সামনে শয্যায় শুইয়া কত দীর্ঘরাত্রি তাঁর কাটিয়াছে ; সেই বহু পরিচিত গৃহতল ছাড়িয়া পিতৃপিতামহের স্মৃতি-পূত সংসার পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন প্রাসাদে সম্পূর্ণ নূতন জীবন যে তিনি যাপন করিতে আসিয়াছেন, সকল মায়া সকল মমতা বিসর্জ্জন দিয়া—এ কি খুব পরিতৃপ্তির?

মোটেই নয়। তিনি ঐ সংসারে ফিরিয়া যাইতে চাহেন, ঐ পরিবারে হাসি ফুটাইতে চাহেন।

সকালে উঠিয়া ভায়েদের ডাকিয়া তিনি প্রস্তাব করেন—যা হইবার হইয়া গেছে,—এসো, আবার এক হওয়া যাক্। ভায়েরা প্রতিবাদ করে, বলে—সে হয় না। একবার ভাঙ্‌লে আর কি যোড়া লাগে?

সকলের চেয়ে তেজ বেশী যার, সেই ক্যাবলার কয়দিন হইল অসুখ করিয়াছে।

বিপিনবাবু একবার ভাবিলেন দেখিয়া আসি। গৃহিণী বলিলেন, কি অসুখ জানা নেই—টাইফয়েড হতে পারে। তোমার ছেলেপুলের ঘর—তুমি বাইরে থেকে খোঁজ নাও না।

চোখ দুটা একবার রাগে জ্বলিয়া উঠিয়া আবার ম্লান হইয়া আসিল। গৃহিণীই তাঁহাকে নষ্ট করিয়াছেন।

সকলের চেয়ে কুৎসিত এবং সকলের চেয়ে নির্ব্বোধ বলিয়া ক্যাবলার প্রতি তাঁর বিশেষ মমতা ছেলেবেলা হইতেই। অথচ সেই তাঁকে সকলের চেয়ে বেশী আঘাত দিয়াছে।

চিররুগ্ন ঐ ছেলেটা অভিমান করিয়াই সারা জন্ম কাটাইল। করিবেই বা না কেন, এই যে এ বাড়ীতে সে একেবারে আসে না,—তিনি কয়বার ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন? অথচ একদিন ক্যাবলাকে সঙ্গে না লইলে তাঁর কোথাও নিমন্ত্রণ অবধি যাওয়া চলিত না,—কে জানে সামাজিক উৎসব, কে জানে অপিসের টি-পার্টি!

তবু এমনি তাঁর পরিবর্ত্তন হইয়াছে—কাজে-কর্ম্মে অসুখের কথাটা ভুলিতে পারিলেন। অনেক দিন কোন খবর না লইয়া এবং না পাইয়া তিনি মনে করিলেন ক্যাবলার অসুখ ভালো হইয়া গেছে।

হঠাৎ একদিন শুনিলেন খুব বাড়াবাড়ি। সেদিন তাড়াতাড়ি কিছু আঙুর নাসপাতি আপেল কিনিয়া একেবারে ওপরে গিয়া উঠিলেন, ক্যাবলা দরজার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া শুইয়াছিল, জ্যেঠাকে দেখিয়া দেওয়ালের দিকে ফিরিয়া শুইল।

বিপিনবাবু সস্নেহে ডাকিলেন, ক্যাবলাবাবুর রাগ হয়েছে! ফেরো, দেখো কি এনেছি।

ক্যাবলা কাৎ হইয়া ফিরিয়া তাঁর হাত হইতে আঙুরের

থোকাটা লইয়া মাথার দিকের জানালা গলাইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, এক মাস পরে দেখতে এলেন!

পিসি-মা ধমকাইলেন—ও কি,জ্যেঠার সঙ্গে ও-রকম করে?

রুক্ষকণ্ঠে ক্যাবলা জবাব দিল—জ্যেঠা! জ্যেঠা এতদিন খোঁজ নিয়েছিলেন কেমন আছি? নিজের ছেলে হলে পারতেন?

কথাগুলি তীরের মতন গিয়া বুকে বিঁধিল। অপরাধীর মতন বিপিনবাবু উঠিলেন,—শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিয়া গেলেন, পাগলা রেগে গেছে! কিন্তু তাঁর মন বার বার বলিতে লাগিল সে অন্যায় কিছু বলে নাই।

তার পরদিনই অবস্থা খুব বাড়াবাড়ি হইল, লোকজনে বাড়ী ছাইয়া গেল। বিপিনবাবুর জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না অবস্থা কি রকম।

সমস্ত দিন ধরিয়া কোথায় যেন একটা অস্ফুট ক্রন্দন, যেন একটা চাপা আর্ত্তনাদ, যেন একটা আচম্‌কা হাহাকার তাঁর কাণে আসিতে লাগিল।

বিষণ্ণ মলিন মুখে পাশের বাড়ীর লোকেরা বাহিরে যাওয়া-আসা করিতেছে—তাহাদের চুপ্ চুপ্ চরণ-ধ্বনি বিপিনবাবুর অসহ্য বোধ হইতেছে।

সন্ধ্যার সময় তিনতলার সিঁড়ির জানলার কাছে গিয়া তিনি চোরের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন—সেখান হইতে পুরানো বাড়ীটার অন্দরের অনেকটা দেখা যায় এবং সামনেই ছাদ পড়ে। দেখিলেন স্তিমিত অন্ধকারে পাঁচিলের কাছে বসিয়া ছিন্ন মলিন কাপড় মুখে গুঁজিয়া রেণি কাঁদিতেছে ফুলিয়া ফুলিয়া ;—তাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কেমন রে!

রেণি চীৎকার করিয়া বলিল, ও জ্যেঠামশাই গো, দাদা আর বাঁচবে না। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে আর বলছে, জেঠামশাই আমাকে দেখলে মর্‌তুম না!

জ্যেঠামশাই হো হো করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—আমি জ্যেঠা, আমি জ্যেঠা, আমি জ্যেঠা,—আমার ভাইপো, আমারি ভাইপো যায়, আর আমি জ্যেঠা এখানে বসে—

কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি নীচে নামিয়া টেলিফোনের হাতল তুলিয়া ধরিলেন ; তাঁর ডাক্তার বন্ধু রজতবাবুকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন—৬৪-র ৩২-র যে কয়জন চিকিৎসক কলিকাতায় আছেন তাঁর বাড়ী হাজির করিতে।

চিকিৎসার গুণেই হোক, পরমায়ু ছিল বলিয়াই হোক সে 'টাল'টা কাটিয়া গেল।

প্রভাতের স্নিগ্ধ রৌদ্র বারান্দার কোলে আসিয়া পড়িয়াছে ; প্রাতঃসূর্য্যকে প্রণাম করিয়া ভায়েদের উদ্দেশে বিপিনবাবু বলিলেন—ওরে আজ মিস্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়েছি—সে মজুর নিয়ে এসে এখনি উঠুনের মাঝখানের এই পাঁচিলটা ভেঙে ফেলবে—এ আমার বুকে পাষাণের মতন চেপে বসে আছে—

নিবারণ আপত্তি করিল, কিন্তু দাদা, আমরা না হয় এক হলুম, আমাদের ছেলেরা কি পারবে?

করুণভাবে মিষ্ট হাসি হাসিয়া দাদা জবাব দিলেন—তাদের ভাবনা তারা ভাববে রে,—এখন আমি যে কদিন আছি একটু শান্তিতে থাক্‌তে দে! ভাইপোদের সঙ্গে নিয়ে না থাকলে কি জ্যেঠা হয়েছি অমনি?

প্রভাতে

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

শীতের প্রভাত-বেলা, কলিকাতা হতেছে মুখর,
একে একে ফেরীওলা সুপ্ত পথে করিছে জাগর।
আমি ব'সে আছি আজ স্তব্ধ ধীর,—কি চিন্তা কে জানে?
গভীর অতন্দ্র চিন্তা চিত্তে যেন মোহাবেশ আনে।
এ মোহ নেশার মতো,—সকল চেতনা যেন ঢুলে!
যেন রুদ্ধ কর্ম্মগতি, বাঁচা মরা যাই যেন ভুলে!
ভুলে যাই—গৃহ আছে, আছে মোর আত্মীয়-স্বজন ;
ভুলে যাই—দুঃখ আছে, দৈন্য আছে, ধর্ষণ পেষণ।
মনে হয়—চিত্তে যেন শান্ত ধীর সমুদ্র বিরাজে,—
নাহি তল, নাহি সীমা, ডুবে গেছি আমি তারি মাঝে!

সৌম্য শান্ত হিমালয় ধ্যানমগ্ন বিরাট গম্ভীর
সহসা হৃদয়ে যেন দাঁড়ায়েছে অটল সুস্থির।
তারি তলে তারি পাশে ম'রে গেছে উচ্ছ্বাস ও ভাষা,
আশা-বাসনার লীলা, তৃপ্তিহীন দুর্দ্দম পিপাসা
আজিকে প্রশান্ত স্থির অবনত যেন বেগহীন।
ধরাতীত শান্তি মাঝে আজি যেন হয়েছি বিলীন।

* * *

ডাকে কাক, ছোটে গাড়ী, চলে লোক, বলে কত কথা,
শুনি তবু চিত্তে মোর চাঞ্চল্যবিজয়ী নীরবতা।

ছায়ার মায়া

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(চলচ্চিত্রের আলোক রহস্য)

চিত্র সম্বন্ধে যাঁদের সামান্য কিছু জ্ঞান আছে, তাঁরাই এ কথাটা জানেন যে ছবির প্রধান সম্পদ হ'চ্ছে 'আলো-ছায়ার' লীলা-চাতুর্য্য! এই 'আলো-ছায়ার' বিশেষ তারতম্যের গুণেই ছবির অন্তর্নিহিত রূপ ও প্রকাশভঙ্গীর সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে! চলচ্চিত্রও ছবি; তাই এরও প্রকাশমাধুর্য্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে আলো-ছায়ার সুবিন্যাসের উপর। আলোক-সম্পাতের কৌশলে মানুষের দৃষ্টিকে

আলো-ছায়ার তারতম্য

(আলোক সম্পাতের গুণে এই ছবিখানি দেখলেই মনে হয় যেন খিলানের নীচে দিয়ে অনেকদূর পর্য্যন্ত ভিতরে দৃষ্টি যাচ্ছে! খিলান ও আস্‌বাবগুলির উপর জোর আলোর কৌশলে depth & roundness চমৎকার ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ শুধু আকার নয়, ওদের সম্পূর্ণ অবয়বও দেখা যাচ্ছে।)

এমনিই বিভ্রান্ত ক'রে তোলা যায় যে, পাতলা একখানি পর্দ্দার উপর ঘর-বাড়ী, গাছপালা, নরনারী, জীবজন্তু, এবং আস্‌বাব ও তৈজসপত্রের যে ছায়া পড়ে, তার কোনোটিকেই ছায়া ব'লে মনে হয় না। সবই যেন চোখের সামনে সত্য ও প্রত্যক্ষ দেখ্‌চি বোধ হয়! ছবিতে গোটা-জিনিসটার শুধু আকার নয়—সম্পূর্ণ অবয়বটিও অর্থাৎ তার depth এবং roundnes টুকুও দেখানোর একমাত্র উপায়ই হচ্ছে এই আলো-ছায়ার সু-সন্নিবেশ। কাজেই, চলচ্চিত্রের প্রধান একটা অঙ্গ হ'চ্ছে আলোক-সম্পাত।

দিনের আলোর উপর নির্ভর ক'রে ছবি তোলার একটা মস্ত অসুবিধা হ'চ্ছে, সে আলো নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল; তা'ছাড়া সূর্য্যালোক তেমন সহজে আমরা যদৃচ্ছা নিয়ন্ত্রিত করতে পারিনি। প্রয়োজন মত অতিসূক্ষ্ম ওজনে কমানো বা বাড়ানোরও কোনো সহজ উপায় থাকেনা আমাদের হাতে। সুতরাং সূর্য্যালোকের চেয়ে 'ষ্টুডিও' বা চলচ্চিত্রাগারের মধ্যে কৃত্রিম আলোর সাহায্যে ছবি তোলাই সবচেয়ে সুবিধা-জনক। কারণ, আলোক এখানে সম্পূর্ণরূপে পরিচালকের আয়ত্তাধীন। চিত্রগড়ে বৈদ্যুতিক আলোক ছাড়াও 'ইন্‌ক্যাণ্ডিসেণ্ট্ লাইট্' এবং 'আর্ক-ল্যাম্প্' প্রভৃতি নানা রকম আলোক ব্যবহারের সুব্যবস্থা করা থাকে। এই সব আলো পরিচালক তাঁর ইচ্ছামত ও প্রয়োজন অনুসারে যেখানে খুশী ফেলতে পারেন এবং যেরকম দরকার সেইরকম ভাবেই অনায়াসে কমাতে বা বাড়াতে পারেন।

চিত্রগড়ের 'আলোক-রহস্য' যদিও কতকগুলি মাপ-জোক্, হিসাব ও যন্ত্রপাতির অধীন, তবু চিত্রের প্রয়োজন মতো তাকে অদলবদল ক'রে নিয়ে ব্যবহার করা চলে। প্রথমেই ত' ১/২ সেকেণ্ডের মধ্যে ছবি তোলা যেতে পারে এমনভাবে চিত্রগড়টি ক্যামেরার সামনে দিক থেকে আলোকিত ক'রে রাখতে হবেই। এর উপর আবার diffused light (অনাবৃত-আলো) সমস্ত দৃশ্যটির উপর

ওজোন বুঝে ছড়িয়ে ফেল্‌লে ছবির যে সব জায়গা একেবারে গাঢ় আঁধার অর্থাৎ গভীর ছায়াযুক্ত, সে সব অংশও বেশ সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। এর ফলে, ছবিখানির মধ্যে আলো-ছায়ার লীলা এমন সুন্দরভাবে দেখতে পাওয়া যায় যে, সে ছবির তারিফ না ক'রে পারা যায় না। ক্যামেরার দিক থেকে দৃশ্যপটের উপর আবৃত-আলোও (spot-light) ফেলতেই হয়, তাছাড়া উপরদিক থেকে আবার এই diffused light বা অনাবৃত আলো ছড়িয়ে দিয়ে সমস্ত দৃশ্যটি সমানভাবে আলোকিত ক'রে রাখতে পারলে ছবির আলো-ছায়ার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করা নিজেদের আয়ত্তের ভিতর থাকে। কোন্ ছবিতে কোন্‌দিকে এবং কোন্‌খানটায় কতখানি আলো বা কতটা ছায়া (shade) রাখা দরকার, কোথায় আলো খুব জোর হ'লে ভাল হয়, কোথায় কমজোর হওয়াই বাঞ্ছনীয়; এই সব দিক দিয়ে ছায়ার মায়াকে মূর্ত্ত ক'রে তোলার পক্ষে এই diffused light বিশেষ কাজে আসে। তা'ছাড়া, আজকাল সবাক্ ছবি তোলবার জন্য প্রত্যেক দৃশ্যে এতবেশী সংখ্যক ক্যামেরা ব্যবহার করা হয় যে, অনাবৃত আলোক-সম্পাত এখন ছবি তোলবার একটা প্রধান আবশ্যকীয় অঙ্গ হ'য়ে উঠেছে!

নির্ব্বাক্ ছবিতে কোনো চিত্রগড়েই আগে একসঙ্গে তিনটির বেশী ক্যামেরা ব্যবহার করা হ'ত না। কিন্তু এখন 'কথাকওয়া ছ'বি তুলতে গিয়ে অনেক চিত্রগড়ে একসঙ্গে পনেরোটি পর্য্যন্ত ক্যামেরাও চালানো হ'চ্ছে। যাদের অবস্থা খুব বেশী সচ্ছল নয়, তারা সবচেয়ে কম ক'রেও একসঙ্গে অন্ততঃ চারটি ক্যামরা না হ'লে কাজ করতে পারেনা! একই ছবির একই দৃশ্য পনেরোটি ক্যামেরায় কেন তুলে নেওয়া হয়—এ প্রশ্ন যদি কারুর মনে জাগে, তার অবগতির জন্য বলছি যে—ছবি এক হ'লেও নানা বিভিন্ন কোন (angle) থেকে দেখলে সেই একই ছবি বিভিন্ন রকম দেখতে হয়। তাছাড়া নিকট ও দূর থেকে দেখার ও শোনার দুইয়েরই পার্থক্য ত' আছেই এবং আরও আছে—বিভিন্ন ক্যামেরার চক্ষের দৃষ্টি-শক্তি (power of Lens) ভিন্ন ভিন্ন রকম। অর্থাৎ, কোনো ক্যামেরার লেন্‌সের power খুব বেশী, কোনোটার কম। কাজেই পনেরোটি বিভিন্ন শক্তির ক্যামেরায় ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে ও ভিন্ন ভিন্ন দূরত্ব থেকে এবং বিভিন্ন আলোক-সম্পাতের সাহায্যে যে দৃশ্যটির ১৫খানি ছবি তোলা হয়, তার কোনো-না-কোনো একখানি ছবি শব্দ ও চিত্রের দিক দিয়ে নিখুঁত হয়ে ওঠবার

যথাস্থানে আলো

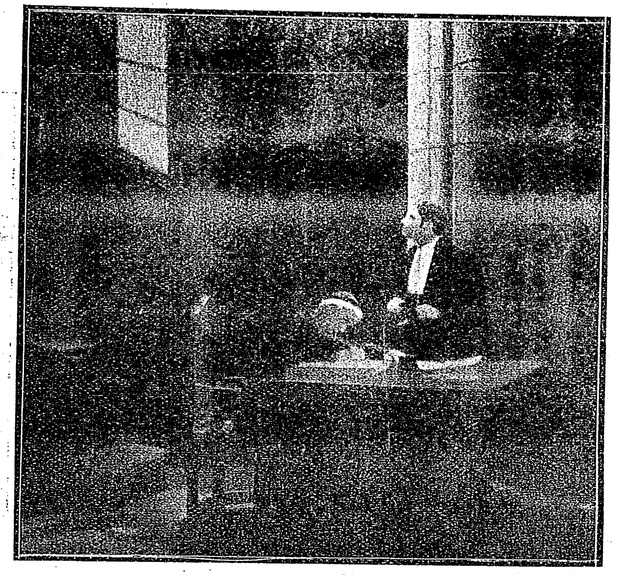

(এই ছবিখানিতে বামদিকের খোলা জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে আলো আসছে। জানালা আলোক আসবারই পথ। সুতরাং, এই জানালার ভিতর দিয়ে এই দৃশ্যে যে কৃত্রিম আলোক-সম্পাত করা হ'য়েছে—একে বলে 'Source lighting' বা যথাস্থানে আলো।)

সম্ভাবনা থাকেই, আর তা' যদি না'ও হয়, তাহ'লেও, যে ক্যামেরায় ছবির যে অংশটুকু ভালো উঠেছে তা' থেকে সেই অংশটুকু কেটে নিয়ে জোড়া লাগিয়ে একখানি যথাসম্ভব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও নির্দ্দোষ ছবি তৈরী হবার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্যই আরও বিশেষ ক'রে অনাবৃত-আলোর সাহায্যে সমস্ত দৃশ্যগুলি সমানভাবে আলোকিত ক'রে রাখা প্রয়োজন।

উপরদিক থেকে আলো ছড়িয়ে ফেলার একটা মস্ত সুবিধা হ'চ্ছে প্রত্যেক জিনিষটার এবং প্রত্যেক নরনারীর উপরাংশ ক্যামেরার সামনে বেশ স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে! ছবির লোকগুলোর চোখ মুখ যদি আমরা ভালো ক'রে দেখতে পাই, তাহ'লে সে ছবির উপর সহজে আমাদের বিরাগ উৎপন্ন হয়না। উপর থেকে আলো ফেলার ব্যবস্থা ক'রলে আর একটা সুবিধা হয় এই যে, ছবি তোলবার সময় ক্যামেরা-কুটুরী (comera-booths) আলোকাধার (light-stands) প্রভৃতির পরিবেষ্টনে সঙ্কীর্ণ হ'য়ে ওঠায় অভিনয়ের স্থানটুকু আর অধিকতর সঙ্কীর্ণ হ'য়ে পড়েনা।

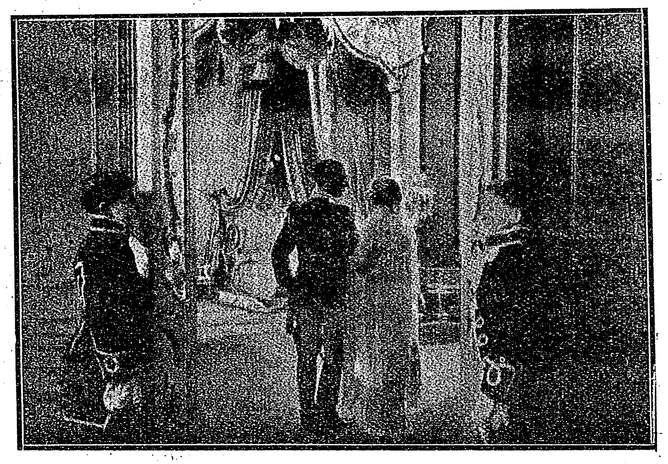

নিরপেক্ষ আলো

(লভ্ প্যারেডের এই দৃশ্যটিতে এমনভাবে আলো ফেলা হয়েছে যে প্রধান নট-নটীর সঙ্গে দ্বারপালেরাও ক্যামেরার চোখে সমান আদর পেয়েছে। একে বলে 'Impersonal lighting'।)

এই উপর থেকে ছড়িয়ে ফেলা আলোর ব্যবস্থাটা বেশ সন্তোষজনক ভাবে ক'রে উঠতে পারলেই তার পরের কাজ হ'চ্ছে কী-ভাবে প্রত্যেক দৃশ্যে আলোক নিক্ষেপ করা হবে সেইটে স্থির করা। অর্থাৎ সেই দৃশ্যের ছবির আখ্যান ভাগ অনুযায়ী কোন্ সময়ে ঘটছে সেইটে জেনে তদনুরূপ আলোক নিক্ষেপের ব্যবস্থা করা। যদি সেই দৃশ্যে খোলা-জানালা দেখবার সুযোগ থাকে তা'হলে সেই খোলা-জানালার ভিতর দিয়ে দিনের তখন কতদণ্ড হিসাব করে এবং সে সময় কোন্দিক্ থেকে ঘরের মধ্যে আলো আসা সম্ভব সেটা বিবেচনা ক'রে ঘরের সেইদিকের জানালা দিয়ে আলোক নিক্ষেপের আয়োজন করা উচিত। কিম্বা, যদি সেটা রাত্রিকালের কোনো দৃশ্য হয়, তাহ'লে ছবির গল্পের বর্ণনা অনুযায়ী সে ঘরে তখন কী আলো বা দীপ জ্বলছিল, ঝাড়লণ্ঠন, দেয়ালগিরি, না টেবিলল্যাম্প, সেইটে জেনে তারই সাহায্যে দৃশ্যটি আলোচিত ক'রে তোলবার ব্যবস্থা করাই হ'চ্ছে শিল্প-রুচি-সম্মত উপায়।

আলোর ব্যবস্থা করায় যদি কোনো ভুল বা ত্রুটী হ'য়ে পড়ে তাহ'লে কিন্তু ছবিগুলি মাটি হ'য়ে যায়। কারণ ভুল দিক থেকে আলো ফেলার দোষে এবং যেখানে যতটুকু আলোর দরকার তার কমবেশী হ'য়ে গেলে সে দৃশ্যে অভিনয় ত' ক্ষতিগ্রস্ত হয়ই, তা' ছাড়া সে ছবিও ভালো খেলেনা! অর্থাৎ ক্যামেরা খুব ভাল হ'লেও আলোর দোষে ঠিক আশানুরূপ সাফল্যলাভ হয় না। সুতরাং চলচ্চিত্র-শিল্পীদের প্রথম কর্ত্তব্য হ'চ্ছে গল্পটি বেশ ভালো ক'রে পড়ে নিয়ে—'আলোকর' (Light-expart) দৃশ্য সজ্জাকর (Art-Director) এবং ছায়াধর যন্ত্রী (camera-man) তিনজনে মিলে পরামর্শ ক'রে প্রত্যেক দৃশ্যের ছবি তোলবার আগেই সে দৃশ্যটিতে কী ভাবে কোন্দিক দিয়ে কতটা আলো ব্যবহার করা হবে, তার একটা ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত করা। এইভাবে কাজ সুরু ক'রতে পারলে অনেক ভুলচুক্ কম হবে। ছবি তুলতে অযথা অর্থের অপব্যয় এবং অকারণ বিলম্ব ঘটবে না।

কোন্ দৃশ্যে কোন্দিক থেকে কি ভাবে আলো ফেলা হবে, এটা স্থির হবার পরই চলচ্চিত্র-শিল্পীর দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে আলোর সাহায্যে দর্শকদের দৃষ্টি-বিভ্রম উৎপাদন করা। অর্থাৎ চিত্রেয় বস্তু বা ব্যক্তির শুধু রেখায় আঁকা আকৃতি দেখানো নয় তার সম্পূর্ণ অবয়বের রূপ (depth & roundness) ফুটিয়ে তোলা! এটা সম্ভব হ'তে পারে একমাত্র আলো-ছায়ার কৌশলে দর্শকদের দৃষ্টি-বিভ্রম সৃষ্টি

ক'রতে পারলে। চিত্রেয় বস্তু বা ব্যক্তির আকৃতির depth দেখাতে হ'লে আলোর তারতম্য বিধানই একমাত্র সহজ উপায়।

কোনো ছবির পুরো-ভূমিকা (Fore-ground) যদি ছায়া-কায়া (Silhouett) মাত্র ক'রে রেখে, মধ্যভূমিকা (middle-ground) খুব দীপ্ত আলোকোজ্জল করে তোলা হয় এবং পট-ভূমিকা (B ck-ground) একেবারে অন্ধকার রাখা হয়, তাহ'লে যে কোনো দৃশ্যের depth ছবিতে বেশ স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে আলো ছায়ার এই তারতম্য (Contrast of light & shade) তা' ব'লে কোনো ছবিতেই যেন স্পষ্ট হ'য়ে না ওঠে। কারণ, আলো-ছায়ার তারতম্যটুকু যদি দর্শকদের চোখে ধরা প'ড়ে, যায় তাহ'লে তাদের দৃষ্টি-বিভ্রম সৃষ্টি করা কঠিন। সুতরাং ছবির যে অংশটুকু মাত্র সিল্হৌট্ করা হবে তার মধ্যেও প্রত্যেক খুঁটি-নাটিটি (details) পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাওয়া চাই; আবার, যে অংশটুকু আলোকোজ্জ্বল করা হবে সেটুকু যেন বড্ড বেশী জোর আলোয় একেবারে সাদা না হ'য়ে পড়ে। এবং একেবারে অন্ধকার অংশেরও অন্ততঃ আকৃতি-রেখাগুলো (Outlines) যেন অদৃশ্য না হয়ে যায়।

Depth দেখাবার আর একটা উপায় হ'চ্ছে দৃশ্যের দেওয়াল বা প্রাচীরগাত্র খুব আলোকোজ্জ্বল ক'রে তুলে ঘরের ভিতরের ও দেওয়ালের সম্মুখের আসবাবপত্রগুলি একটু 'সিল্হৌট্' ক'রে রাখা! Depth দেখাবার এ উপায় যেখানে অবলম্বন করা হবে, সেখানে দৃশ্যপটের দেওয়ালগুলি যাতে চ্যাপ্টা ও প্লেন না হ'য়ে উঁচু উঁচু 'বীট' বা 'পল' তোলা, থাম বসানো এবং ষট্‌কোণ বা অষ্ট-কোণ হয়, আগে থেকে সে ব্যবস্থা করতে হবে। দেওয়ালের অভ্যন্তরে ঝরোকা, বাতায়ন বা ঘুলঘুলি থাকলে আরও ভালো হয়। আসবাবপত্র-গুলো একটু আকারে বড়ো হ'লে এ রকম ছবির পক্ষে খুব সুবিধা। তা'ছাড়া ঘরের ভিতরকার প্রত্যেক বস্তু বা ব্যক্তির যদি সেই ঘরের মেঝেয় আলোর বিপরীত দিক থেকে ছায়া পড়ছে দেখানো হয়, তাহ'লে অতি সহজেই দর্শকদের দৃষ্টি-বিভ্রম উৎপাদন ক'রতে পারা যায়।

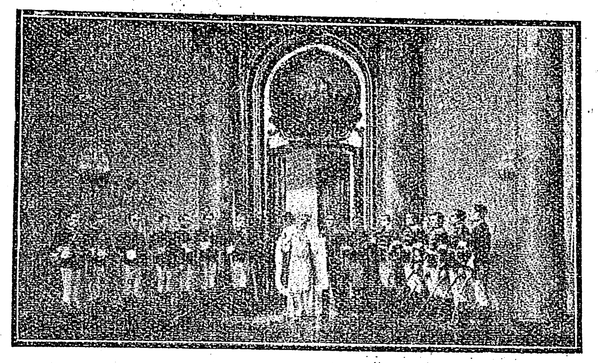

'লাভ্ প্যারেডের' একটি দৃশ্য

(এই দৃশ্যের পটভূমিকায় যে আলো ফেলা হ'য়েছে অন্যান্য অভিনেতৃবর্গের উপর তার চেয়ে হালকা আলো দেওয়া হ'য়েছে, আবার প্রধানা অভিনেত্রীর উপর অপেক্ষাকৃত জোর-আলো ব্যবহার করা হ'য়েছে। এর ফলে এই লঘু ছবিখানির মধুর ভাবটুকু বেশ খুলেছে।)

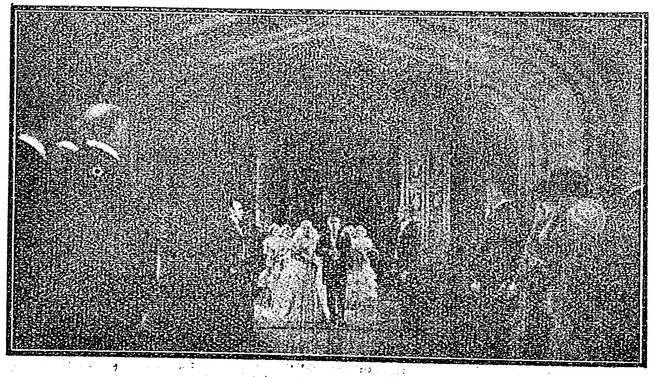

'ডাঃ ফ্যু মাঞ্চুর' একটি দৃশ্য

(এই দৃশ্যে আলোছায়ার যে বৈচিত্র্য দেখানো হ'য়েছে তার ফলে এই গুরু ছবিখানির একটা গম্ভীর সংযত ভাব চমৎকার ফুটেছে।)

Roundness অর্থাৎ চিত্রের বস্তু বা ব্যক্তির আকৃতি ও অবয়বের সম্পূর্ণ গঠন যদি দেখাতে হয় তাহ'লে বিশেষ যত্ন ক'রে জোর-আলো ব্যবহারের কৌশল শিক্ষা করা চাই। দৃশ্যের মধ্যে যেখানে সামান্য একটুও বৃত্তরেখার (Carve) সম্পর্ক আছে, সেই সেই স্থানগুলি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য ক'রে ছোট ছোট আবৃত-আলোক (Spot-light) ব্যবহার ক'রে সেগুলি সুস্পষ্ট ক'রে তোলা চাই। বৃত্তরেখা বেশী করে দেখাতে পারলেই ছবির roundness ফুটিয়ে তোলা সহজ হ'য়ে উঠবে। কারণ এই বৃত্তরেখার (Curve) সাহায্যেই আমাদের দৃষ্টির 'গোলাকার বোধ' জন্মায়। কাজেই ছবিতে কোনোও কিছুর 'ঘের' বোঝাতে হ'লে বৃত্তরেখার সাহায্য নেওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নেই। যেমন ধরুন কোনো ছবিতে যদি গোটাকতক গোল খিলান সারি সারি গোল থামের উপর থাকে, তাহ'লে যে কোনো একদিক থেকে সেই থামের উপর জোর আলো ফেললে থামের বৃত্তরেখা আমাদের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে। সঙ্গে সঙ্গে এক পাশ থেকে খিলোনেরও ভিতর দিকটায় জোর আলো দিতে পারলে শুধু যে তার roundness টুকুই আমরা বুঝতে পারবো তাই নয়, তার ভিতরের depthও আমাদের দৃষ্টিপথে প্রতিভাত হবে। এমনি ভাবে আস্‌বাব্‌-পত্রের উপরও আলো ফেলতে পারলে সমান ফল পাওয়া যায়। ঘরের ভিতরের টেবিল চেয়ারগুলির পায়া যদি এমনভাবে আলো ফেলে স্পষ্ট ক'রে তোলা যায় যে, মেঝের আলো এবং দেওয়ালের গায়ের আলোর সঙ্গে বেশ একটা তার পার্থক্য থাকবে অথচ সেটা খুব বেশী তফাৎ না হ'য়ে পড়ে, তাহ'লে সে আস্‌বাব্‌গুলো আমাদের চোখে একেবারে প্রত্যক্ষ সত্য হ'য়ে উঠবে।

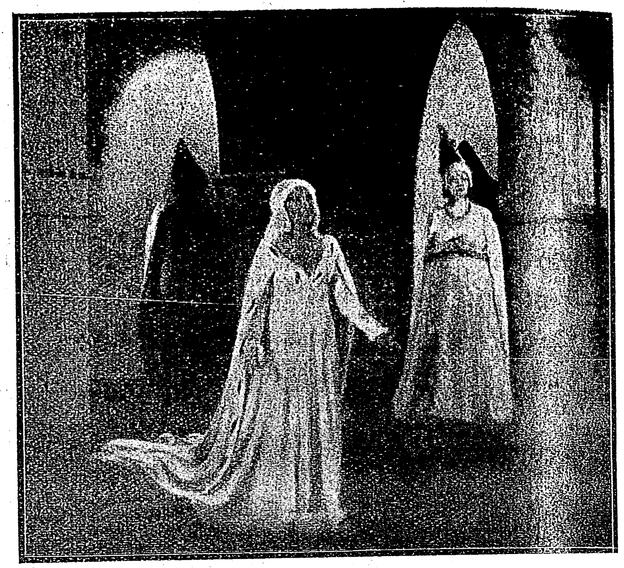

পক্ষপাতি আলো

('ভ্যাগাবণ্ড কিং'য়ের এই দৃশ্যে প্রধানা অভিনেত্রীকেই আলোকিত ক'রে দেখানো হ'য়েছে—তাঁর সখী বা পরিচারিকাদের সম্পূর্ণ অবহেলা করে! একে বলে Personal lighting)

'এ্যানা ক্রিষ্টী'র একটি দৃশ্য

(আলোক-সম্পাতের গুণে এই দৃশ্যে রজনী হ'য়ে উঠেছে যেন হেমন্তের ঘন কুজ্ঝটিকায় ঢাকা। ঘর বাড়ী আলো' ও মানুষের ভিতর দিয়েও স্পষ্ট তার রূপ দেখা যাচ্ছে।)

অবশ্য দৃশ্যপট ও আস্‌বাব-পত্রের চেয়ে নট-নটীদের উপরই লক্ষ্য রাখতে হবে বেশী, কারণ ছবির প্রধান আকর্ষণ তারাই, দৃশ্যপট বা আস্‌বাব-পত্র নয়। ওগুলো তাদেরই সুবিধার জন্য রাখবার প্রয়োজন। চলচ্চিত্রের অভিনেতৃদের মধ্যে আবার ছবির রকম হিসাবে দু'টো শ্রেণী আছে। একরকম হ'চ্ছে 'ষ্টার' ছবি! অর্থাৎ প্রধান অভিনেতা বা অভিনেত্রীই এ ছবির প্রধান আকর্ষণ! সুতরাং এ ছবির মধ্যে যা কিছু থাকবে সমস্তই সেই 'ষ্টার্' বা প্রধানের আকর্ষণের অনুকূল। আর এক-রকম ছবি হ'চ্ছে "All-Star" চিত্র অর্থাৎ সে ছবিতে প্রধান ব'লে বিশেষ কোনও এক-জনের আকর্ষণ নেই, সে ছবির গল্পের সাফল্য নির্ভর করে সবারই উপর সমান ভাবে! কেউ তাতে কম বেশী নয়।

এই দুই বিভিন্ন শ্রেণীর ছবিতে আলোর ব্যবহারও একেবারে দু রকমের। প্রথম শ্রেণীর ছবিতে সেই প্রধান ব্যক্তির প্রয়োজন হিসাবেই আলোর ব্যবস্থা ক'রতে হয়। 'ষ্টার' যিনি তাঁকে যাতে সকল দৃশ্যেই সুন্দর ও মনোহর ক'রে তোলা যায় সেই দিকেই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রেখে চলতে হয়। কারণ, তিনিই হচ্ছেন সেই ছবির প্রধান আকর্ষণ! দ্বিতীয় শ্রেণীর ছবিতে ব্যক্তির প্রয়োজন গৌণ হ'য়ে পড়ে। সেখানে গল্পের আকর্ষণটাই মুখ্য; কাজেই সেইদিকে লক্ষ্য রেখে ছবি-খানিকে শিল্প-চিত্রে-র দিক দিয়ে দ্রষ্টব্য ক'রে তুলতে হয়।

'ষ্টার্' ছবি তোলা আজকাল অনেক ক'মে এসেছে, কারণ যে ছবিতে 'ষ্টার্' অর্থাৎ প্রধান একজন নায়ক বা নায়িকাকেই বড়ো ক'রে তোলা হয়, সে ছবির অনেক দোষ থেকে যায়! যেহেতু—তার গল্প, তার চিত্রনাট্য, তার ভূমিকা-নির্ব্বাচন—তার অভিনয় পরিচালন—তার ছায়াচিত্র, তার আলোক-সম্পাত, তার বিবৃতি-লিপি (Titles) সব কিছুই এমন ধরা-বাঁধার মধ্যে থেকে ক'রতে হয় যাতে সেই 'ষ্টারে'র নাগালের বাইরে না গিয়ে পড়ে কিছু!

একাধিক নিম্নশ্রেণীর 'ষ্টার্' ছবিতে বাজার ছেয়ে যাওয়ায় 'ষ্টার'। ছবির উপর সাধারণেরও একটা অভক্তি

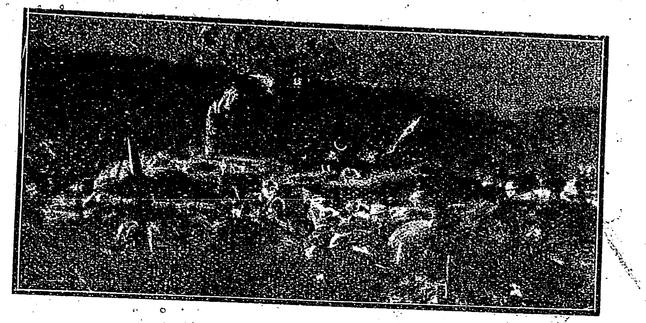

রাত্রে তোলা বর্হিদৃশ্য

('জার্ণিজ এণ্ড্' ছবিখানির এই দৃশ্যে মহাযুদ্ধের রণক্ষেত্রে ট্রেঞ্চের আলোয় ভয়াবহ রাত্রির নিবিড় রূপ ও রণক্ষেত্রের ভীষণতা বেশ ফুটে উঠেছে।)

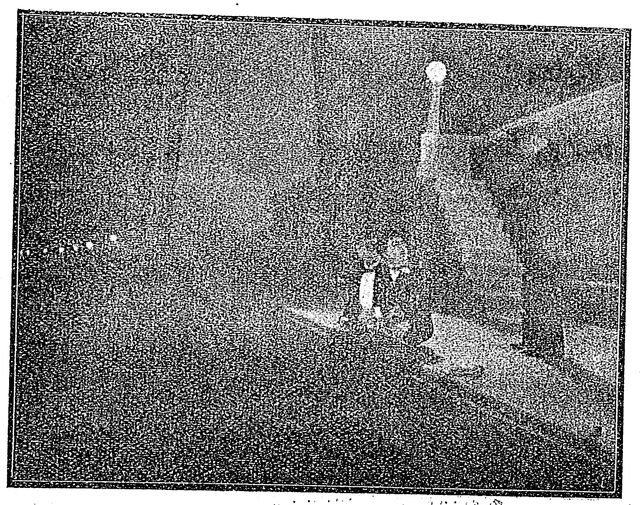

'সিটি লাইটে'র একটি দৃশ্য

(চার্লি চ্যাপলিনের বিখ্যাত ছবিখানিতে রাত্রের এই বহির্দৃশ্যকে সুন্দরভাবে আলোকিত ক'রেছে—'Soure lighting'! রাজপথের ঐ আলোটি অবলম্বন ক'রেই চলচ্চিত্র-শিল্পী এ দৃশ্যটিতে আলোক-সম্পাতের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।)

জন্মেছে। গল্পের মধ্যে যে দৃশ্যে 'ষ্টার্' আছেন—তার ঘটনা যেমনই হোক্ না কেন, 'ষ্টার'কে তার ভিতর প্রধান আকর্ষণ ক'রে ছবি তুলতেই হবে। প্রযোজকদের এই

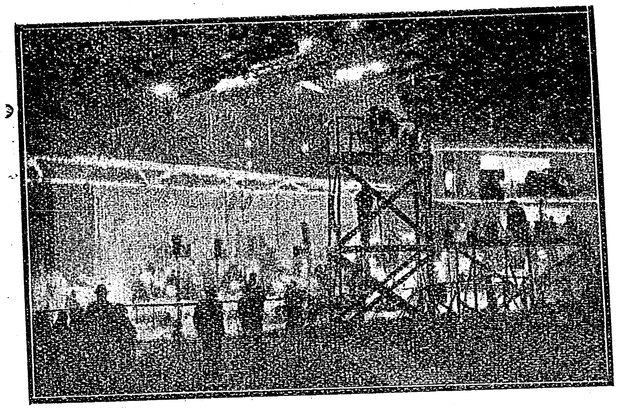

'সান্‌রাইজে'র একটি দৃশ্য

(পটভূমিকায় রাত্রিকালের অন্ধকার আকাশ। মধ্যে' আলোকোজ্জ্বল 'কাফে' বা হোটেল এবং পুরোভূমিকায় রাজপথ। রাজ-পথের পথিকগুলিকে 'সিল্‌হোটে দেখানো হ'য়েছে।)

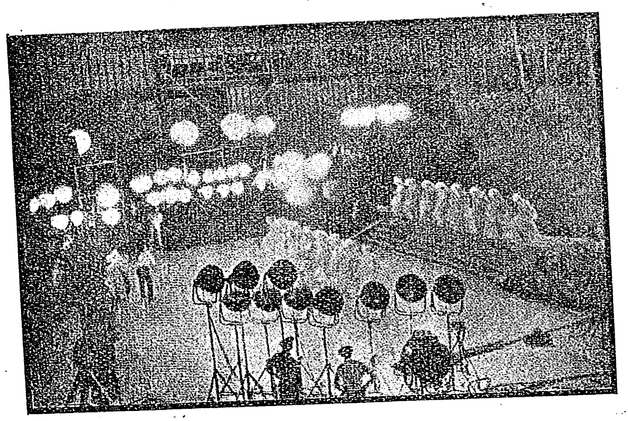

'কিং অফ্ জাজের' একটি দৃশ্য (তোলবার আগে)

(দৃশ্যপটের স্বাভাবিক রংটি পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রে দেখাতে হ'লে কত বেশী আলো একটি দৃশ্যে ব্যবহার করতে হয় তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে এই ছবিখানিতে।)

খেয়াল অনেক সময় পরিচালক ও চিত্র-শিল্পীর কাজের পক্ষে পীড়াদায়ক হ'য়ে ওঠে! কারণ, 'ষ্টারের' খাতিরে তাঁদের প্রায়ই 'আর্ট'কে গলাটিপে হত্যা ক'রতে হয়। ছবি তুলতে তুলতে এমন অনেক দৃশ্যে দেখা যায় যে সেই তথাকথিত ষ্টারের সুন্দর মুখের চেয়ে একটা কোনো ছোট্ট অপ্রধান ভূমিকার চোখ মুখের ভাব ক্যামেরার সামনে অভিনয়ে এত চমৎকার ফুটে উঠেছে যে নাটকীয় ঘটনার দিক দিয়ে তার সার্থকতা যতখানি শিল্প-কলার দিকদিয়েও তার সৌন্দর্য্য তেমনই লোভনীয়! কিন্তু, পাছে 'ষ্টার' কোথাও এতটুকু মলিন হ'য়ে পড়ে এই আশঙ্কায় সে অপ্রধান ভূমিকার অভিনেতাকে অলক্ষ্যেই রেখে যেতে হয়। তাছাড়া, 'ষ্টার্' কোনো উৎসব-মণ্ডপে, আনন্দ-সভায়, প্রমোদ-গৃহে বা কারাগারের অন্ধকূপে, পর্ব্বত-গহ্বরে কিম্বা পাতালের সুড়ঙ্গপথেই থাক্—সব সময়েই—সর্ব্বত্র—তাকে সুন্দর ক'রে ছবিতে তোলা চাই, অর্থাৎ, স্থান-কাল যেমনই হোক না কেন, সেদিকে চোখ বুজে 'ষ্টারের' চাঁদমুখের চারপাশে ছবিখানির গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত আলোর একটা চালচিত্তির ধ'রে বেড়াতেই হবে। এটা যে কোনোরকম যুক্তিতর্ক দিয়েই সমর্থন করা যায়না, এবং এতে যে আর্টের চরম অপমান করা হয়—ছবির কারবারী মহাজন তা' কিছুতে বোঝে না; সে ভাবে—যাকে এত টাকা দিয়ে কণ্ট্র্যাক্ট্ ক'রে—অর্থাৎ চুক্তি-পত্র সহি করে এনেছি, তাকে ছবির মধ্যে আগাগোড়া যত বেশী ক'রে দেখাতে পারি, সেইটেই আমার পক্ষে লাভ! কিন্তু, এই অতি-লোভের ফলে যে ছবির মর্য্যাদা অনেক খেলো হ'য়ে যায় সে হিসাব তারা রাখে না। কাপড়ের পাড়ের জরিদার কাজ দেখিয়েই তারা লোক ভোলাতে চায়, —মিহি বা খাপি খোলের জন্যে মাথা ঘামায় না!

দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ 'all-star' ছবি যেগুলি, সৌভাগ্যক্রমে আজকাল সেই ছবিই ক্রমে ক্রমে জনপ্রিয় হ'য়ে উঠ্‌ছে। এতে চলচ্চিত্র-শিল্পীর স্বাধীন ভাবে কাজ করবার যথেষ্ট সুযোগ থাকে। একজনের প্রতি সমস্ত

মনোযোগ না দিয়ে সকলের প্রতি সমান মনোযোগ দেবার অবকাশ পায় সে। এর ফলে শিল্পের দিক দিয়ে চলচ্চিত্রের চরম সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা ঘটে।

ছবির আলোক-সম্পাত, সর্ব্বত্র ঠিক গল্পের ভাবানুকূল ক'রে তোলা উচিত। উৎকৃষ্ট ছবির প্রধান গুণই হ'চ্ছে তাই। ছবির ঘটনা ও কাহিনীর মর্ম্মনিহিত যে সুর, আলোর ভিতর দিয়ে সেই সঙ্গীতকে মূর্ত ক'রে তুলতে পারলেই সেই ছবি হয়ে উঠবে সকল ছবির শ্রেষ্ঠতম।

ছবির গল্প যদি 'The way of All Flesh'; বা 'Lummox' কিম্বা 'The case of Sgt. Grischa'র মতো গুরুগম্ভীর ভাবের হয়—তাহ'লে আলোক-সম্পাত সে ছবিতে খুব সংযতভাবে করা উচিত। কিন্তু ছবিখানি যদি 'মেলো-ড্রামা' বা মধুর নাটক হয় যেমন 'Dr. Fu Manchu' বা 'Alibi' ছবি তাহ'লে আলোক-সম্পাত হওয়া উচিত একটু নরম রকমের, অথচ তারই মধ্যে আগা-গোড়া আলো-ছায়ার বৈচিত্র্যও রাখা উচিত। আবার 'Love Parade' কিম্বা 'Vagabond King'এর মতো মধুর নিতান্তক হাল্‌কা ছবি যদি হয়, তাহ'লে আগাগোড়া খুব জোর-আলো ব্যবহার করাই সমীচীন। এর দু'টি কারণ দেওয়া যেতে পারে। প্রথম, ঘটনার সঙ্গে তা'তে আলোর সামঞ্জস্য থাকে, দ্বিতীয় কারণ, ছবির কোনো মধুর অংশই এতে দর্শকের অলক্ষ্যে থেকে যাবে না! নিপুণ চলচ্চিত্র-শিল্পীর তত্ত্বাবধানে ছবির আলোক-সম্পাত শুধু যে গল্প ও অভিনয়ের স্থানকালোপযোগী একটা নাট-কীয় আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রে তাই নয়, দর্শকের মনকেও চিত্রের অতি সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য ও রস গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে তোলে।

কেবলমাত্র যে 'চিত্রগড়ের' অভ্যন্তরে কৃত্রিম আলোর সাহায্যেই এইভাবের ছবি তোলা সম্ভব, এমন যেন কেউ মনে করবেন না। বাইরে মুক্ত প্রকৃতির কোলে দিনের আলোতে তোলা ছবিও এমনিই সুন্দর ও সু-আলোকিত ক'রে তোলা যায় যদি সে চলচ্চিত্র-শিল্পীর জানা থাকে—স্বভাবের আলোকেও কি উপায়ে নিজের আয়ত্তাধীন করে'

'লামাক্সের' একটি দৃশ্য

('Lummox' একখানি গুরু গম্ভীর নাটক। তার আলোক-সজ্জাও অনুরূপ ভারি ও সংযত করা হয়েছে।)

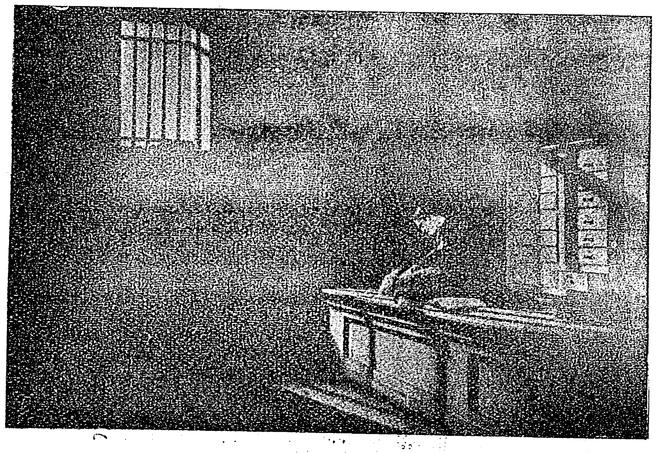

''এ্যালিবি'র একটি দৃশ্য

(পটভূমিকায় হত্যার উপযোগী অন্ধকার! দূরের জানালা-পথে আলো এসে প'ড়ে হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে! আলো-ছায়ার চমৎকার সন্নিবেশ হয়েছে এখানে।

নেওয়া যেতে পারে! এ কিন্তু অত্যন্ত কঠিন কাজ; এবং দীর্ঘকালের সাধনা-সাপেক্ষ!

সূর্য্যের আলোক নিয়ন্ত্রিত করবার প্রধান উপায় হ'চ্ছে ক্যামেরার মুখটি খোলা ও বন্ধ করার কৌশল আয়ত্ত

অনেকের মাঝখানে দু'জন

('লামাক্কোর' এই দৃশ্যে বহু লোকের মধ্যেও দুটি নারী দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রছে। সবাইকেই বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তার মধ্যেও ওরা দুজন স্পষ্টতর হ'য়েছে।)

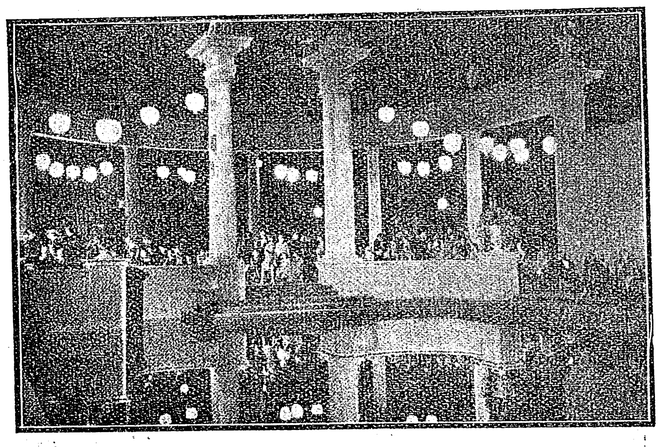

'সানি সাইড্ আপের' একটি দৃশ্য

(রাত্রিকালের ছবিতেও জোর আলো ব্যবহার করা চলে যদি সে দৃশ্যের ঘটনা এই ছবিখানির মতো অধিক আলোর অনুকূল হয়।)

করা। অর্থাৎ, কোন্ দৃশ্যটি কতক্ষণ কী পরিমাণ আলোর ভিতর তোলা দরকার, সেইটি জানা এবং লেন্সের সামনে সুতোর জাল ব্যবহার ক'রতে শেখা। অর্থাৎ কী রকম আলোর কী পরিমাণ তারতম্য ঘটাবার জন্য কোন্ ধরণের জালিপর্দ্দা লাগানো দরকার, সেটা ভাল ক'রে শেখা। এই উপায়ে সমস্ত ছবিখানি আগাগোড়া, কিম্বা তার অংশ-বিশেষের উপর দিনের আলোয় তোলবার সময়ও প্রয়োজন মত আলোর হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো চলে। প্রত্যেক দৃশ্যের অনেক কিছু খুঁটিনাটি ব্যাপার ওই Gauze Matte এর সাহায্যে ইচ্ছামত সুস্পষ্ট ক'রে তোলা বা অস্পষ্ট ক'রে ফেলা যায়। তবে এ করবার উপায়টুকু একান্ত সীমাবদ্ধ। বহির্দৃশ্যের ছবি তোলবার সময় চলচ্চিত্র-শিল্পীর প্রয়োজন হ'লে এই ভাবেই তিনি দিনের আলো কতকটা কমিয়ে-বাড়িয়ে নিতে পারেন। এখানে একটা কথা ব'লে দেওয়া উচিত মনে করি; ক্যামেরার ভিতরের Matte বাক্সে এক আধ ইঞ্চি Gauze ব্যবহার করার চেয়ে অভিনেতা দৃশ্যপটের সামনে ও মাথার উপর খুব বড় জালিপর্দ্দা (Matte Screen) খাটিয়ে দেওয়াই অধিকতর সুবিধাজনক। সেই পর্দ্দার বাইরে যদি অভিনেতারা থাকে, তা'হলে তাদের উপর বেশ জোর আলোই পড়বে এবং পর্দ্দাবৃত থাকার দরুণ পটভূমিকা ও দৃশ্যস্থল অপেক্ষাকৃত কম আলো পাবে। আবার কোনো দৃশ্যে যদি পটভূমিকা ও দৃশ্যস্থল উজ্জ্বল রেখে অভিনেতাদের স্বল্প-লোকের মধ্যে অভিনয় করানো প্রয়োজন মনে হয়, তাহ'লে এমন কোনো একটি স্থান নির্ব্বাচন ক'রতে হবে যেখানে পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলী বেশ রৌদ্রকরোজ্জ্বল কিন্তু অভিনয় স্থলে গাছপালা, ঘরবাড়ী বা পাহাড়েরই হোক—খানিকটা ছায়া এসে প'ড়েছে; যদি সে রকম ছায়াযুক্ত স্থান খুঁজে না পাওয়া যায় তাহ'লে কোনো রকম কৃত্রিম উপায়ে প্রাচীর খাড়া ক'রে সেখানে আলোকটুকু আড়াল ক'রে নিতে হবে। অনেক সময় সেই জায়গাটুকুতে খুব ঘন কালো রং মাখিয়ে দিয়ে

ক্যামেরার ভিতর দিয়ে ছায়ার মধ্যে অভিনয় করার ফল পাওয়া যায়। তারপর reflector অর্থাৎ যার উপর সূর্য্যালোক প'ড়ে আবার প্রতিবিম্বিত হয়, যেমন দর্পণ বা সোনা ও রূপোর মতো চক্‌চকে কোনো জিনিস ইত্যাদি—এগুলো বহির্দৃশ্যের ছবি তুলবার সময় ব্যবহার করা একেবারে অত্যাবশ্যকীয় হ'য়ে ওঠে। কারণ, চিত্রেয় দৃশ্যের প্রত্যেক অন্ধকার কোন্‌টি এবং অভিনেতৃদের অবয়বের যে অংশ আলোর বিপরীত দিকে থাকে সে সব সমান ভাবে আলোকিত ক'রে তোলবার একমাত্র উপায় হ'চ্ছে প্রয়োজনমত প্রচুর পরিমাণে এই 'reflector' ব্যবহার করা। চিত্রগড়ের অভ্যন্তরে যেমন বৈদ্যুতিক আলোকের সাহায্যে বিভিন্নপ্রকার আলোর বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা চলে, ভিন্ন ভিন্ন ঔজ্জ্বল্যবর্দ্ধক reflectorএর সাহায্যে বহির্দৃশ্যেও ঠিক সেইরকমই আলোর বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায়। তবে, ঠিক তত সহজে এবং তেমন সূক্ষ্মভাবে করা যায় না!—কড়া আলো, নরম আলো, সামনের আলো, পিছনের আলো, মাঝের আলো, কোণা-কোণি আলো, পাশের বা ধারের আলো, সব রকম আলোই এই reflector থেকে স্থূল ভাবে পাওয়া যেতে পারে বটে, যদি তার কৌশল জানা থাকে।

আমাদের এখানে প্রচুর সূর্য্যালোক! কিন্তু মুস্কিল এই যে সূর্য্যকে ঠিক এক জায়গায় অচল ভাবে অনেকক্ষণ পাওয়া যায় না। উদয়-অস্তের মধ্যে প্রতিমুহূর্ত্তে তার গতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আকাশের নীচেয় পৃথিবীর উপরও আলো-ছায়ার অবস্থান বদলে যায়। তা ছাড়া এখানে মেঘেরও অভাব নেই, হুস্ ক'রে উড়ে এসে প'ড়লেই হ'লো! কুয়াসা, ধোঁয়া ও ধূলোর উৎপাত ত' আছেই। সুতরাং এ স্থলে সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হ'চ্ছে দিনের বেলাতেও বহির্দৃশ্যের ছবি কৃত্রিম আলোর সাহায্যে তোলার ব্যবস্থা করা। তাহ'লে আর আলোর অভাবে ছবি খারাপ হ'য়ে গেলো ব'লে দৈবের দোষ দেবার দরকার হবে না! কিম্বা, কাজ ক'রতে ক'রতে আলো চলে গেলো দেখে ছবি তোলা বন্ধ ক'রতে হ'বে ভেবে আক্ষেপ

কৃত্রিম আলোয় দিনে ছবি-তোলা

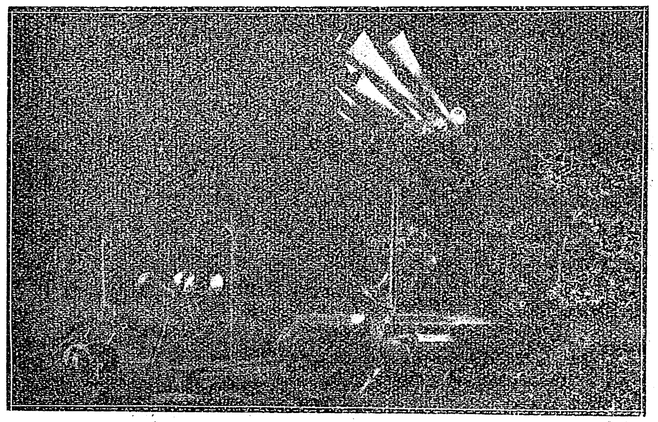

রাত্রে আকাশে আলো ফেলবার যন্ত্র

(উড়ো জাহাজের আক্রমণ প্রভৃতি দেখাবার জন্য রাত্রে আকাশে আলো ফেলবার প্রয়োজন হয়। এই যন্ত্রে সে কাজ সুসম্পন্ন করা চলে।)

করতে হবে না! কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা থাকলে সমস্ত দিনই বাইরে কাজ করা চলবে।

রাতের দৃশ্যও আগে দিনের বেলাতেই তোলা হ'তো। তখন শুধু, ক্যামেরায় রাতের ছবি নেওয়া হ'তো একটু কম

সময়ের মধ্যে Under expose করে, এবং সে ছবি ছাপা হ'ত নীল রংয়ের ফিল্মের উপর। তা'তেই কাজ চলে যেত!—কিন্তু আজকাল অনেক রকম আলোর সুবিধা হওয়াতে রাতের দৃশ্য রাত্রেই তোলা হয়। তাতে কাজেরও অনেক সুবিধা হয়। অল্প সময়ের মধ্যে ছবিখানি শেষ হ'য়ে যায়, রাত্রির অংশ আর পৃথক ক'রে ছাপতে হয় না। এবং রৌদ্রের তাত ও দিনের আলোয় কাজ করার শ্রান্তি ক্লান্তি থেকে অভিনেতা অভিনেত্রীগণ, তথা চিত্রকর ও পরিচালকও অনেকখানি অব্যাহতি পান।

বর্ত্তমানে চলচ্চিত্রে আলোক-সম্পাতের ব্যবস্থা করা বিশেষ রকম জটিল হ'য়ে উঠেছে। কারণ আজকাল প্রত্যেক ছবি তোলবার সময় একাধিক ক্যামেরা ব্যবহার করার রীতি প্রচলন হয়েছে, ক্যামেরাও হালে সব বদ্‌লে গেছে। এখন Teiltng বা 'ঘুর্ণী-ক্যামেরাগুলো ছবি তোলবার সময় যেন 'ভানুমতীর খেল্' দেখাবার মতো নড়ে' চড়ে' উল্টে-পাল্টে ডিগ্‌বাজী খেয়ে ছবি নেয়! কাজেই, তাদের সঙ্গে সমান ভাবে তাল রেখে আলোর চালটি দিতে পারলে তবেই ছবির 'কিস্তি' মাত করে দেবার আশা থাকে, নইলে সব মাটি! আলো নিয়ে এমনিতর ছিনিমিনি খেল্‌তে পারা কেবল তাদেরই পক্ষে সম্ভব যারা আলোক-বিজ্ঞানে ধুরন্ধর! সঙ্গীতজ্ঞের কাছে যেমন কোনো গানের পদ প'ড়তে প'ড়তেই তার সুরের আভাসটিও মনের মধ্যে জেগে ওঠে, চলচ্চিত্রে সুদক্ষ আলোক-শিল্পীর কাছেও তেমনি গল্পটি প'ড়তে প'ড়তেই তার কোথায় কী আলো ব্যবহার ক'রতে হবে—সে রহস্য আপনিই উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে পড়ে—অবশ্য, যদি তাঁর সে সাধনা থাকে।

শোক-সংবাদ

পরলোকে ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়

বিগত ২২শে জানুয়ারী ১৯৩২, তারিখে ডাঃ প্রসন্নকুমার রায় হাজারীবাগে পরলোকগত হইয়াছেন। দীর্ঘ দিন শিক্ষা বিভাগে কাজ করিয়া তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮২ বৎসর হইয়াছিল। অবসর গ্রহণের পর হইতে পরলোক গমনের সময় পর্য্যন্ত তিনি হাজারীবাগেই ছিলেন। বিগত উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে সমস্ত যুবক বিদেশে গিয়া জ্ঞানসঞ্চয় করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া দেশের উন্নতিকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, ডাঃ পি, কে, রায় তাঁহাদের অন্যতম। ইনি প্রধানতঃ শিক্ষাদান এবং জ্ঞানচর্চ্চায়ই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত ইংরাজ মনীষী লর্ড হলডেন ডাঃ পি, কে, রায়ের সহপাঠী ছিলেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি গ্রহণ করিয়া ইঁহারা উভয়েই সমান নম্বর পাইয়া "ব্রাকেটেড" হইয়াছিলেন। লর্ড হলডেনের সহিত তাঁহার আজীবন বন্ধুত্ব ছিল। ভারতবর্ষে ফিরিয়া ডাঃ পি, কে, রায় পাটনা কলেজ, ঢাকা কলেজ এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপকের কাজ করেন। ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় এডুকেশনাল সার্ব্বিসে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিছু দিনের জন্য তাঁহাকে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত করা হইয়াছিল। স্যার আশুতোষ যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার ছিলেন, তখন ডাঃ পি, কে, রায় কিছু দিনের জন্য রেজিষ্ট্রার এবং কলেজ ইন্সপেক্টর হইয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা সরলা রায়ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার চেষ্টায় বিখ্যাত গোখলে মেমোরিয়াল গার্ল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পরলোকে যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র

ভাগ্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া যে সব বাঙ্গালী আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, যোগেন্দ্রনারায়ণ তাঁহাদের মধ্যে একজন। নদীয়া জেলায় রাণাঘাট সাব্‌ডিভিজনে গোঁড়পাড়া গ্রামে

সম্ভ্রান্ত মিত্র বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা রামপ্রসন্ন মিত্র মুর্শিদাবাদ জেলায় আখেরিগঞ্জে নীলকুঠীর দেওয়ান ছিলেন। এই আখেরিগঞ্জেই প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে যোগেন্দ্রনারায়ণের জন্ম হয়। সাত বৎসর বয়সে ইনি বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হন, এবং সেখান হইতেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে হুগলী কলেজে পরে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ-এ পড়িতে আসেন। এই সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় নানা দৈব দুর্ব্বিপাকে সাংসারিক অভাব-অনটনের মধ্যে পড়ায় তিনি কলেজ ছাড়িতে বাধ্য হন; এবং এই অল্প বয়সেই কলিকাতার কোন একটী স্কুলে শিক্ষকতার কার্য্য গ্রহণ করেন। কিন্তু শিক্ষকতার কার্য্য তাঁহাকে বড় বেশী দিন করিতে হয় নাই। ঘটনাক্রমে একদিন বর্দ্ধমান ষ্টেশনে তদানীন্তন সিবিলিয়ান লায়ান্‌স সাহেবের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। লায়ান্‌স সাহেব এই সময়ে কটকের সেটল্‌মেণ্ট অফিসার ছিলেন। প্রিয়দর্শন যোগেন্দ্রনারায়ণের কথাবার্ত্তা এবং আলাপ-কুশলতায় প্রীত হইয়া তিনি যোগেন্দ্রনারায়ণকে স্কুল মাষ্টারি ছাড়িয়া দিতে বলেন এবং পরে তাঁহারই অধীনে কটকের সেটল্‌মেণ্ট অফিসে হেড ক্লার্কের পদে নিযুক্ত করেন। এই কেরাণীগিরিও তাঁহাকে বেশী দিন করিতে হয় নাই। অক্লান্ত পরিশ্রমী যোগেন্দ্রনারায়ণ নিজের বুদ্ধিবলে ও কার্য্যকুশলতায় অল্প দিনের মধ্যেই এই কেরাণীগিরি হইতে অ্যাসিষ্টাণ্ট সেটল্‌মেণ্ট অফিসার, ডিপুটি কালেক্টার, রেভিনিউ সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট এবং পরে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের আণ্ডার সেক্রেটারী হন। এই পদ ইতিপূর্ব্বে I. C. S. ভিন্ন আর কোন ভারতবাসী পান নাই।

চাকুরী করিলেও যোগেন্দ্রনারায়ণ বরাবর স্বাধীনচেতা ছিলেন। তাঁহার ন্যায় মিষ্টভাষী ও সদালাপী লোক খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। একবার যে তাঁহার সংস্রবে আসিত, তাঁহার অমায়িক ও মিষ্ট ব্যবহারে সেই তাঁহার আপনার হইয়া যাইত। পরের উপকার করা তাঁহার যেন সহজাত প্রবৃত্তি ছিল। কাহারও কিছু উপকার করিবার সুযোগ পাইলে তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেন। তিনি নিজে সাহিত্যিক ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার সাহিত্যিক বন্ধু ছিলেন অনেক। তিনি প্রথম যৌবনে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি গান ও কবিতা "রবিচ্ছায়া" নাম দিয়া প্রকাশ করেন। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। তখনকার দ্বিজেন্দ্রলালের মজলিসে যে সব সাহিত্য-রসিক সাহিত্যচর্চ্চা করিতেন, যোগেন্দ্রনারায়ণ তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। দ্বিজেন্দ্রলাল যে ইভিনিং ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেন, সেই

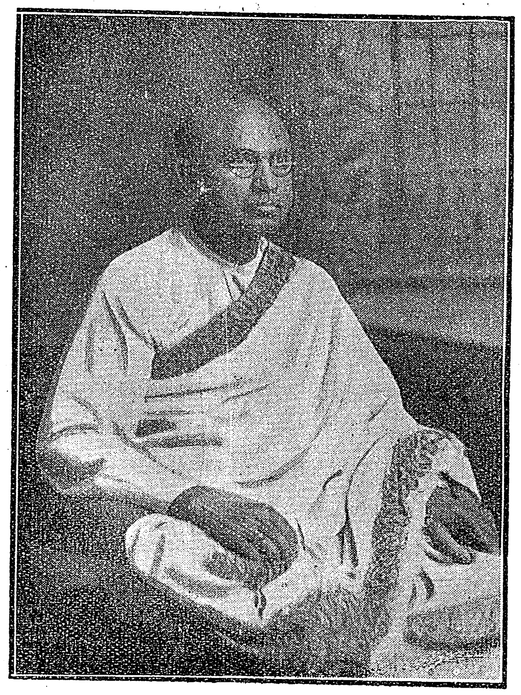

৺যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র

ক্লাবের সভ্যগণের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের সমবয়সী কেবল ইনিই এতদিন জীবিত ছিলেন।

যোগেন্দ্রনারায়ণ বিপত্নীক ছিলেন। পরিণত বয়সে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, কর্ত্তব্যে সদাজাগ্রত, কর্ম্মবীর, সামাজিক, সদালাপী—যোগেন্দ্রনারায়ণ পাঁচটি পুত্র, দুইটী কন্যা, জামাতা, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি সাজান সংসার রাখিয়া গত ২৮শে পৌষ, বুধবার, মধ্যরাত্রে হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে ইহলোক ত্যাগ করেন। যোগেন্দ্রনারায়ণের ন্যায় বন্ধু

হারাইয়া আমরা আত্মীয়-বিয়োগের ব্যথা অনুভব করিতেছি।

যোগেন্দ্রনারায়ণ বাবুর পরলোক গমন উপলক্ষে প্রসিদ্ধ কথা-শিল্পী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে কবিতাটী লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

আমার শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় যোগেন্দ্র-
নারায়ণ মিত্র মহাশয়ের উদ্দেশে—

তোমার শ্রদ্ধা পেয়েছি আমি—
তোমার নয়ন-মাঝে,—
যখনি হ'য়েছে দেখা—
সকালে কি সাঁঝে!
কাল্ মোরে খুঁজেছিলে,—
পাও নি ক' দেখা,
আজ আমি খুঁজি তোমা,—
রয়ে যাই একা!
দু'দিনের ভালবাসা—
রেখে গেলে জমা,
ঋণী হ'য়ে রহিলাম,
যাচি তাই ক্ষমা!

পৌষ সংক্রান্তি
১৩৩৮

অনুতপ্ত
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নেপালের পথে

শ্রীশ্রীপতি ঘোষ বি-এ, বি-ই

নবেম্বর ১৯২৩—নেপালের Engineer in charge of Buildings (সেখানের ভাষায় ঘরকাজ Engineer) এর পদ পাইয়া আমি প্রথম নেপালে আসি। নিয়োগপত্রে কোন্ পথে কি ভাবে আসিতে হইবে তাহার কতকটা আভাস পাই। কাশী হইতে Raxale রক্সৌলি পর্য্যন্ত রেলে। রক্সৌলি ষ্টেসন হইতে অল্প দূরে নেপালের সীমানা। নেপালের সীমানায় (Birgang) বীরগঞ্জ নামক স্থানে একজন নেপাল-রাজ্যের কর্ম্মচারী থাকেন। তাঁহাকে আসিবার পূর্ব্বে সংবাদ দিতে হইবে। তিনি যান-বাহনের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। নিয়োগপত্রে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। প্রথম দিন বীরগঞ্জ হইতে ভিচ্ছ্যাখোরে ১৮ মাইল। দ্বিতীয় দিন সেখান হইতে সুগারিটায়, তৃতীয় দিন সুগারিটায় হইতে কুসিখানি—মাঝপথে যান-পরিবর্ত্তন। চতুর্থ দিন কুসিখানি হইতে কাঠমাঁডু। নিয়োগপত্রে ইহাও জ্ঞাত করা হয় যে, পথে খাইবার মত রসদ পাওয়া নাও যাইতে পারে। পথের ব্যবস্থার এই উপদেশ পাইয়া ৬ই ডিসেম্বর বাড়ী হইতে রওয়ানা হইলাম। Time table দেখিয়া জানিতে পারিলাম যে, বেনারস হইতে রক্সৌলি প্রায় ২৫০ মাইল, যাইতে B. N. W. R.-এ ২৪ ঘণ্টা লাগিবে। ভটনি, গোরখপুর, নরকটিয়াগঞ্জ তিন জায়গায় গাড়ী বদল করিতে হইবে। পথে আহারাদির জন্য লুচি মিঠাই ও চাল ডাল তরকারি লইয়া রওয়ানা হইলাম। এ দেশের চাকর বামুন নেপালে যাইবে না; যাইলেও অত্যধিক বেতন দিতে হইবে ও তাহাতেও সুবিধা মত কায পাওয়া যাইবে না ভাবিয়া একাই যাত্রা করিলাম। কিন্তু বীরগঞ্জের হাকিম সাহেবকে পত্র লিখিলাম, যদি তিনি লোক স্থির করিয়া দেন বিশেষ উপকৃত হইব।

৭ই প্রাতে রক্সৌলি ষ্টেসনে পহুঁছিলাম। নরকটিয়াগঞ্জে গাড়ী বদল করিতে হইল না। যে গাড়ীতে আমি আসি সেটী সোজা দ্বারবঙ্গ হইয়া গঙ্গার ধার মোকামা ঘাটের উত্তর পর্য্যন্ত যায়। আসার সংবাদ দেওয়া সত্ত্বেও কোনও লোক ষ্টেসনে আসে নাই। যান—গরুর গাড়ী ও পুরাতন ধরণের পাটনাই এক্কা—সেগুলিরও অবস্থা শোচনীয়। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম বীরগঞ্জ ষ্টেসন হইতে ২ মাইল। একটি গরুর গাড়ী ১ টাকায় ভাড়া করিয়া তাহাতে মালপত্র রাখিয়া নিজে পদব্রজে বীরগঞ্জ অভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

অল্প দূর যাইয়া বীরগঞ্জের হাকিমের প্রেরিত একটি লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে বলিল সে আমায় লইয়া যাইবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু বিশেষ আবশ্যকীয় কাযে থাকায় যথাসময়ে পৌঁছিতে পারে নাই। ষ্টেসনে লোক থাকিবে না সেটা কতকটা আশা করিয়াই ছিলাম। এরূপ ক্ষেত্রে বিশেষ মান্যগণ্য লোক না হইলে কোনও রূপ সাহায্য পাওয়ার আশা দুরাশা মাত্র।

প্রায় আধ মাইলের পর নেপালের সীমা। সেখানে পহুঁছান মাত্র নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া রাহাদালি অর্থাৎ pass-port তলব হইল। আমার নিয়োগপত্র ভিন্ন অন্য pass-port ছিল না,—সেটী সঙ্গে পকেটেই লইয়াছিলাম। যে সিপাহী লইতে আসিয়াছিল সেও আমার পরিচয় দিয়া দিল। আরও প্রায় এক মাইল পরে গেষ্ট হাউস। সেখানে যাইবার পর সংবাদ পাইলাম যে, রাজগুরু আসিতেছেন; সুতরাং সেখানে স্থান হইবে না, ধর্ম্মশালায় থাকিতে হইবে। আরও প্রায় আধ মাইল পরে ধর্ম্মশালা। ইহা অল্প দিন হইল একজন মাড়ওয়ারি তৈয়ার করাইয়াছেন। নূতন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম চাকর পাচকের কোনও ব্যবস্থা করা হয় নাই। ধর্ম্মশালার একটি লোককে বলায় সে একটি কুলি ঠিক করিয়া দিল। কিন্তু যেখানে পাক করিবার ব্যবস্থা, সেখানে আমার মত অব্যবসায়ীর পাক করা চলে না। সুতরাং সঙ্গে যে লুচি ছিল তাহাতেই আহার শেষ করিয়া হাকিম সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তাঁহার আবাস ধর্ম্মশালা হইতে প্রায় আধ মাইল। সেইখানেই অফিস—পাহারার শান্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করায় দেখাইয়া দিল, তিনি একটি তাঁবুতে বসিয়া আছেন। দেখিয়া বোধ হইল উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। তাঁহার military পদ colonel,—শাসন হিসাবে জেলার Magistratseএর সমান পদ—বড় হাকিম পদের নাম। তাঁহাকে নিয়োগপত্র দেখাইলাম। তিনি বলিলেন যে যান-বাহনের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন। চাকর পাচকেরও ব্যবস্থা করিবেন বলিলেন বটে,—কথার ভাবেই বোধ হইল তাহা সম্ভব নহে। বাসায় ফিরিয়া আসার কিছুক্ষণ পরে একজন লোক কয়েকটি কুলি সঙ্গে করিয়া কি কি জিনিষ দেখিতে আসিল ও স্থির করিল ৪ জন কুলির আবশ্যক। বৈকালে সংবাদ পাইলাম যে পাঁচজন কুলি লাগিবে ও ২ জনের মজুরি ৬৲ টাকা হিসাবে আমায় দিতে হইবে। পরদিন সকালে ৫ জন কুলি ও ৪ জন কাহার ডুলি লইয়া উপস্থিত হইল। ডুলি চড়া এই প্রথম ও নিতান্ত হীন মনে হইল। ঘোড়া পাইব আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু উপায়ান্তর নাই দেখিয়া অগত্যা তাহাতেই রওয়ানা হইলাম। কুলি বাস্তবিক কিন্তু ৪ জনই লাগিল। যদিও আমার নিকট ৪ জনের ব্যবস্থা করিয়া ২ জনের পেয়াগী লইয়া গেল। কুলিকে এ দেশে ভারিয়া বলে,—জাতে ভোটদেশীয়। কাহার বেহারী। রওয়ানা হইতে প্রায় ৮টা বাজিল। তাহার পর বড় হাকিমের অফিসের নিকট—এ দেশে অফিসকে আড্ডা বলে,—আরও প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্ব হইল। কাহার ঘণ্টায় ২ মাইল কষ্টে চলে। পথে ক্রমাগত বক্সিস ও জল-খাবার পয়সার প্রার্থনা। ভারিয়াদের সঙ্গে একটি সিপাহীও আসিয়াছিল, বলিল—সে সঙ্গে যাইবার আদেশ পাইয়াছে। তাহারও এক কথা—জল-খাবারের পয়সা। এই ভাবে অতি মৃদুগতিতে নানা রকম ওজর আপত্তি সত্ত্বেও ঠিক সন্ধ্যার সময় ভিচ্ছাখোরে আসিয়া পহুঁছিলাম। শেষ ৮ মাইল নিবিড় বন। পহুঁছিয়া দেখিলাম বাঙ্গলাটীতে দুইটী ঘর। একটি অধিকার করিয়া আছেন একজন Colonel, অপরটিতে নানা রকমের ১৫।২০ জন লোক। Colonel সাহেবের চাকরকে বলায় সে মোটে আমলই দিল না। বাঙ্গলার চৌকিদারও কোনও রূপ সুবিধা করিয়া দিতে পারিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বয়ং জোর করিয়া Colonel সাহেবের ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাকে সমস্ত অবস্থা জানাইলাম। লোকটি আশাতীত ভদ্রব্যবহার করিলেন। তিনি একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী—রাজার আত্মীয়। পদ প্রায় Chief Engineerএর—রাস্তার চার্জ্জে,—পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। তিনি পাশের কামরাতেই থাকিবার অনুমতি দিলেন ও নিজের লোক দ্বারা পাক করাইয়া ভাতও খাইতে দিলেন। আমার লোকজন রাত্রি ১০টায় আসিয়া পহুঁছিলে তাহাদিগকে চটিতে থাকিতে বলিয়া দিলাম।

পরদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই হাত-মুখ না ধুইয়াই রওয়ানা হইলাম। পথ ছয় মাইল—একটি নদী অবলম্বন করিয়া নদীর গর্ভে গর্ভেই চলিয়াছে। চারিদিকে নিবিড়

বন। নূতন রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে। নদীর এক স্থানে ডুলি রাখিয়া প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া ও কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া আবার কাহারদের সহিত বকাবকি করিতে করিতে চলিলাম। প্রায় দুইটার সময় দ্বিতীয় বাঙ্গলা সুপারিটায় পহুঁছিলাম। ভাগ্যক্রমে বাঙ্গলা খালি ছিল ও স্থানটীও বেশ মনোরম। কিন্তু বাঙ্গলার চারি দিক বড়ই অপরিষ্কার। ভারিয়ারা সন্ধ্যার সময় আসিয়া পহুঁছিল। তাহার পর পাক করিয়া আহার করিলাম। একজন ভারিয়া জল আনিয়া দিল ও বাসন মাজিয়া দিল। ভিচ্ছাখোর হইতে এই স্থানটী ১৪ মাইল।

তৃতীয় দিন প্রত্যূষেই রওয়ানা হইলাম। এবারও পথ নদী অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে; কিন্তু এবার নদীর গর্ভে নহে, অনেক উপরে। মধ্যে মধ্যে লোহার Girder Bridge ও suspension bridge আছে। পথের উন্নতির চেষ্টা অনেক দিন হইতেই হইতেছে। এখনও অনেক পথ বাকি। ১০ মাইল যাইয়া ভীমফেরি (Bheemphedi)। এইখানে যান পরিবর্ত্তনের কথা। ১১টার সময় পহুঁছিলাম। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা দেখিলাম না। থাকিবারও স্থানাভাব। একটি বাঙ্গলা আছে—সেটী বাজার হইতে কিছু দূরে। নূতন যান-বাহনের আশায় সেটী ছাড়াইয়া আসিয়াছিলাম। সাধারণ লোকের থাকিবার স্থান ধর্ম্মশালা—এ দেশে শতল বা গোসল বলে—অতিশয় অপরিষ্কার ও বাসের অনুপযোগী। সাধারণ দোকানে থাকিবার নিয়ম আছে ও তাহার জন্য কোনও বিশেষ গোলমালও নাই। দোকানীর নিকট হইতে রসদ লইলেই বিনা ভাড়ায় থাকিতে দেয়। কিন্তু ভদ্রলোকের বাসের উপযোগী নহে। সেগুলিতে থাকা যুক্তিসঙ্গতও মনে হইল না। খুঁজিতে খুঁজিতে সংবাদ পাইলাম যে সরকারি একটি গুদাম আছে। সরকারী যাবতীয় মাল গো-গাড়ীতে এই পর্য্যন্ত আসে; এখান হইতে মানুষে বহিয়া লইয়া যায়। সেখানে সংবাদ লইয়া যান-বাহনের কোনও খোঁজ পাইলাম না। ঐ অফিসের একটি কর্ম্মচারী সংবাদ দিল যে আবশ্যক হইলে টেলিফোনে কাঠমাঁডুতে সংবাদ দেওয়া যায়। কিন্তু টেলিফোনের ফী দিতে হইবে। অগত্যা তাহাই করিলাম এবং ঐ লোকটির নির্দ্দেশ-অনুসারে গুদামের বারাণ্ডায় রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করিলাম। সন্ধ্যার সময় ডাণ্ডি ও দুইজন কুলি আসিয়া পহুঁছিল। তাহাদিগকে পথে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম আমায় লইতেই আসিয়াছে। বাজার হইতে লুচি আনাইয়া ও বাড়ী হইতে যে খাবার আনিয়াছিলাম তাহা খাইয়াই রাত্রি যাপন করিলাম। স্থির করিলাম কোনও মতে পরদিন কাঠমাঁডু পহুঁছিতে হইবে। পথে রাত্রি যাপন অতি কষ্টকর। কুলিদিগকে বক্‌শিস্ দিব বলায় তাহারাও স্বীকার করিল। পরদিন প্রত্যূষে রওনা হইলাম।

এইখান হইতে রাস্তা অত্যন্ত খাড়া ও দুরারোহ। গো-গাড়ীর পথ এইখানেই শেষ। যাবতীয় সামগ্রী এই ভীমফেদি পর্য্যন্ত গো-গাড়ীতে আসে ও এখান হইতে কুলি দ্বারা কাঠমাঁডু যায়। পথ অধিকাংশ স্থলে ২ফিট বা ৩ফিট যাইলে প্রায় ১ফিট উচ্চে উঠা হয়। আন্দাজ রোধ হয় প্রায় ২০০০ ফিট উঠিতে হয়। পথে একটি সেনা-নিবাস। মধ্যে মধ্যে দুর্গের প্রাকারের মত আছে, কিন্তু তাহা নাম মাত্র। স্থানটীর নাম চীসাগড়ী Cheesa Garhi অর্থাৎ শীতল গড়—এইখানে সমস্ত যাত্রীকে রাহদারি অর্থাৎ pass-port বা যাইবার অনুমতিপত্র দেখাইতে হয়। এবং বাক্স সিন্দুক বিছানা সমস্ত খুলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইতে হয়। নূতন জিনিষ থাকিলে তাহার মাশুলও দিতে হয়। যদিও আমায় বিশেষ কোনও কষ্ট পাইতে হয় নাই, কিন্তু জিনিষপত্র সমস্ত খুলিয়া দেখান বড়ই অসুবিধাজনক। কাগজে ও পুস্তকে এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাইতে যে Customs Barrierএর কথা পড়িয়াছিলাম এই তাহার প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয়। এখান হইতে প্রায় ৭০০।৮০০ ফিট উঠিয়া আবার নীচে নামিতে হয়। সে নামার পথও প্রায় উঠার মত খাড়া। প্রায় ১৷৷০ মাইল পরে অপেক্ষাকৃত সরল পথ। পথে যাইতে Wire Rope-way লাগাইবার চেষ্টার নিদর্শন দেখিলাম। ইহার দ্বারা মালপত্র লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা হইবে। স্থানে স্থানে তাহার লোহার ফ্রেম খাটান হইয়াছে। কিন্তু কায এখনও শেষ হয় নাই। দুই মাইল পরে একটি Suspension Bridge পার হইয়া পথ উচ্চ পাহাড়ের গায়ে গায়ে চলিল। পথ কোথাও মেরামত হইতেছে, কোথাও নূতন করিয়া তৈয়ার হইতেছে। স্থানে স্থানে মনে হয় বাহকের পা পিছলাইলে একেবারে ৫।৭ শত ফিট নীচে পড়িতে হইবে। কিন্তু এ সমস্ত জায়গায় চাষ-আবাদ হয়। জঙ্গল নাই বলিলেই হয়। স্থানে স্থানে

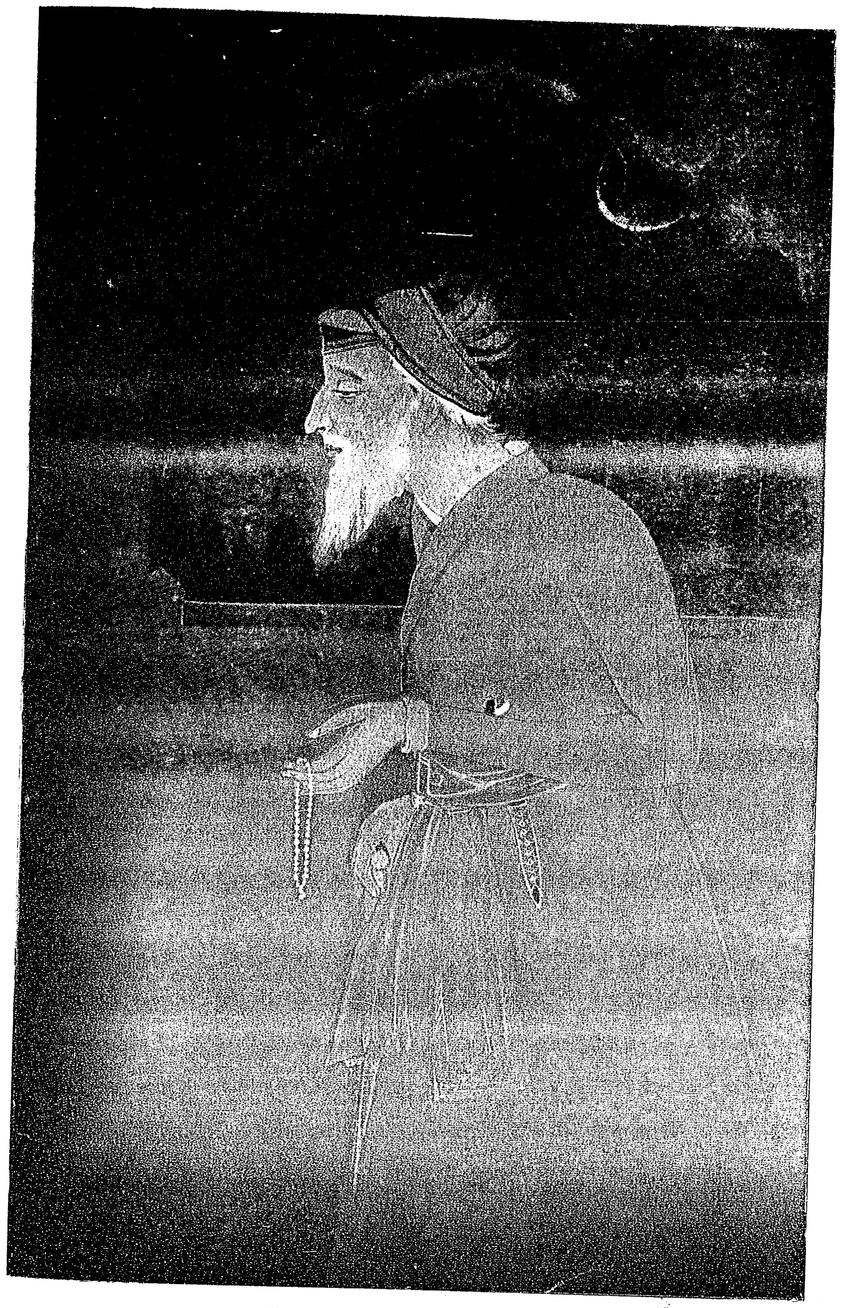

ইদের চাঁদ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সতিশচন্দ্র সাহা

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

চাষের সুবিধাও যথেষ্ট। পার্ব্বত্য ঝোরা অর্থাৎ প্রস্রবণ হইতে অনায়াসে সেচনের জন্য জল পাওয়া যায়। খাল কাটা হইয়া গিয়াছে—আবার দ্বিতীয় ফসলের চেষ্টা হইতেছে। মূলা অত্যন্ত সস্তা ও খুব ব্যবহৃত হয়। কুলিদের পথের খাদ্য মূলা ও চিড়া। পথের ধারে যাহাদের বাড়ী, তাহাদের প্রায় সকলেরই একটি করিয়া দোকান আছে। এই সকল দোকানে ভুট্টার ময়দার রুটি বড়, মটর ভাজা, চিড়া ও মূলা বিক্রয় হয়। কোথাও কোথাও এক প্রকার মাদক-জাড়ও বিক্রয় হয়। প্রায় ১০ মাইল পথ এইরূপ। সমস্তই আবাদী জমী—নূতনত্বের মধ্যে ভারতবর্ষের মত এক জায়গায় অনেকগুলি ঘর লইয়া গ্রাম হয় না। প্রায় সকলেই নিজের জমিতেই বাড়ী তুলিয়া বাস করে; সুতরাং গ্রামের মত ঘেঁস বসতি নহে। বাড়ীগুলি প্রায়ই দ্বিতল বা ত্রিতল। নীচে গরু, শূয়ার, মুরগি, ছাগল ইত্যাদি থাকে; উপরে চাষী নিজে থাকে। ঘরগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; কিন্তু আসপাশ অত্যন্ত নোংরা। ইহার পর প্রায় আধ মাইল আবার জঙ্গল ও পাহাড় উঠিতে হয়। এই পাহাড়ের (Chandragir) নাম চন্দ্রগিরি। যখন সর্ব্বোচ্চ স্থানে পহুঁছিলাম, তখন বেলা প্রায় ৪টা। এখান হইতে দূরে কাঠমাঁডু দেখা যায়। বেশ বড় সহর। এ স্থানটী প্রায় ৭৫০০ ফিট উচ্চ হইবে। অধিক হওয়াও অসম্ভব নহে। নীচে উপত্যকার নাম নেপাল—তাহার মধ্যে প্রধান সহর কাঠমাঁডু! উপত্যকাভূমির পরপারে আর এক শ্রেণী পাহাড়। তাহার উপর দিয়া হিমালয় দেখা যায়। সম্মুখে উত্তর দিকে যতদূর দেখা যায়—পর্ব্বতের উপরিভাগ বরফে ঢাকা। কোথাও একেবারে সাদা, কোথাও মধ্যে মধ্যে কালো পাহাড় দেখা যাইতেছে। চন্দ্রগিরি শিখর হইতে পথ নিম্নগামী—প্রায় সিঁড়ির মত নামিতে হয়। নামাল প্রায় ২০০০ ফিট হওয়া সম্ভব। স্থানটি খুব ঠাণ্ডা ও জঙ্গলপূর্ণ। পাহাড়ের নীচে একটি পল্লী—নাম (Thankot) থানকোট। কতকগুলি দোকান আছে। যখন নীচে পহুঁছিলাম, প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে ও কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছে। এখানে দোকানে বেশ ভাল দুধ দধিও বিক্রয় হইতেছে। দুধ প্রায় ভারতীয় মুদ্রায় ৶০-৶১০ সের। এখানে নামিবার পর কুলিরা বিশ্রাম করিয়া অল্প খাওয়া-দাওয়া করিল। যখন আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম তখন প্রায় অন্ধকার হইয়াছে। এখান হইতে কাঠমাঁডু ৬ মাইল। পথ বেশ প্রশস্ত ও ভাল অবস্থায়ই আছে। এখন ভাবনা—কোথায় গিয়া এই শীতের রাত্রে থাকিব। সমস্ত দিন আহারাদি ত হয় নাই। কুলিদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা বুঝিলাম, তাহাতে কোথায় থাকিতে হইবে সে সম্বন্ধে বেশ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না।—স্রোতের মুখে গা ঢালিয়া যাওয়ার মত চলিলাম। রাত্রি নয়টার পর কাঠমাঁডু পহুঁছিলাম। সহর তখন নিস্তব্ধ—কোথাও ২।১টী দোকান খোলা আছে। পথে বিদ্যুতের আলো। একটি নির্জ্জন জায়গায় একখানি বাড়ীর ধারে ডাণ্ডি নামাইয়া কুলিরা বলিল, এই বাড়ীতে আমাকে আনার আদেশ তাহারা পাইয়াছে। বাড়ীতে কোথাও সাড়াশব্দ নাই—আলো পর্য্যন্ত দেখা যায় না। একজন ভারি ডাকাডাকি করার পর সাড়া পাওয়া গেল। একটি লোক আসিয়া বলিল যে, বাড়ীর মধ্যের অংশে আমার থাকার জায়গা। সেই লোকটিকে জল আনিতে বলিলাম। আলো, জলখাবার ও বিছানা সঙ্গেই ছিল। সুতরাং তাহাকে ও কুলিদের বিদায় দিয়া আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম।

মহারাজের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ

যে বাড়ীতে নামিলাম, সেটীর তিন অংশ। এক ধারে একজন ডাক্তার ও অপর ধারে একজন মাষ্টার থাকেন। মধ্য-অংশ আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাড়ীটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ও নিতান্ত পুরাতন নহে। প্রতিবেশীরা দুইজনই বাঙ্গালী। পূর্ব্বরাত্রে যে লোকটি জল দিয়া গিয়াছিল, প্রাতে সেই আসিয়া জল দিয়া গেল ও বলিয়া গেল যে সে মাষ্টার-বাবুর চাকর। তিনি ২।৪ দিন পরেই যাইবেন। তাহার পর সে আমার কায করিতে পারিবে। আপাততঃ ২।৪ দিন দুই যায়গায়ই কায করিবে। রান্নাবাড়ার যোগাড়ও সে করিয়া দিবে; আবশ্যক হইলে রাঁধিয়াও দিতে পারে। মুখ হাত ধুইয়া প্রতিবেশীদের সহিত দেখা করিতে গেলাম। মাষ্টার মহাশয় তখনও উঠেন নাই।

দেখা করিতে বিলম্ব হইবে বলিয়া পাঠাইলেন। ডাক্তার বাবুর সহিত দেখা হইলে তিনি যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিলেন ও আহারাদির নিমন্ত্রণ করিলেন। বলিয়া গেলেন যে পর্য্যন্ত বামন চাকরের যোগাড় না হয় তাঁহার বাড়ীতেই আহারাদি হইবে। দুপুর বেলায় রাজবাটী হইতে সংবাদ আসিল যে, বৈকালে রাজদর্শনে যাইতে হইবে। কাশীর একটী লোক যাহাদের বাড়ী বামন চাকর প্রভৃতির জন্য লিখিয়াছিলাম, তিনি উচ্চপদস্থ; তাঁহার প্রতিপত্তিও আছে শুনিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার কোনও সাড়াই পাইলাম না। সুতরাং বৈকালে একাই রাজবাটী উপস্থিত হইলাম ও নিয়োগপত্র লইয়া অফিসের সন্ধান করিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া মহারাজকে জানাইলাম। কিছুক্ষণ পরে দর্শনের জন্য ডাক আসিল।

বিদেশীয় মাল আনাইবার জন্য এখানে একটী স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। তাহার নাম জিন্‌সী আড্ডা—বিদেশীয় লোকজন আনাইতে হইলেও এই অফিস বা আড্ডা মার্ফৎ ব্যবস্থা হয়। এই অফিসের একটী কর্ম্মচারী আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। প্রকাণ্ড রাজবাটী, সম্পূর্ণ আধুনিক ছাঁদে তৈয়ার হইয়াছে। তাহার একটি ঘরে সপারিষদ মহারাজ আসীন। ঘরে কেবল একখানি চেয়ার, তাহাতে মহারাজ বসিয়া আছেন, কর্ম্মচারী বা পারিষদ কেহ বা মাটীতে কেহ বা একটি বনাতের উপর বসিয়া আছেন, অনেকে দাঁড়াইয়াও আছেন। ঘরের দ্বারের কাছে জুতা খুলিবার আদেশ হইল। গিয়া সেলাম করিলাম। মহারাজের বয়স ৬০।৬১। পরিচ্ছদের বিশেষ কোনও আড়ম্বর নাই। কথাবার্ত্তায় বেশ Genial মনে হইল। বৈকালে নিয়মিত বাহিরে আসেন এবং সেই সময় অনেক রাজকার্য্যের আলোচনা ও অনেক মোকদ্দমারও শুনানী হয়। আমায় কি কাজ করিতে হইবে তাহার আভাস দিবার ও অন্য দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার অল্পক্ষণ পরেই যাওয়ার আদেশ পাইলাম।

কাঠমাঁড়ু

এই সহরের নাম একটী কাঠের বাড়ী, যাহা ধর্ম্মশালা রূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইতেই হইয়াছে। এখন রাজা গোরখা জাতীয়। প্রায় যে সময় ইংরাজ বাঙ্গলায় প্রবেশের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে গোরখালি দেশের রাজা এই উপত্যকাভূমি জয় করেন। তাঁহার পূর্ব্বে এ দেশ নেওয়ার জাতির রাজ্য ছিল। তাহাদের রাজধানী কাঠমাঁড়ুর অল্প দূরেই বাগমতী নদীর অপর পারে। এখনও পূর্ব্ব নাম পাটন চলিত; কিন্তু এখন কাঠমাঁড়ুর উপনগর মাত্র।

কাঠমাঁড়ু বাগমতী নদীর তীরে অবস্থিত। আরও দুই তিনটী নদী কাঠমাঁড়ুর নিকটেই বাগমতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। সকল নদীগুলিই বালুকাময়; বর্ষার সময় ২।৩ ফিট জল হয়; অপর সময় ১ ফুট জলও থাকে না। কোন কোনটী জ্যৈষ্ঠ মাসে একেবারে জলশূন্য হয়। বাগমতী নদীর ধারেই অধিকাংশ ঘন বসতি। কিন্তু আসিবার পথে যেমন, এখানেও সেই মত চারি দিকেই চাষ আবাদ ও লোকের বসতি। সমস্ত উপত্যকা বোধ হয় ১৫।২০ মাইল লম্বা ও ৫।৬ মাইল প্রস্থে। কাঠমাঁড়ু সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন স্থানে বাগমতীর ধারে;—বরাবর যতদূর দেখা যায় পাহাড়ের উপর পর্য্যন্ত চাষ আবাদ ও বাড়ী ছড়াইয়া রহিয়াছে। অনেক দূরে পাহাড়ের চূড়ার নিকট কতক জঙ্গল। উত্তর দিকে যতদূর দেখা যায় হিমালয়ের শুভ্র মূর্ত্তি। স্থানটী সমুদ্র হইতে প্রায় ৪৮০০ ফীট উচ্চ। Thacker's Directoryর হিসাবে ১৩৪৪৪২ জনের বসতি। গ্রীষ্মকালে Temp. ৮৪।৮৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত হয়। শীতকালে তুষারপাতও যথেষ্ট হয়। বৈশাখ মাস হইতেই জল ঝড় আরম্ভ হয়; বর্ষা প্রায় আষাঢ় মাস হইতে আরম্ভ হয়। অধিকাংশ বৃষ্টি রাত্রেই হয়। বেলা ৭টা-৮টা হইতে ২টা-৩টা পর্য্যন্ত অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টি হয়।

এখানকার অবস্থাপন্ন লোকেরা ভাত খায়; গরীবেরা ভুট্টার আটার রুটী ছাতুর ন্যায় জলে গুলিয়া অল্প তাতাইয়া খায়। ভারতবর্ষের ভরকারি প্রায় সকল রকমেরই পাওয়া যায়; কিন্তু আলুর চাষও অনেক, ব্যবহারও বেশী গরীবদের। জলখাবারের দোকানগুলিতে আলুর তরকারি, ফুটকড়াইয়ের মত এ দেশীয় এক রকম মটর ভাজা ও তেলে ভাজা ভুট্টার (এদেশে মকই বলে) আটার লুচি বা পিঠা ও সুপারির টুক্‌রা। সরু সরু কুচাইয়া সুপারি খাওয়ার প্রথা এ দেশে নাই। সিগারেট খাওয়া আছে বটে, কিন্তু খুব বেশী নহে।

তামাক ইতর ভদ্র স্ত্রীপুরুষ এমন কি সম্ভ্রান্ত মহিলারা পর্য্যন্ত সেবন করেন। হুঁকাগুলি প্রায়ই কদর্য্য, কিন্তু গরীবের কলিকাও কারুকার্য্যপূর্ণ ও হুঁকার হিসাবে অনেক বড়। এখানকার সকল শ্রেণীর লোকই অত্যন্ত মাংসপ্রিয়।

সচরাচর বেশভূষার পারিপাট্য মধ্যবিত্ত ও বড়লোকদের মধ্যে যথেষ্ট। বিলাতি সৌখীন রং-বেরংএর কাপড় এখানে খুব চলিত। মূল্যও কলিকাতায় ঠিক দ্বিগুণ বা ততোধিক। ভারবাহী কুলিদের পরিধেয় একটী কৌপীন, তাহার উপর নেপালী হিসাবের Double Breast খাকী জামা—প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত থাকায় লজ্জা নিবারণ হয়।—কোমরে প্রায়ই একটী কাপড় জড়ান থাকে, তাহাকে পটুকা বলে। ইহাতেই খুকরি হইতে যাবতীয় জিনিষ গুঁজিয়া রাখা চলে। মাথায় এক রকম টুপি, যাহা ভারতবর্ষে অন্য কোথাও দেখা যায় না।

চাষীরা অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন। তাহারা কৌপিনের বদলে পা-জামা পরে ও কোমরে আট দশ হাত লম্বা দেড় হাত চওড়া উলের একটী কাপড় জড়ায়। জামা পা-জামা অধিকাংশই মোটা সুতার—প্রায় খদ্দরের ন্যায়, দোহারা। শীতকালে ভুটে কুলিরা কম্বলের কোট গায়ে দেয়।

ভদ্রলোকেরা প্রায় এক একবার গেরুয়া রংএর বিলাতি কাপড়ের ন্যায় নয়নসুখ বা লংক্লথের সরু পাজামা ও জামা—সুরুয়াল ময়লপোষ পরে। কোমরে সাদা মখমলের পটুকা, তাহার উপর জমকাল রংএর ইংরাজি ফ্যাসানের waist-coat, তাহার উপর কোট। ছুতার কামার ইত্যাদিরও সাজসজ্জা আর্থিক অবস্থার চেয়ে উন্নত—অন্ততঃ ভারতবর্ষীয় হিসাবে। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন লোকের কাপড়ের ত কথাই নাই। ইংরাজি waist-coat, বুট, coat মোজা খুব চলিত। কিন্তু জামা পা-জামা নেপালি হিসাবের। সৈন্যবিভাগে motor chauffeurs capএর ন্যায় এক রকম টুপি অথবা নেপালি টুপি বা গোল felt মখমল বা রেশমের কারুকার্য্য-করা টুপি। Hatও চলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

স্ত্রীলোকদের পরিধেয়ে এখানকার এক বিশেষত্ব আছে—গরীবের মেয়েরাও ১৫।২০ হাতের কম কাপড় পরে না। কিন্তু সমস্তই কোঁচায় যায়। গায়ে একটি জামা ও বাহিরে যাইতে হইলে একটি চাদর—শীতকালে বালাপোষ। অবস্থাপন্ন হইলে কাপড় এক খানেও একখানা কুলায় না। তাহার নীচে আবার আধখান বা ততোধিক মাপের কাপড়ের পাজামা underwear। কিন্তু এ দেড়খান কাপড় সমস্তই কোমরের নীচে। যথাস্থানে ইহাকে রাখিবার জন্য স্ত্রীলোকদেরও পটুকা ব্যবহার চলিত। কাপড় অধিকাংশই উজ্জ্বল রংএর ছিট। গায়ে নেপালি জ্যাকেট বা আধুনিক Blous বা জ্যাকেট।—মাথায় কাপড় দেওয়ার প্রথা নাই। খোঁপা প্রায় অধিকাংশ স্থলে চূড়ার আকারে মাথার উপর; সীঁতা পিছনে। গহনা অধিক প্রচলিত নহে। কিন্তু পায়ে রূপার একগাছা করিয়া প্রকাণ্ড মল পরা আছে। কানে ছোট ছোট অনেকগুলি মাকড়ি—প্রায় সোনার। হাতে অধিকাংশ স্থলে কাঁচের চুড়ি,—রাজরাণীরও তাহাই। ক্বচিৎ ২।১ গাছি সোণার চুড়ি। স্ত্রীলোকদের Tolet ব্যাপারের ইয়োরোপীয়দের ন্যায় Powder, cosmetic ত আছেই—কাজল দিয়া ভ্রূ অঙ্কিত করা ও চোখ টানিয়া বাড়ান বৃদ্ধার পক্ষেও দূষণীয় নহে। মোজা ও রঙ্গিন বনাতের জুতা—সুতার sole—অবস্থাপন্ন স্ত্রীলোকমাত্রেই ব্যবহার করে। পারিলে সোনা রূপার কায করাও থাকে।

এখানে পর্দ্দা নাই। সুতরাং স্ত্রীলোকেরা—অবস্থাপন্ন ঘরেরও—বেড়াইতে যান। রাজ-অন্তঃপুরের কাপড়ের পরিসর কিন্তু কিছু কম ও অপেক্ষাকৃত মানানসই।

এ দেশের স্ত্রীপুরুষ সকলেই মাথায় ফুল গুঁজিতে বড় ভালবাসে। ৬০।৭০ বছরের কুলি স্ত্রী বা পুরুষ উজ্জ্বল রংএর ফুল দেখিলেই মাথায় গুঁজিবে। মাথায় ফুল না গুঁজিলে স্ত্রীলোকদের সাজ-সজ্জা যেন অসম্পূর্ণ থাকে।

গহনার প্রচলন খুব কম। শুনা যায় পূর্ব্বে ভারতবর্ষের ন্যায় এখানেও স্ত্রীলোকেরা গহনার চাপে ক্লিষ্ট হইত। কিন্তু এখন পায়ে রূপার 'মোটা মল' পরে। কানে সোনার সরু সরু মাকড়ি। উপর কানে ৮।১০টী করিয়া থাকে। অধিক অবস্থাপন্ন হইলে সেকেলে লোকেরা মোটা সোনার হার ও মাথায় প্রকাণ্ড ঢাকের ন্যায় এক প্রকার গহনা ব্যবহার করে। একেলেরা ইংরাজি ফ্যাশানের গহনা পরে। কাঁচের চুড়ি ও পুঁতির মালার

গোছা রাজ-গৃহ হইতে গরীব কাঙ্গাল সকলেরই অবশ্য আছে।

৩০।৪০ বৎসরের ভিতরে বাড়ী প্রায় সব কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের ধাঁজের হইয়াছে। পুরাতন বাড়ী অধিকাংশ কাঠ-প্রধান। গরীবের দরজা জানালাতেও খুব উচ্চ দরের কাঠের কারুকার্য্য দেখা যায়। প্রায় সকল বাড়ীই খোলার চালের; কিন্তু খোলাগুলি নূতন রকমের। চালের উপর কাদা প্রায় ২″।৩″ পুরু করিয়া লেপিয়া দিয়া তাহার উপর খোলা ঢাকা থাকে। বরগার উপর তক্তা, তাহার উপর কাদা, তাহার উপর খোলা। আজকাল Burn Co. ধরণের টাইলএর প্রচলন হইয়াছে। বাড়ীগুলির প্রায় পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে বড় জানালা বা অল্প একটু খোলা ছাদ থাকে—শীতপ্রধান দেশ হওয়ায় ইহা নিতান্ত আবশ্যক। ঘরগুলি প্রায়ই দোতালা তিন তালা—তালা অবশ্য ৭ ফুট হইতে ৯ ফুটের মধ্যে···এবং ভারতবর্ষের হিসাবে প্রশস্ত; কিন্তু অসম্ভব ময়লা ও নোংরা—মল মূত্রের বিচার নাই বলিলেই চলে। সুতরাং রোগের প্রাদুর্ভাব যথেষ্ট। ৮।১০টী সন্তান প্রায়ই হইয়া থাকে; ১৬।১৮টী ছেলে মেয়ের মা বাপও বিরল নহে। কিন্তু বসন্ত ওলাউঠা ও যক্ষ্মা নাই এমন ঘর নাই বলিলেও হয়।

এখানে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি হইতে লেপ গায়ে দেওয়া আবশ্যক হয়। অগ্রহায়ণের শেষ ভাগ হইতে তুষারপাত আরম্ভ হয়, কিন্তু বরফ কখনও পড়ে না। ফাল্গুন হইতে শীত কমিতে আরম্ভ করে; বৈশাখ মাসের শেষে লেপ ছাড়া চলে। বৃষ্টি প্রায় আষাঢ় হইতে আরম্ভ হয় ও আশ্বিনের শেষ পর্য্যন্ত থাকে।

রাজ্যশাসন

যে সময় ইংরাজ প্রথম বাঙ্গলাদেশে আধিপত্য বিস্তার করেন, প্রায় সেই সময় আজকালকার রাজবংশ কাঠামাঁডু উপত্যকা অধিকার করেন। তাহার পূর্ব্বে এই দেশ নেওয়ার জাতীয়দের ছিল। এখনকার রাজারা নিজেকে ক্ষত্রিয় ঠাকুর বলিয়া পরিচয় দেন। মন্ত্রীবংশ চিতোরের রাণা বংশীয় বলিয়া পরিচিত হইতে চেষ্টা করেন।—তাঁহাদের উপাধি রাণা। প্রধান মন্ত্রীর উপাধি মহারাজ। রাজাদের যাবতীয় উপাধি সাহা। রাজকীয় উপাধি মহারাজাধিরাজ ও চলিত কথায় শ্রী ৫ মহারাজ ও মন্ত্রী শ্রী ৩ মহারাজ। রাজকার্য্যে রাজাধিরাজের কোনও ক্ষমতা নাই। সমস্তই মন্ত্রী ও মন্ত্রীবংশের হস্তগত। কেবল চলিত মুদ্রায় তাঁহার নামাঙ্কিত; ও কোনও উৎসব ইত্যাদিতে তিনি দেখা দেন—ও রাজবেশে মন্ত্রী অপেক্ষা উচ্চ স্থান অধিকার করেন। কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন সম্পূর্ণ মন্ত্রীর ইচ্ছাধীন। কাঠামাঁডু পরিত্যাগ করিবারও অধিকার তাঁহার নাই। মন্ত্রীপদ মন্ত্রীবংশে থাকে বটে, কিন্তু মন্ত্রীপুত্র মন্ত্রী হয়েন না। সচরাচর নিয়ম—মন্ত্রীর পর তাঁহার চেয়ে বয়সে ছোট যে ভাই থাকিবেন তিনিই সেনাপতি ও Civil বা নিজামতি কাজ প্রধান মন্ত্রীর আদেশানুযায়ী করেন। প্রধান মন্ত্রীর মৃত্যুর পর ইঁহারই মন্ত্রী হওয়ার কথা। তাঁহার চেয়ে যে ছোট ভাই থাকিবেন তিনি তখন সেনাপতি ও উপমন্ত্রী হইবেন ও তাঁহার চেয়ে ছোট যদি ভাই থাকেন তিনি সেনা-বিভাগের অধিনায়ক হইবেন। যদি ছোট ভাই না থাকেন, তাহা হইলে সব চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ যে ভ্রাতুষ্পুত্র থাকিবেন তিনিই সেনানায়ক হইবেন।—অর্থাৎ উচ্চ পর্য্যায়ে কেহ জীবিত থাকিতে নিম্ন পর্য্যায়ে মন্ত্রীপদ আসিবে না এবং বয়স ও মন্ত্রীর নৈকট্য হিসাবে পর পর পদ পাইবেন।

১—মন্ত্রী
২—মন্ত্রীর ছোট ভাই
৩—তাঁহার ছোট ভাই—তাহা না থাকিলে ভাইপো
ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাজ্যশাসন militaristic বা সেনাপ্রধান। উপরিতম কর্ম্মচারী সকলেই বড় বড় সৈনিক পদবীযুক্ত। মন্ত্রীর নীচে তাঁহার ভাই—ভাই না থাকিলে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভাইপো সেনাপতি। তাহার নিম্নে ভাই বা ভাইপো প্রধান সেনানায়ক। তাহার নিম্নে ৪টী সৈনিক command—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম। ইঁহারা আপনা-আপন অধিকার মধ্যে সেনানায়ক ও শাসনকর্ত্তা। আপাততঃ এই নিয়ম বটে, কিন্তু নিয়মটী এখনও সুপ্রতিষ্ঠ বলিয়া বোধ হয় না। মন্ত্রীপদের জন্য অধিকাংশেরই হস্ত কলঙ্কিত। জোর যার মুলুক তার।

বড় বড় কর্ম্মচারীরা প্রায় সকলেই প্রধান মন্ত্রীর আত্মীয়—সকলেরই সৈনিক পদ আছে। ইঁহাদের অধীনে স্বয়ং

প্রধান মন্ত্রীর পরিচালনে রাজকার্য্য চলে। কর্ম্মচারী যত বড়ই হউন না কেন, বিশেষ ক্ষমতা কাহারও নাই। তাহার উপর গুপ্তচর সর্ব্বত্রই আছে; রাজকার্য্য প্রায় গুপ্তচরের সাহায্যে প্রধান মন্ত্রীর চালনায় চলিয়া থাকে। আর সকলে প্রায় figure-heads। সৈনিক পদেই লাভ ও সম্মান; সকলেরই চেষ্টা সেই দিকে—অন্ততঃ ক্ষত্রিয় বংশের। সেরেস্তার কায সমস্তই কিন্তু নেওয়ারদেরই হাতে। নামে তাহারা উচ্চপদস্থ না হইলেও কার্য্যতঃ তাহাদের ক্ষমতা যথেষ্ট ও লোকগুলিও বুদ্ধিজীবী; কিন্তু ক্ষত্রিয় মাত্রেই তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। সৈনিক-বিভাগে কেরাণীর কায ছাড়া অন্য কোথাও নেওয়ার নাই। মিস্ত্রী কারিগর ব্যবসাদারও প্রায় সবই নেওয়ার। তাহাদের মধ্যে অনেকে বেশ অবস্থাপন্নও বটে।

ক্ষত্রিয়েরা সরকারে গোর্খা বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহাদের পূর্ব্বের দেশ গোর্খা নামেই পরিচিত। সেখান হইতে আসিয়া তাহারা নেপাল অধিকার করে। তাহার পর আরও পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া ভোট দেশের কতক জয় করে। এই সমস্ত মিলিয়া যে দেশ, তাহাই নেপাল রাজ্য।

পূর্ব্বে ইঁহারা চীনের অধীশ্বরতা কতক অংশে স্বীকার করিতেন। চীনে একজন কর্ম্মচারী থাকিত ও বার্ষিক ১০,০০০৲ বেতন হিসাবে পাইতেন। চীন প্রজাতন্ত্র হওয়ার পর নেপাল তাহার অধিনায়কত্ব অস্বীকার করে।

বড় বড় কর্ম্মচারীদের সকলেরই বেতন নগদ টাকার পরিবর্ত্তে জমি। অনেক ছোট ছোট কর্ম্মচারী, কেরাণী ও সৈনিক পর্য্যন্ত টাকার পরিবর্ত্তে জমি পায়। সকলেই উহা নগদ বেতনের চেয়ে সম্মানের মনে করে।

মন্ত্রী মহাশয় যখন বেড়াইতে যান, তাঁহার গাড়ীর কোচ-বক্সে একজন colonel পদের সেনানী Rifle হাতে বসেন। পশ্চাতে সহিসের দাঁড়াইবার স্থানে একজন Captain Rifle লইয়া থাকে। সঙ্গে ২০ জন সশস্ত্র সিপাহী। গাড়ী যখন দৌড়ায় সিপাহীর দলও দৌড়িতে থাকে। রাজাবাসের নিকটেই রাজবাড়ীর প্রাচীর মধ্যে তাঁহার Body Guard সেনা, মায় machine gun থাকে। রাজবাড়ীর সমস্ত দরজার চাবি মন্ত্রীর নিজের কামরায় নিজের কাছে থাকে। যাতায়াতের দরজায় একজন শান্ত্রি পাহারা, কিন্তু তাহার হাতে বন্দুক নাই—একটি লাঠি মাত্র। সেই লাঠিটি আড় করিয়া আগোড়ের ন্যায় ফেলিয়া রাখে। কাহাকেও ভিতরে যাইতে হইলে শান্ত্রিকে বলিতে হয়। সে লাঠি তুলিয়া লইলে তবে ভিতরে যাওয়া চলে। সশস্ত্র শান্ত্রির পাহারা বাহিরের ফটকে।

রাজকার্য্যের সমস্ত খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত মন্ত্রীর হাতে। অন্য কর্ম্মচারীর কাজ প্রায় কেবল হুকুম পালন। হুকুম বলিলেই মহারাজের 'হুকুম' বুঝিতে হয়। অন্য কাহারও আদেশের পক্ষে হুকুম কথা বলার অধিকার নাই।

অধিকাংশ ছোটখাট রাজকার্য্য বৈকালে বাগানে বসিয়া মহারাজ করেন। পারিষদবর্গ বেষ্টিত হইয়া মহারাজ বসেন। পেশকার একটি একটি কাগজ শুনান ও মহারাজ হুকুম দেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য কথাবার্ত্তাও চলে। মহারাজের অর্থাৎ চন্দ্র সমশেরজঙ্গের একটি অসাধারণ ক্ষমতা—যে কয়েক বিষয়ের কথা একসঙ্গে চলে, সকলগুলির দিকেই তাঁহার মনোযোগ থাকে এবং প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই প্রশ্ন বা আদেশ করিতে পারেন।

জটিল রাজকার্য্যগুলি নিজের অন্দরে বসিয়া সমাপিত হয়। যে কর্ম্মচারীর উপস্থিত আবশ্যক হয়, তাঁহাকে সেখানে হাজির হইতে হয়।

মহারাজ চন্দ্রসমশের পরিশ্রমী অমায়িক দয়ালু ও বিচক্ষণ। সাজগোজ অহঙ্কার ইত্যাদি মোটেই নাই। খুব সূক্ষ্মদর্শী ও বিচক্ষণ। ইঁহার চেষ্টায় দেশের অনেক কুপ্রথা ও কদভ্যাস অপসারিত হইতেছে। এখানে এক দিকে দাসদাসী প্রথা, অন্য দিকে চরিত্রদোষ ঘটিলে প্রাণদণ্ড। তাহা আবার ইচ্ছা করিলে যাহার স্ত্রী সে নিজেই অপরাধীর মাথা কাটিবার আদেশ পায়। কিন্তু ইহাতেও চরিত্রদোষ যথেষ্ট আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে মহারাজ আদর্শ-চরিত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ফাঁসি প্রথা এখানে চলিত নাই। অপরাধীর মাথা কাটা হয়।

এখানে সেন্সস (census) ও বজেট Confidential সুতরাং আয়-ব্যয়ের হিসাব পাওয়া কঠিন। কিন্তু মোটের উপর প্রজার অবস্থা মন্দ বলিয়া বোধ হয় না। কাঠমাঁডুতে একটি কলেজ আছে। ইঞ্জিনিয়ারি ডাক্তারি ইত্যাদি পড়িবার জন্য দেশীয় ছাত্রদের ভারতবর্ষে পাঠান

হয়। ইংরাজি হিসাবে দুইটি বড় হাঁসপাতাল—একটি সিবিল ও একটি মিলিটারি—আছে। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ও আছে। সহরে Electric Light ও Elect ric কল-কব্জা আছে। কাঠমাঁড়ু হইতে ৭।৮ মাইল দূরে একটি পাহাড়ের ঝরণার সাহায্যে Electricity তৈয়ার হয়। এই Electricity'র সাহায্যে একটি Wire-ropeway চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। ইহার দ্বারায় কাঠমাঁড়ুতে মালপত্র আনিবার সুবিধা হইবে। সহরে কলের জলও আছে। পথঘাট যাহা কাঠমাঁড়ুতে আছে তাহা ভাল অবস্থাতেই। কিন্তু মফস্বলে যাতায়াত দুর্গম।

পণ্ডিত বীরেশ্বর পাঁড়ে

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

বাণীর সহিত কমলার, পাণ্ডিত্যের সহিত বদান্যতার সম্মিলন হইলে যে কি মধুর ফলোৎপত্তি হয়, পণ্ডিত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের জীবন তাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

যে বনগ্রাম মহকুমা এখন যশোহর জেলার অন্তর্ভুক্ত, পূর্ব্বে তাহা নদীয়া জেলার অংশ ছিল। সেই বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত কায়বা গ্রামে সন ১২৫১ সালের ৭ই বৈশাখ (১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রেল) বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি স্বর্গীয় মৃত্যুঞ্জয় পাঁড়ে মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। বীরেশ্বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম কেদারেশ্বর ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম শ্রীকৃষ্ণ।

বীরেশ্বরের পিতামহ কনকচন্দ্র সাধারণ্যে "কনক রাজা" নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহার আমলে একবার কোন ক্রিয়া উপলক্ষে তাঁহার বাটীতে লক্ষ ব্রাহ্মণের সমাবেশ হয়। সেই লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি অদ্যাপি তাঁহাদের বাটীতে রক্ষিত আছে। লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি লাভ বড় অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে। প্রচুর অর্থবল এবং প্রভূত সম্ভ্রম, সম্মান, প্রতিপত্তি ও সামাজিক মর্য্যাদা না থাকিলে যে সে লোকের পক্ষে এরূপ সৌভাগ্য লাভ করা সম্ভবপর নহে। কনকচন্দ্রের মৃত্যু হইলে তদীয় সহধর্ম্মিণী বিমলাসুন্দরী পতির সহমৃতা হন।

শৈশবকাল হইতেই বীরেশ্বরের ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া সকলেই বালকের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ জীবনে বীরেশ্বর আত্মীয়-স্বজনের আশা সফল করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার শিক্ষানুরাগ প্রকাশ পায়। তাঁহার বয়স্যগণ যখন ক্রীড়া-কৌতুকে নিমগ্ন থাকিত, বীরেশ্বর তখন শিক্ষকের সাহচর্য্য করিয়া নূতন কিছু শিক্ষা করিবার প্রয়াস পাইতেন। বীরেশ্বরের স্বাস্থ্য তেমন ভাল না থাকায় তিনি কলেজে বেশী শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পান নাই বটে, কিন্তু স্বভাবতঃ শিক্ষানুরাগ প্রবল থাকায় তিনি গৃহে নিজ চেষ্টায় প্রভূত জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন। যখন তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে পড়িতেন, তখন অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের ফলে তাঁহার শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। সেইজন্য তাঁহাকে কলেজ ত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতে হয়। আরোগ্য-লাভান্তে তিনি পুনরায় কলেজে যোগ দিতে উৎসুক হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে নিবারণ করিয়া গৃহেই সংস্কৃত অধ্যয়ন করিবার পরামর্শ দেন। তদনুসারে বীরেশ্বর এক দিকে কুলপুরোহিত মোহনচন্দ্র চূড়ামণির নিকট সংস্কৃত, এবং নিজ চেষ্টায় ইংরেজী অধ্যয়ন করিতে থাকেন।

সতের বৎসর বয়সে বীরেশ্বর সংস্কৃত লীলাবতী নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। বাইশ বৎসর বয়সে তাঁহার "আর্য্যচরিত" নামক ছাত্রপাঠ্য পুস্তক রচিত হয়। তাহার তিন বৎসর পরে তিনি ছাত্রদিগের জন্য "বিজ্ঞানসার" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

জ্ঞানার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বীরেশ্বরের হৃদয়ের প্রসারতা যেমন বাড়িতে লাগিল, জ্ঞান বিতরণেও তদ্রূপ তাঁহার মনে আগ্রহ জন্মিল। গ্রাম্য বালকগণের শিক্ষা লাভের অসুবিধা দেখিয়া বীরেশ্বর নিজ ব্যয়ে স্বগ্রামে একটি মধ্য ইংরেজী

বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। সেই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁহার নিজ গ্রামের এবং নিকটবর্ত্তী অপর কয়েকখানি গ্রামের বালকদিগের শিক্ষা লাভের সুযোগ উপস্থিত হইল। গ্রামবাসীদের বিশেষ সুবিধার কথা এই ছিল যে, এই বিদ্যালয়ে দরিদ্র ছাত্রগণকে বেতন দিতে হইত না।

বীরেশ্বর আজন্ম সাহিত্যসেবী ছিলেন। কেবল স্কুল-পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াই তাঁহার সাহিত্যসেবার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইত না। সেইজন্য তিনি তৎকালীন সাময়িক পত্রাদিতে বহু সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন। সেই সময়কার সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্র "আর্য্যদর্শনের" তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে "মানবতত্ত্ব" নামে তাঁহার দার্শনিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পরে যখন কলিকাতার ইউনিভারসিটীতে বাঙ্গালা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, তখন এই মানবতত্ত্ব বি-এ ও এম-এ ক্লাসে পাঠ্য পুস্তকের তালিকাভুক্ত ছিল। মানবতত্ত্ব বাহির হইবার পরেই তাহার যশঃসৌরভ সমস্ত বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পরে। মানবতত্ত্ব একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। তাঁহার অন্যান্য প্রবন্ধও প্রায় দর্শন সম্বন্ধীয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "অদ্ভুত স্বপ্ন বা স্ত্রী-পুরুষের দ্বন্দ্ব" নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। এটি সামাজিক নক্সা। বীরেশ্বর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, স্বধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা, শাস্ত্রানুগত সামাজিক প্রথায় তাঁহার প্রবল অনুরাগ; প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে স্নান-আহ্নিক, পূজা-পাঠ না করিয়া তিনি জলগ্রহণ করিতেন না। এদিকে প্রতীচ্য শিক্ষার প্রভাবে তখন হইতেই সমাজ-বিপ্লবের সূত্রপাত হইতেছিল। প্রতীচ্য আদর্শে স্ত্রীস্বাধীনতা প্রবর্ত্তনের সূচনাও তখন হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। বীরেশ্বর এই সমাজ-বিপ্লব ও স্ত্রীস্বাধীনতার পরিণাম কল্পনা করিয়া ব্যথা পাইয়াছিলেন, দিব্য নেত্রে উহার ভাবী উৎকট বীভৎস দৃশ্য দর্শন করিতে পারিয়াছিলেন। "অদ্ভুত স্বপ্ন" গ্রন্থে তিনি এই অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎ দৃশ্যের চিত্র অঙ্কনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

বীরেশ্বর একই সময়ে "সহচরী" "জাহ্নবী" ও "বিজ্ঞান-দর্পণ" এই তিনখানি মাসিকপত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই তিনখানি সাময়িক পত্রের একখানি ছিল কথাসাহিত্য-মূলক একখানি ধর্ম্মসাহিত্যমূলক এবং একখানি বিজ্ঞান-সাহিত্যমূলক। তিন ধরণের তিনখানি মাসিকপত্র একই সময়ে সম্পাদন করা বড় অল্প ক্ষমতার কাজ নহে।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বীরেশ্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে তিনি বিদ্যালয়-পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়নে অধিকতর মনোনিবেশ করেন; এবং ভারতীয় বরেণ্য লোকনায়কগণের চরিত্র অবলম্বন করিয়া ক্রমান্বয়ে "আর্য্যশিক্ষা", "আর্য্যপাঠ", "চারুশিক্ষা" ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ; এবং বালকদিগের নীতিশিক্ষার উপযোগী সংস্কৃতমূলক "নীতি কথামালা" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি শিশু ও বয়স্ক বালকদিগের উপযোগী দুইখানি বাঙ্গলা ব্যাকরণও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার "কবিতাপাঠ" ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ রচিত হয়।

মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র মহাকবি নবীনচন্দ্র সেনের "রৈবতক", "কুরুক্ষেত্র" ও "প্রভাস" এই গ্রন্থত্রয়কে ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। এই কাব্যত্রয়ে কবি ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের ও ঋষিগণের প্রতি কটাক্ষপাত করায় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বীরেশ্বর "ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত" নামে উহাদের এক বিস্তৃত সমালোচনা পুস্তক প্রকাশ করেন।

পাঁড়ে মহাশয়ের স্কুলপাঠ্য পুস্তকগুলির মধ্যে কয়েক-খানি উচ্চ প্রাথমিক, মধ্য বাঙ্গলা ও মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে অনেকবার পাঠ্য পুস্তক রূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। মধ্য বাঙ্গলা পরীক্ষা দিবার সময় আমরাও যেন তাঁহার কোন কোন পুস্তক পড়িয়াছিলাম বলিয়া মনে হয়। পাঁড়ে মহাশয়ের শেষ বাঙ্গলা গ্রন্থ ধর্ম্ম-দর্শন-বিষয়ক—"ধর্ম্ম-বিজ্ঞান" ও "ধর্ম্মশাস্ত্রতত্ত্ব"। এই দুইখানি গ্রন্থে তিনি অখণ্ডনীয় যুক্তির দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, প্রত্যেক মানুষেরই নিজ নিজ পৈত্রিক ধর্ম্ম পালন করা উচিত। মৃত্যুর অল্প কাল পূর্ব্বে তিনি তাঁহার "মানবতত্ত্বে"র ইংরেজী অনুবাদ "Man" নামে প্রকাশ করেন।

১২৮৫ সালে বীরেশ্বর পল্লীবাস ত্যাগ করিয়া কলিকাতাবাসী হইয়াছিলেন। কলিকাতার বস্ত্র-ব্যবসায়ী-দিগের মধ্যে অনাচার দর্শন করিয়া তিনি অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিতেন। তিনি দেখিতেন বস্ত্রের ব্যবসায়ীরা বস্ত্রের ন্যায্য মূল্যের অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্য ক্রেতাদিগকে ঠকাইয়া লইয়া থাকে। ইহা যেমন দুর্নীতি-

মূলক, তদ্রূপ, ক্রেতাদের পক্ষে ক্ষতিকর এবং বস্ত্র-ব্যবসায়ের পক্ষেও অনিষ্টকর বটে। এই কারণে, এবং প্রধানতঃ স্বদেশী শিল্পের প্রতি অনুরাগ বশতঃ, বীরেশ্বর কলিকাতায় ৬১নং কলেজষ্ট্রীটে "নববাস" নামে একখানি স্বদেশী বস্ত্রের দোকান খুলেন। এই দোকানে তিনি ন্যায্য মূল্যে এবং একদরে বস্ত্র বিক্রয় করিতেন। সেই হইতে কলিকাতায় "একদরে" বস্ত্রাদি ও অন্যান্য বস্তু বিক্রয়ের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এদিকে, তিনি স্বয়ং সাহিত্যিক বলিয়া দোকানখানি সাহিত্যিকগণের বিশেষ আকর্ষণের স্থল হইয়া উঠে, এবং ক্রমে কলিকাতার প্রধান প্রধান বিদ্বন্মণ্ডলীর মিলন স্থানে পরিণত হয়। স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী"তে যেমন পণ্ডিতগণের সমাগম হইত, বীরেশ্বর বাবুর "নববাস"ও তদ্রূপ পণ্ডিত-সমাগমে মুখর থাকিত। এখানে প্রত্যহ অপরাহ্ণে বিদ্যাসাগর মহাশয়, ভূদেববাবু, রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়, কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় এবং আরও অনেকে নিত্যই আগমন করিতেন, এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ, শিল্প, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় পাঁড়ে মহাশয়ের তর্কশক্তি দর্শনে তাঁহাকে "নৈয়ায়িক" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

কায়বা গ্রামের পাঁড়ে বংশ চিরদিন অতিথিবৎসল, এবং বদান্যতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বীরেশ্বর বাবুর কলিকাতার বাটীতেও সদাব্রত ছিল—অতিথি আসিয়া কখনও বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যাইত না। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয় পিতার সদ্‌গুণ-রাশির উত্তরাধিকারী হইয়া পিতৃ-অনুষ্ঠিত সদাব্রত তাঁহার গোয়াবাগানষ্ট্রীটের বাটীতে পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়াছেন।

বীরেশ্বর বাবুর গ্রামের বাটীতে বার্ষিক দুর্গোৎসব প্রভৃতি পূজা পার্ব্বণ হইত। নানা গোলযোগে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। পৈত্রিক পূজা বন্ধ হওয়ায় বীরেশ্বরবাবু মনঃক্ষুণ্ণ অবস্থায় থাকিতেন। অবশেষে মহামায়ার কৃপায় তাঁহার সে ক্ষোভ দূর হয়—বিডন ষ্ট্রীটের বাটীতে পুনরায় দুর্গোৎসব আরম্ভ হয়।

৺কাশীধামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার সাধ তাঁহার বহু দিন হইতেই ছিল—মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্যও শেষ হইয়াছিল, কিন্তু বীরেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে পারেন নাই। সন ১৩১৮ সালের ২৬শে ফাল্গুন বীরেশ্বর ৺কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের চরণে আশ্রয় প্রাপ্ত হন।

অগাধ পাণ্ডিত্যে, দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় এক দিকে যেমন তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, পক্ষান্তরে, ভূস্বামীজনোচিত উদার প্রকৃতি এবং অপরাপর সদ্‌গুণ-রাশিতে তাঁহার চিত্ত ভূষিত ছিল। জনহিতকর বহু সদনুষ্ঠানের অভিপ্রায় তাঁহার ছিল। কিন্তু তাঁহাদের জমিদারী বহুধা বিভক্ত হইয়া যাওয়ায় এই সকল মহৎ কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় ছিল না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয় থিয়েটার ও অন্যান্য ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতে থাকিলে বীরেশ্বরবাবু তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় পুত্রের নিকট প্রকাশ করেন। পিতৃগতপ্রাণ মনোমোহন অবিলম্বে পিতার সদভিপ্রায় পরিপূরণে যত্নবান হইলেন। তিনি প্রথমে ৺কাশীধামে একটি শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ভাগ্যক্রমে পিতার জীবদ্দশায় মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে নাই।

শিবমন্দির নির্ম্মাণ ব্যতীত, মনোমোহন বাবু পিতার অভিপ্রায়ানুযায়ী নিম্নলিখিত দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন—

১। যশোহর জেলায় বীরেশ্বর বিদ্যাপীঠ নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই টোলে ২০টি ছাত্রকে মাসিক ৮৲ হিসাবে বৃত্তি প্রদত্ত হয়। এতদ্ভিন্ন সমস্ত ছাত্রকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া ও বাসস্থান দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ৮।১০ বৎসর হইতে এই অনুষ্ঠানটি ভালভাবে চলিতেছে।

২। বীরেশ্বরের স্বগ্রাম (কায়বা গ্রাম যশোহর) পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে; তাহার নাম বীরেশ্বর দাতব্য চিকিৎসালয়। চিকিৎসকের পারিশ্রমিক, দরিদ্র রোগী-দিগকে বিনামূল্যে ঔষধাদি প্রদান প্রভৃতি ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বাৎসরিক পাঁচ হাজার টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি ইহার জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

৩। কলিকাতার যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ

বিদ্যালয় সংলগ্ন আয়ুর্ব্বেদীয় হাসপাতালে বীরেশ্বর ওয়ার্ড নামে একটি ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠা করিয়া ২০টি শয্যার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহার খরচ নির্ব্বাহের জন্য বাৎসরিক ৫ হাজার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন হাসপাতালের গৃহ-নির্ম্মাণ ও আসবাবপত্রাদিতে বহু টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

৪। ৺কাশীধামে বীরেশ্বর-ভবনে নিত্য চণ্ডীপাঠ শিবপূজা, পাঠ, হোম, ব্রাহ্মণ-সেবা প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়াছে।

৫। ৺কাশীধামে বাঙ্গালী তীর্থযাত্রীদের বাসের জন্য লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে "বীরেশ্বর ধর্ম্মশালা" নামে একটি আশ্রয়-স্থান প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৬। জনসাধারণের জলকষ্ট নিবারণার্থ যশোহর, খুলনা ও ২৪ পরগণা জেলায় বহু পুষ্করিণী ও টিউবওয়েল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ১২ মাসে ১৩ পার্ব্বণ প্রভৃতিধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু গৃহস্থের উপযোগী সকল প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা ত আছেই।

৭। মনোমোহন বাবুর কলিকাতাস্থ গোয়াবাগান বাটীতে ১৫।১৬টি ছাত্রের আহার ও বাসস্থান দিয়া তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন এবং এই সমস্ত কার্য্য তাহার পিতার জীবনকাল হইতেই চলিতেছে।

উত্তরকালে এই সমস্ত কার্য্য যাহাতে সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহিত হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের ৫৯।১, ৫৯।২, ৫৯।৩, ৬০, ৬০।১, ৬০।২ ও ৬০।৩ এই সাতখানি বাটী রেজিষ্ট্রীকৃত দলিলের দ্বারা উপযুক্ত ট্রাষ্টীগণের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। এই সমুদয় ভূসম্পত্তির আনুমানিক মূল্য—৪ লক্ষ টাকা।

ভারতবর্ষ

শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায় বি-এ

তব পুণ্য-পীযূষ-সরিতে মগ্ন হর্ষ-পুলক চিত্ত
তব জ্ঞান-গরিমা শিল্পকলাদি লভেছি কতই বিত্ত।

তব গঙ্গাপুলিন স্বর্ণরেণুকা স্পর্শন পূত বক্ষে
কত রঞ্জিত নব সুন্দর ছবি নিত্য নেহারি চক্ষে!

কভু না জানি বা কোন ধ্যানে
রহি চাহিয়া আকাশ পানে;
হ'য়ে জাগ্রত চিত শঙ্কিত কেন হিয়া দুরু-দুরু রিক্ত!

কত লক্ষ তরণী ছুটিছে সঘনে জাহ্নবীজল চুমিয়া
সৈকতে কত নর্ত্তনরত শোভিছে ময়ূর ভ্রমিয়া

তব শ্যামল গোষ্ঠভূমে—
তব চরণ-প্রান্ত চুমে—
আমি ধেয়ান-নিরত তাপসের মত আনন্দে রহি বসিয়া।

কত রম্য হর্ম্ম্য-শোভিত নগর কটিতে মেখলা লগ্ন—
তাহে রত্নখচিত মন্দির শত দীপ্ত আলোক-মগ্ন।
কত অভ্রপ্রসারি ভীম গিরিচূড়া গৌরব ভরে উচ্চ
প্লাবিত চন্দ্র সূর্য্য কিরণে মণ্ডিত হিম পুচ্ছ।

তব সাম-নিনাদিত স্তোত্র পঠন ঘন মুখরিত বনমাঝে
কত অজিনাম্বর সৌম্য মূরতি যোগীজন রত রাজে!
সেই পুণ্য হোমানল-শিখা নিঃসৃত ধূম বিভূষিত অঙ্গ—
যুক্ত কর-যুগ কল্যাণ যাচে কল্যাণ নটরঙ্গ।

সাময়িকী

বাঙ্গালা-সরকারের ইস্তাহার—

আইন লঙ্ঘন আন্দোলনে যে কোন প্রকারেই হউক সাহায্য করিলে আইনের চক্ষে কি অবস্থা দাঁড়ায় তৎসম্বন্ধে জনসাধারণের অবগত্যর্থ বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট নিম্নরূপ ইস্তাহার জারী করিয়াছেন—

সাধারণ আইন বা বিশেষ অর্ডিন্যান্স বলে যাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়, তা ছাড়া এমন কতকগুলি বিষয় আছে যাহা সর্ব্বসাধারণের জানা দরকার।

(ক) ১৯০৮ সালের সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (১) ধারায় লিখিত আছে যে, যদি কেহ বে-আইনী সমিতিকে বা উহার কার্য্যকে কোনরূপে আর্থিক সাহায্য করে বা ঐ জন্য আর্থিক বা অন্য কোনরূপ সাহায্য গ্রহণ করে তবে সে আইনানুসারে দণ্ডিত হইবে। নিখিল ভারত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি এবং স্থানীয় বহু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। যদি ১৭ (১) ধারার আইনের সর্ত্ত পড়ে, তবে আইন লঙ্ঘন আন্দোলন সম্পর্কে যে কোন প্রকার সাহায্য তাহা তাহার কার্য্যপদ্ধতি কার্য্যে পরিণত করার কল্পেই হউক বা পরোক্ষভাবে উহার প্রচারে সাহায্য করে বা আর্থিক সাহায্য বা উহার কোনরূপ অনুষ্ঠানাদির সাহায্য করে তাহা হইলে সরাসরি ভাবেই উহা অভিযোগের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(খ) জরুরী ক্ষমতাবিষয়ক আইনের ৪ ধারায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে কতকগুলি ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ঐ সমস্ত ক্ষমতা বাঙ্গলার সমস্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলিকাতার পুলিশ কমিশনারদের হাতে দেওয়া হইয়াছে। উহার বলে তাঁহারা আন্দোলন দমন করিতে পারিবেন, বা যদি কাহারও আচরণ এরূপ বলিয়া বিবেচিত হয় যে, সে জনসাধারণের শান্তি বা নিরাপত্তার ব্যাঘাতজনক কোন আন্দোলনের সম্প্রসারণ কল্পে কোন কাজ করিয়াছে বা করিতেছে বা করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাকেও শাসন করিতে পারিবেন এবং ইহার বলে কাহারও নিকট বা অধীনে যদি কোন সম্পত্তি থাকে তবে তাহার সম্বন্ধেও আদেশ দেওয়া চলিবে।

(গ) জরুরী ক্ষমতাবিষয়ক অর্ডিন্যান্সের ১৩ ধারা অনুসারে যে কোনও সরকারী কর্ম্মচারী আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা কল্পে দরকার বোধ করিলে বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিদের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবেন। ঐ আদেশ অমান্য করিলে উক্ত অর্ডিন্যান্সের ২২ ধারা মতে দণ্ডার্হ হইতে হইবে।

এরূপ জানা গিয়াছে যে, বর্ত্তমান আইন লঙ্ঘন আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে কোন কোন ফার্ম্ম এরূপ এক প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন যাহাতে লেখা আছে যে, ফার্ম্মের পরিচালনা সম্পর্কিত কোন ব্যক্তি জাতীয় আন্দোলনের পরিপন্থী কোনরূপ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারিবে না বা ভারত সরকারের পক্ষে বা নির্দ্দেশানুসারে বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কোনরূপ কার্য্য যাহা আন্দোলনের পরিপন্থী তাহা করিতে পারিবে না। এই প্রকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবিক পক্ষে আইন লঙ্ঘন আন্দোলনের ন্যায় অবৈধ ও বে-আইনী। আন্দোলনের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করাতে কাহারও সাধারণ কর্ত্তব্যের বিঘ্নজনক হইবে না; বা আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য জরুরী ক্ষমতাবিষয়ক অর্ডিন্যান্সের ১৩ ধারায় উল্লিখিত শ্রেণীর কাহাকেও বিশেষ বাধ্যবাধকতার জন্য সাহায্যার্থ আহ্বান করিলে ঐ প্রতিশ্রুতি কোনরূপে অন্তরায় হইবে না।

(ঘ) জরুরী ক্ষমতাবিষয়ক অর্ডিন্যান্সের ১৬ ধারার বলে যে কোন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রেলওয়ে ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবেন। বিশেষ ভাবে কোন নির্দ্দিষ্ট মাল কোন রেল কোম্পানীকে না লওয়ার জন্য আদেশ দিতে পারিবেন।

(২) বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতার্থ এ কথা পরিষ্কার ভাবে জানাইতেছেন যে, যাহারা আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিবে বা সাহায্য করিবে কেবলমাত্র তাহাদের পক্ষেই পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতাগুলি ব্যবহৃত হইতে পারিবে, পক্ষান্তরে যাহারা আইন মানিয়া চলে তাহাদের

পক্ষে ঐ সমস্ত আইনের জন্য কোন আশঙ্কার কারণ নাই। অরাজকতার হাত হইতে রক্ষাকল্পে এবং ব্যবসা বাণিজ্য স্বাধীন ভাবে চলার সৌকর্য্যার্থ জনসাধারণকে সাহায্য করার জন্য ঐগুলি ব্যবহৃত হইবে।

সংবাদপত্রের প্রতি নির্দ্দেশ—

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত ডেপুটী সেক্রেটারী মিঃ বি, আর, সেন বাঙ্গলা দেশের যাবতীয় সংবাদপত্রের সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশকদিগকে নিম্নলিখিত সরকারী ইস্তাহার সম্বন্ধে অবহিত হইতে বলিয়াছেন।

ইস্তাহারে প্রকাশ, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী ও অন্যান্য বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশিত করিলে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইবে।

যে সকল বিষয় সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশ করিলে আইনানুযায়ী দণ্ডনীয় হইতে হইবে, নিম্নে তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

১। কংগ্রেস আন্দোলন সম্পর্কিত যে কোন সংবাদ ও ধৃত ব্যক্তিগণের বাণী।

২। জেলে আবদ্ধ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত সমাচার।

৩। গবর্ণমেণ্ট বা সরকারী কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে উগ্র সমালোচনা।

৪। কোনও রাজনীতিক ঘটনার অতিরঞ্জিত বিবৃতি। কোনও রাজনীতিক সংবাদের শীর্ষস্থিত লিখনাদির বাগাড়ম্বর। কোনও সংবাদ পাশাপাশি এরূপভাবে সাজান যাহা হইতে আইন লঙ্ঘন আন্দোলনের সহায়তা হইতে পারে বা দেশবাসীর মনে চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়।

৫। আইন লঙ্ঘন আন্দোলনের সহায়ক যে কোনও বিজ্ঞাপন বা সংবাদ প্রকাশ।

৬। কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদানকারী যে কোনও ব্যক্তির ফটো বাহির করা।

১লা বৈশাখ—

প্রতি বৎসরের পয়লা বৈশাখ সরকারী ছুটীর দিন বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন উঠিয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে বিভিন্ন জিলার মত লইয়া যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়াতে প্রস্তাবটী প্রত্যাহার করা হয়। সম্প্রতি কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন যে পয়লা বৈশাখ অতিরিক্ত ছুটীর দিন বলিয়া ঘোষিত হইল। কিন্তু ইহাতে বৎসরের সাধারণ সাত দিন অতিরিক্ত ছুটীর যে ব্যবস্থা আছে, তাহার সংখ্যা বাড়ানো যাইবে না; অর্থাৎ প্রত্যেক জিলায় যে সাত দিন ছুটী দেওয়া হইত তাহারই একটি ছুটী বন্ধ করিয়া পয়লা বৈশাখের ছুটীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। জিলাগুলি তাঁহাদের সুবিধা মত কোন ছুটী বন্ধ করিবেন, তাহা নিজেরা স্থির করিবেন। বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরী ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া এই ব্যবস্থাটী কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন বলিয়া তিনি সকলের ধন্যবাদার্হ।

রবীন্দ্রনাথ ও ছাত্রগণ—

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাত্রদের উদ্দেশে নিম্নলিখিত বাণী প্রচার করিয়াছেন,—

"আমাদের ইতিহাসের এই সঙ্কটপূর্ণ সময়ে ছাত্রগণ আমার নিকটে একটি বাণী দাবী করিতে আসিয়াছে। আমি ঐ বাণী পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি; এক্ষণে কেবল উহার পুনরুক্তি করিতে পারি। বর্ত্তমান অবস্থায় সরকার যে নীতি অবলম্বন সমীচীন বলিয়া মনে করেন, উহা পরিণামে অনিষ্টকর। গঠনমূলক স্থায়ী ও মৌলিক পন্থা অনুযায়ী দেশের সেবা করিবার জন্য আমাদিগকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কাজ করিতে হইবে। আমাদিগকে ঐ সেবা ও আত্মশুদ্ধি হইতে বঞ্চিত করিবার অধিকার কোনও শক্তির নাই। যে শান্ত শক্তি আপনার সম্পদ বালকোচিত আবেগ ও আত্মা অবনতিকর বিষয়ে ব্যয় না করিয়া নীরবে আপন কার্য্য সম্পন্ন করে, আমরা নৈরাশ্য হইতেই ঐ শক্তি লাভ করিব।"

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বড়লাট—

বিগত ২৫শে জানুয়ারী ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের উদ্বোধনী বক্তৃতায় মাননীয় বড়লাট বাহাদুর যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন, নিম্নে তাহার কয়েকটী বিষয় ভাষান্তরিত করিয়া দেওয়া হইল।

(২) কৃষির অবস্থা—

কৃষি বিষয়ক অবস্থার উল্লেখ করিয়া বড়লাট বলেন, কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য কিছু বাড়িয়াছে; ইহা বড়ই সুখের কথা। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহ কৃষকদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া কাজ করিতেছেন। যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট মোট চারি কোটি টাকারও অধিক খাজনা কমাইয়া দিয়াছেন। পঞ্জাবে গত খারিফ শস্যের মরসুমে ৪৬ লক্ষ টাকা খাজনা রেহাই করিয়াছেন। কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ভারতের সর্ব্বত্র কৃষি বিষয়ে মঙ্গলকর বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।

(২) আর্থিক অবস্থা—

গত সেপ্টেম্বর মাসে আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বড়লাট যে পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন—"আমাদের অসুবিধা এখনও অনেক রহিয়াছে বটে, কিন্তু কৃতিত্বের সহিত অনেক অসুবিধা উত্তীর্ণ হইয়াছে, যে আশা আমরা তখন করিতে সাহসী হই নাই।" বাজেট সম্বন্ধে ব্যয়সঙ্কোচ কমিটীর কার্য্যাবলীর উল্লেখ করিয়া বড়লাট বলেন,—"পৃথিবীতে কোন গবর্ণমেণ্ট ব্যয়সঙ্কোচ সম্পর্কে বিবেচনার ভার ব্যবস্থা পরিষদের হস্তে এতটা ছাড়িয়া দেন নাই বা জনপ্রতিনিধিগণের প্রস্তাব সমূহ এতটা অধিক কার্য্যে পরিণতি করেন নাই।"

(৩) রাজস্ব বিল—

অতঃপর বড়লাট বলেন, "গত সেপ্টেম্বর মাসে যে আনুমানিক আয়ব্যয় ধরা হইয়াছে, তাহার সংশোধন বা পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় কোন পরিবর্ত্তন বা নূতন কর ধার্য্য করা সম্বন্ধে ভোট দিবার জন্য পরিষদকে অনুরোধ করা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত হইবে না। পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনে কোন নূতন রাজস্ব বিল সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করা হইবে না।"

সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে বড়লাট বলেন,—"আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে,—ভারতে আমাদের আর্থিক অবস্থা পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশের তুলনায় ভাল। ভারতীয় পণ্য বিদেশের বাজারে এখনও স্থান পাইতেছে। ভারতীয় শিল্প এখনও প্রসারিত হইতেছে। কাপড়ের কলসমূহ বাড়িতেছে এবং সঙ্গত পরিমাণ লাভ রাখিয়া কাজ চালাইতেছে। ভারতে চিনি শিল্প সম্প্রসারণের আমি চিহ্ন দেখিতেছি। গত দুইটি রাজস্ব বিলের বিধিব্যবস্থা এই সকল ফললাভে সাহায্য করিয়াছে বলিয়া আমরা দাবী করি।"

(৪) বিনিময়—

বিনিময় হার সম্বন্ধে বড়লাট বলেন,—"অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, আমরা ষ্টার্লিংয়ের সহিত টাকার হার বাঁধিয়া দিবার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছি তাহা ভারতের পক্ষে মঙ্গলকর হইয়াছে। প্রথমতঃ বিদেশে ভারতের ঋণভার ৮৪ কোটি টাকা হইতে কমিয়া ৬১ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে এবং ১৫০ লক্ষ ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধের জন্য আমাদিগকে নূতন করিয়া ধার করিতে হয় নাই। ব্যাঙ্কের সুদের হার কতকটা স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়াছে। বিনিময় ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ জন্য খুব সামান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। ভারতের অর্থনৈতিক মর্য্যাদা বিশেষ করিয়া লণ্ডনে বর্দ্ধিত হইয়াছে। লণ্ডনে শতকরা সাড়ে তিন ষ্টার্লিং সুদের কাগজের দর ৪৩৷৷০ হইয়াছিল; উহা এক্ষণে ৫১৷৷০ হইয়াছে এবং ভারতের প্রধান প্রধান পণ্য বিশেষ করিয়া তুলার দর টাকায় বাড়িয়াছে।"

(৫) স্বর্ণ রপ্তানী—

অতঃপর বড়লাট বলেন,—"এইরূপ নূতন আশার সময়ে এক শ্রেণীর লোক ও সংবাদপত্র ভারতের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে এমন সব বিবরণ প্রকাশ করিতেছেন যাহাতে আশঙ্কার সৃষ্টি হয়। তাহারা বলিতেছেন যে, স্বর্ণ রপ্তানী ভারতের পক্ষে ধ্বংসকর।"

বড়লাট বলেন,—"এই সময়ে স্বর্ণ রপ্তানী ভারতের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। অন্যান্য দেশ যখন বিষম দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তখন ভারতবর্ষ তাহার অর্থাগম স্বর্ণ সম্পদের অংশমাত্র ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন দেশ হইতে সন্তোষজনক টাকা পাইতেছে। ৪০ কোটি টাকার যে স্বর্ণ রপ্তানী হইয়াছে তাহা ভারতের সমগ্র স্বর্ণের তুলনা

অকিঞ্চিৎকর মাত্র। গত ত্রিশ বৎসরে ভারতের সমগ্র স্বর্ণের মূল্য ৭০০ কোটী টাকা। সম্প্রতি ১৯১৫, ১৯১৮ ও ১৯২১, এই তিন সালে স্বর্ণের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী বেশী হইয়াছে। বস্তুতঃ নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, অর্থনৈতিক বিবর্ত্তনে এমন ক্ষেত্র উপস্থিত হইবার সুযোগ আসিতে পারে, যখন স্বর্ণ ব্যবসায় সম্বন্ধে ভারতের অতীত গৌরব দেশের আর্থিক সুবিধা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।"

(৬) আপোষ হইতে পারে না—

অতঃপর বড়লাট রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বিভিন্ন ঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন,—"কংগ্রেস ইচ্ছাপূর্ব্বক আপোষ-পথ রুদ্ধ না করা পর্য্যন্ত আমি বা আমার গবর্ণমেণ্ট ঐ পথ হইতে বিচ্যুত হই নাই বলিয়াই আমি মনে করি। কোন গবর্ণমেণ্ট ঐরূপ স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক আহ্বান গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতে পারেন না। জনসাধারণ বা যাহারা আইন অমান্য করিবার পক্ষপাতী তাহাদের পক্ষে ভ্রান্ত ধারণার কোন স্থান নাই। এই বিষয়ে কোন আপোষ হইতে পারে না। বিশেষ ক্ষমতার ব্যবহার যাহাতে না হয়, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট যেমন আবশ্যকীয় সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, তেমনই আইন লঙ্ঘন দমন জন্য এক্ষণে যে সকল ব্যবস্থা রহিয়াছে, যতদিন পর্য্যন্ত ঐ সকল ব্যবস্থার অনুরূপ ক্ষেত্র বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহা শিথিল করা যাইতে পারে না।"

(৭) গোলটেবিল কার্য্যকরী সমিতি—

অতঃপর বড়লাট রাষ্ট্রতন্ত্রের গঠন সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বলেন,—"প্রধান মন্ত্রী মহাশয় গোলটেবিল বৈঠকের কার্য্য চালাইয়া যাওয়া সম্বন্ধে ঘোষণা করিয়াছেন। অনেক সমালোচকের বিশ্বাস, পরামর্শ পরিষদ (গোলটেবিলের ওয়ার্কিং কমিটী) একটি অলঙ্কারস্বরূপ প্রতিষ্ঠান। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। ভারতে রাষ্ট্র গঠন সম্পর্কে যে সকল আলোচনা হইবে, উক্ত পরামর্শ পরিষদের দ্বারা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদা তাহার সহিত যোগসূত্র রাখিবেন। ভারতের নূতন রাষ্ট্রতন্ত্রের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের বিস্তৃত আলোচনা ইংলণ্ডে হইবে না, কারণ গোল-টেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পনাই এই যে, ভারতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা হইবে এবং এখানকার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আমি প্রধান মন্ত্রী মহাশয়কে সর্ব্বদা জানাইব।

"সুতরাং গোলটেবিল বৈঠকে রাষ্ট্রতন্ত্র সম্বন্ধে যতদূর পরিকল্পনা হইয়াছে, তাহার বাকী অংশটুকু পূর্ণ করিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করাই পরামর্শ-পরিষদের কার্য্য হইবে। এই পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র এত বিস্তৃত ও প্রয়োজনীয় যে, উহার কার্য্য আরম্ভে সময় নষ্ট করা উচিত নহে। সেই হেতু আমি বর্ত্তমান সপ্তাহেই উহার অধিবেশন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছি। আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের প্রাথমিক আলোচনাতেই আমরা এমন একটি কার্য্যকরী কার্য্যতালিকা প্রবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইব, যাহার দ্বারা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রতন্ত্রের খুঁটীনাটি বিষয়সমূহ সত্বর সম্পূর্ণরূপে নির্ণীত হইবে। এই পরিষদের কার্য্যে যতদূর সম্ভব ব্যক্তিগতভাবে নিযুক্ত থাকা আমার অভিপ্রায়।"

উপসংহারে বড়লাট বলেন,—"গত কয়েক মাসের মধ্যে আমাদিগকে বহু বাধা-বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইতে হইলেও এবং এখনও বহু গুরুতর সমস্যা আমাদের সম্মুখে পড়িয়া থাকিলেও, আমার সরকারী কার্য্য-জীবনের শেষ ভাগে ভারতকে সম্রাটের অন্যান্য উপনিবেশের সহিত সম্পূর্ণ সমান অংশীদার রূপে তাহার প্রতিশ্রুত স্থানে লইয়া যাইবার জন্য পরিচালিত করিতে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি।"

প্রধান মন্ত্রী ও রবীন্দ্রনাথ—

কিছুদিন পূর্ব্বে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরকারী-নীতির প্রতিবাদে লণ্ডনে প্রধান মন্ত্রীর নিকট এক তার করিয়াছিলেন; সম্প্রতি উহা প্রকাশার্থ দেওয়া হইয়াছে। তারখানা এইরূপ :—

প্রধান মন্ত্রী,
হোয়াইট হল; লণ্ডন।

মহাত্মাজীর গ্রেপ্তারের পর হইতে ভারত সরকার যেরূপ চাঞ্চল্যকর ও বেপরোয়া দমন-নীতি চালাইয়াছেন, তাহাতে আমাদের ও আপনাদের দেশবাসীর মধ্যে এক

স্থায়ী দুঃখজনক বিচ্ছেদ ঘটাইয়া তুলিতেছে এবং আপনাদের প্রতিনিধিগণের সহিত শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক আপোষ নিষ্পত্তি বিষয়ে আমাদের সহযোগিতা অতিশয় কষ্টকর করিয়া তুলিতেছে।

স্বামীর সম্পত্তিতে হিন্দু বিধবার অংশ—

বিগত ২৬শে জানুয়ারী ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশনে দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুক্ত হরবিলাস সর্দ্দা মহাশয়, স্বামীর সম্পত্তিতে হিন্দু বিধবার অংশলাভের সম্বন্ধে একটী বিল যে ইতঃপূর্ব্বে পরিষদে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই বিলটীকে সিলেক্ট কমিটিতে দিবার প্রস্তাব করেন। এই উপলক্ষে সেদিনের পরিষদে যে আলোচনা হয়, বিলটীর গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া, আমরা এই আলোচনার বিস্তৃত বিবরণ নিয়ে দিলাম। শ্রীযুক্ত সর্দ্দা মহাশয় এই উপলক্ষে হিন্দু বিধবাদের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়া বিলের বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি খণ্ডন করেন। তিনি প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র হইতে দেখান যে, প্রাচীন কালে হিন্দু বিবাহিত হইবামাত্র তাহার স্বামীর সম্পত্তিতে অংশ-ভাগিনী হইতেন। এবং সেই হেতু পৃথক হইবার সময় তাহারা পুত্রদের সহিত সম্পত্তির সমান অংশ পাইতেন।

শ্রীযুক্ত অমরনাথ দত্ত সিলেক্ট কমিটীতে দিবার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মবিশ্বাসী রূপে তিনি এই বিল সমর্থন করিতে পারেন না এবং প্রাচীন ঋষিদের পবিত্র অনুশাসনে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কাহারও নাই। বাঙ্গালায় হিন্দু বিধবাদের অবস্থা যে শোচনীয় তিনি তাহা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে, উক্ত বিল গৃহীত হইলে হিন্দুর সমাজ গঠনের মূল নীতিতে কুঠারাঘাত করা হইবে।

মিঃ ইয়ামান খান হিন্দু বিধবাদের দুরদৃষ্টের প্রতি তাঁহার ব্যক্তিগত সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া বলেন, অনেক হিন্দু বিধবার পক্ষে তাঁহাকে আদালতে উপস্থিত হইতে হইয়াছে। প্রত্যেক পুরুষের ন্যায় নারীদেরও বাঁচিবার অধিকার আছে। পুরুষের তৈয়ারী আইনে স্ত্রীলোকদিগকে তাহার উত্তরাধিকারের বৈধ অংশ হইতে পুনঃ পুনঃ বঞ্চিত করিয়া আসা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণম আচারিয়ার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, দেশের অধিকাংশ লোক যখন সমাজ বিষয়ে কোন আইন চাহিবে, তখনই সেইরূপ আইন উপস্থাপিত হওয়া উচিত। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই বিল সম্বন্ধে সেরূপ কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। তিনি বলেন, এই বিল পাশ, হইলে হিন্দু সমাজ ও ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে।

মিঃ আজার আলি বিলে বিধবার যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহার সমালোচনা করিয়া বলেন যে, উহা খুব অস্পষ্ট হইয়াছে।

মিঃ লালচাঁদ নাভালরায় বিলের খসড়ার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, বিলের আকার আমূল পরিবর্ত্তিত না করিয়া সিলেক্ট কমিটিতে তাহা সংশোধিত হইতে পারে না। বিলের মধ্যে আইনসঙ্গত এই ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে যে, উহাতে সাংসারিক সম্পত্তি হইতে পুত্রদের অধিকার কাড়িয়া লওয়ার চেষ্টা হইয়াছে।

সার ল্যান্সলট গ্রেহাম গবর্ণমেণ্টের মনোভাব সম্বন্ধে বলেন যে, এই বিলের পক্ষে প্রবল জনমত না থাকিলে গবর্ণমেণ্ট ইহার সমর্থন করিবেন না। পরিষদে আলোচনায় দেখা যাইতেছে যে, যে তিনজন হিন্দু আলোচনায় যোগ দিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত জগঃ—অনেকে উহার পক্ষেও আছেন; তাঁহারা এখনও কিছু বলেন নাই।

সার ল্যান্সলট গ্রেহাম ঃ—আমি তাহা জানি। তবে শূন্য গ্যালারীসমূহ হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, এই বিলে জনসাধারণ তেমন আগ্রহান্বিত নহে। পক্ষান্তরে দেওয়ান বাহাদুর হরবিলাস সর্দ্দার পূর্ব্ববর্ত্তী বিলের আলোচনার সময় গ্যালারীসমূহে লোকের ভিড় যথেষ্ট হইয়াছিল।

উপসংহারে সার ল্যান্সলট্ গ্রেহাম বলেন যে, বিলের পক্ষে প্রবল জনমত না থাকিলে গবর্ণমেণ্ট উহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন।

শ্রীযুক্ত এ, দাস বিলের সমর্থন করিয়া বলেন, আলোচনাকালে বিলের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে তাহা অস্পষ্ট এবং তাহাতে বিলের নীতি [illegible] হয় না।

সার হরিসিং গৌর গবর্ণমেণ্টের মনোভাবের তী

সমালোচনা করিয়া বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট শুধু দমন ব্যাপারে শৌর্য্য দেখাইতেছেন—সমাজ-সংস্কার বিষয়ে নহে। এই বিষয়টি এত প্রয়োজনীয় যে, গণনা দ্বারা এই বিষয় নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত নহে—সত্য ও ন্যায়ের দ্বারা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। বাধা প্রদানকারী গোঁড়া সদস্যগণকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলেন, মানুষের তৈয়ারী আইন সমাজের প্রয়োজন অনুসারে যখন সংস্কার করা হইতেছে, তখন পবিত্র ও দৈব আইনের কথা তাঁহারা তুলেন কেন? বিলে যদি কোন ত্রুটী থাকে, সিলেক্ট কমিটি তাহার সংশোধন করিবেন।

অতঃপর অন্য একটী বিষয়ের আলোচনার সময় উপস্থিত হওয়ায় শ্রীযুক্ত সর্দ্দা মহাশয়ের প্রস্তাব মুলতবী হয়। বিগত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পুনরায় এই বিলের সম্বন্ধে আলোচনা হয়। কিছুক্ষণ আলোচনার পর এই বিল সিলেক্ট কমিটিতে দেওয়া হইবে কি না, সেই সম্বন্ধে উপস্থিত সদস্যগণের ভোট গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ২৬ ও বিপক্ষে ৫৬ ভোট হওয়ায় প্রস্তাবটী অগ্রাহ্য হইয়াছে।

চীন-জাপান সংঘর্ষ—

চীন ও জাপানে রীতিমত যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। বিশেষজ্ঞ যুদ্ধনীতিজ্ঞ ও রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা কিছু দিন ধরিয়া এইরূপই একটা কিছুর প্রতীক্ষা করিয়া আসিতে-ছিলেন। তাঁহারা বলিতেছিলেন—পৃথিবীর ভাবী কুরুক্ষেত্র হইবে প্রাচ্যভূমি, এবং সে যুদ্ধ আরম্ভ হইতেও যে বেশী বিলম্ব নাই, তাহাও তাঁহারা অনুমান করিয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে, তাঁহাদের অনুমান ব্যর্থ হয় নাই।

চীন-জাপানে সংঘর্ষ অপ্রত্যাশিত, অতর্কিত ব্যাপার নহে। গত ইয়োরোপীয় মহাসমরের পূর্ব্বে কিছুকাল ধরিয়া সকল ইয়োরোপীয় জাতি আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে-ছিলেন। উভয়পক্ষে বারুদ স্তূপীকৃত হইতেছিল। একজন সার্ব্বিয়ান কর্ত্তৃক অষ্ট্রিয়ার একজন রাজকুমারের হত্যাকাণ্ড ঐ বারুদের স্তূপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের কাজ করিয়াছিল মাত্র।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও অবস্থা প্রায় অনুরূপ। একজন জাপানী চীনাদের হস্তে নিহত হয়—বাহ্যতঃ ইহাই জাপানের চীন আক্রমণের মুখ্য কারণ। কিন্তু ইহা উপলক্ষ মাত্র। কেন না, ইহাই প্রকৃত কারণ হইলে কিছু টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আদান প্রদান করিলেই ব্যাপারটা চুকিয়া যাইত। কিন্তু অনেক দিন হইতেই জাপানকেও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইতেছিল। বর্ত্তমানে তাহার চীন আক্রমণের গৌণ কারণ তাহার অদম্য রাজ্যলিপ্সা। জাপান দ্বীপপুঞ্জ ক্ষুদ্র রাজ্য, তাহার আয়তন বড় বেশী নহে। জাপানীরা জীবিত উন্নতিশীল জাতি—জাপানী জাতির সংখ্যা শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পাইতেছে—ক্ষুদ্র জাপান রাজ্যে আর কুলাই। উঠিতেছে না। কাজেই বৃহত্তর জাপান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে তাহার আর চলিতেছে না। এই জন্যই জাপানকে ফরমোজায় উপনিবেশ স্থাপন করিতে হইয়াছে, কোরিয়া অধিকার করিতে হইয়াছে। বহু জাপানী আমেরিকায় গিয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু সেখানে প্রাচ্য জাতির বিরুদ্ধে বড় কঠোর ব্যবস্থা—সেখানে মাথা তুলিবার সুযোগ নাই। অন্য কোন দিকেই জাপান সাম্রাজ্যের প্রসারের সম্ভাবনা নাই। অতএব, নিকটতম প্রতিবেশী আত্মকলহে দুর্ব্বল চীনের উপর জাপানের যে লোলুপ দৃষ্টি পতিত হইবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি?

জাপান এতদিন সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। চীনের উপর জাপানের যেমন লোভ, ইয়োরোপের শক্তিশালী জাতি সমূহের লোভও তদপেক্ষা একটুও অল্প নহে। এত দিন তাই চীনের উপর সকলেরই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে ইয়োরোপ আর্থিক সঙ্কটে বিষম বিব্রত। সেই জন্য তাঁহারা এখন আর এই প্রাচ্য ভূখণ্ডের উপর তেমন তীব্র দৃষ্টি রাখিতে পারিতেছেন না। ইহাই জাপানের সুবর্ণ সুযোগ। তীক্ষ্ণবুদ্ধি জাপান এই সুযোগ উপেক্ষা করিবার পাত্র নহে। তাই ঐ একজন নগণ্য জাপানী হত্যার উপলক্ষ করিয়া জাপান আজ চীনে অভিযান করিতে সাহসী হইয়াছে, এবং অতি সামান্য আয়াসে মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়া অধিকার করিয়াছে।

চীনও নিদ্রিত নহে। চীন এখন সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জাতীয় দল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মহাচীনের দক্ষিণাংশে জাতীয় দলের প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। জাতীয় দলের নেতা চিয়াং কাই সেক মহা যোদ্ধা ও রাজনীতিকুশল ব্যক্তি। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে সঙ্কটকাল উপস্থিত দেখিয়া

তিনি আবার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার নেতৃত্বে হয় ত চীন জাপানকে বাধা দিতে পারিবে; কিম্বা ঠিক কি ঘটিবে তাহা হয় ত এখনও নিশ্চিত করিয়া বলিবার সময় উপস্থিত হয় নাই।

জাপান ও ইয়োরোপ—

চীন-জাপান যুদ্ধে আর একটি বিবেচ্য বিষয়—ইয়োরোপ এই যুদ্ধে যোগ দিবে কি না? রাজনীতির গতি কখন কোন্ পথ অনুসরণ করে, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারা না গেলেও, কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া একটা অনুমান করিতে কোন বাধা দেখা যায় না। চীন-জাপানের যুদ্ধটা আসিয়া পৌঁছিয়াছে সাংহাইএর খুব কাছে—এমন কি, সাংহাইএর উপরও গোলা-গুলি পড়িতেছে। এখন এই সাংহাইটি একটি আন্তর্জাতিক বন্দর। ইহার উপর গোলা-গুলি বর্ষণ আন্তর্জাতিক বিধি-বিরোধী। এই হেতু বৃটেন ও আমেরিকা উভয়েই চীন ও জাপান উভয়কেই সাংহাইএ যাহাতে গোলা-গুলি না বর্ষিত হয় সে পক্ষে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। এবং ইয়োরোপীয় শক্তিপুঞ্জের —ইংরেজ, ফরাসীয়, এবং আমেরিকার সৈন্য, নৌসৈন্য, রণতরী প্রভৃতি সাংহাইএর নিরপেক্ষতা রক্ষার্থ এখানে আসিয়া জমা হইতেছে। সাংহাইএ এইভাবে শক্তি সমন্বয় সংঘটনের ফলে সাংহাইএর শান্তি ও নিরপেক্ষতা রক্ষিত হইতেও পারে; কিম্বা—ইহারা উপস্থিত না থাকিলে হয় ত বিশেষ কোন গণ্ডগোল না ঘটিতেও পারিত, কিন্তু ইহারা উপস্থিত থাকার দরুণই—ইয়োরোপীয় শক্তিপুঞ্জকে জাপান-চীন যুদ্ধে লিপ্ত হইতেও হইতে পারে—কিছুই বলা যায় না; কারণ, যুদ্ধ-বিগ্রহের স্থলে এরূপ অঘটন প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য চীন-জাপান যুদ্ধ পৃথিবীর সকলের পক্ষেই সমান উদ্বেগের কারণ হওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ চীনে ইয়োরোপের মহা স্বার্থ রহিয়াছে—বিগত বক্সার যুদ্ধের দরুণ চীন শক্তিপুঞ্জের ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য আছে—চীনের সে ঋণ সম্ভবতঃ এখনও পরিশোধিত হয় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে যুদ্ধের গতি অনুসারে ইয়োরোপ, ইচ্ছা না করিলেও হয় ত, বাধ্য হইয়া এই যুদ্ধে লিপ্ত হইতে পারে। তখন কি অবস্থা ঘটিবে, এখন তাহা অনুমানাতীত বিষয়। একটা সংবাদ পাওয়া গেল যে, ইয়োরোপীয় শক্তিপুঞ্জের আপোষ-প্রস্তাব জাপান অগ্রাহ্য করিয়াছে; সুতরাং ব্যাপার গুরুতর হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত—পুস্তকাবলী

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত 'ভারতীয় নারী'—৸৹
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত বেদান্ত-দর্শন—৪৲
শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত উপন্যাস 'পথের সাথী'—২৲
শ্রীমন্মথ রায় প্রণীত নাটিকা 'একাঙ্কিকা'—১৷৹
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত গাথাকাব্য 'চিত্র ও চিত্ত'—১৲
শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত 'রূপসী'—১৲
শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত 'ইতি'—১৷৹
শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র প্রণীত 'পুতুল ও প্রতিমা'—১৷৹
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস 'দূরের আশায়'—২৲
শ্রীভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত নাটক 'বাসুকী'—১৲
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত উপন্যাস 'গুপ্ত ঘাতকের ছু'চ' ও 'ডাকলুঠ'—প্রত্যেকের—৸৹

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEE.
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

Printer—NARENDRANATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

সতীর দেহত্যাগ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
রঘুনাথগঞ্জ দেশবন্ধু পাঠাগারের সৌজন্যে

Bharatvarsha Halftone & Printing Works